অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

"অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজো মানুষে খুঁজবে। মানুষলীলা কেন? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়। এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন। মানুষের ভিতর নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে। অথবা শার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি। যেন বলছে, আমি মানুষের ভিতর রইচি, তুমি মানুষ নিয়ে আনন্দ কর। প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না? মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখনই পূর্ণ জ্ঞান হবে। তিনিই এক এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে কখনও ছলরূপে—কোথাও বা খল-রূপে।"—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি ভূরিদা জনাঃ॥"

"তোমার কথা অমৃততুল্য। সন্তপ্তজনের জীবন-দান করে, কবিকুলদ্বারা উচ্চারিত হয়ে সমস্ত পাপ বিনাশ করে, শুনতেই এ মধু-মঙ্গল। দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে বিধান করে সকলশ্রী। যাঁরা পৃথিবীতে এ কীর্তন করেন তাঁরাই বহুদাতা।"—**শ্রী[illegible]**

॥ ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ॥

শুধু কথা আর কথা। ঈশ্বর অশেষ বলে তাঁর বিষয়ে কথাও অন্তহীন। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?' শেষ কথা বলা যায় না বলেই এত কথা, এত কান্না। ঈশ্বর যে অনির্বচনীয়, অবাঙমনসগোচর, সেটুকু বোঝাবার জন্যেও বা কত কথার আড়ম্বর। যে কাঁদে কথাই তার একমাত্র উপায়। তার একমাত্র আনন্দ।

'শব্দজালং মহারণ্যং।' কিন্তু মহারণ্যকে বোঝাবার জন্যেও চাই শব্দজাল। সব শাস্ত্র-পুরাণ বেদবেদান্ত ঘুরে এসেই বলা যায় ঈশ্বর আরো দূরে। পাঁজি পড়ে নিলেই বলা যায় বিশ আড়া জল লেখা থাকলেও পড়ে না এক ফোঁটা। তাই বলে কথাকে একেবারে ফেলে দেবে কি করে? 'যতো বাচো নিবর্তন্তে—' বাক্য প্রকাশ করতে চাইবে, তবেই না সে আসবে ফিরে-ফিরে। ঠাকুর বললেন, ভক্ত ভালো, বিদ্বান ভক্ত আরো ভালো। যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

শিল্পী যেমন তার প্রতিমাকে সুন্দর করে নানা লাবণ্যসম্ভারে তেমনি ঈশ্বর-প্রসঙ্গকেও সুন্দর করি বাক্যের প্রসাধনে, ভাবের রূপৈশ্বর্যে। আর এ বাক্য যত গাঁথি তত মাতি। যত ভজি তত মজি। আর-সব কথা ক্লান্ত করে ঈশ্বরকথা করে না। আর-সব অন্বেষণ অবসাদ আনে ঈশ্বরসন্ধান অনির্বেয়। যত পান তত পিপাসা, যত পথ তত পাথেয়। কাজলের ঘরে গেলে যেমন কালি লাগে আতরের ঘরে এলে তেমনি সুগন্ধ। সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয় সৎকথাকে সুলভ করি।

জপ-তপ ধ্যান-জ্ঞান অনেক শুনেছি, যাই বলো, ভালোবাসার মত কিছু নয়। বৃন্দাবনে গোপীদের অনেক জ্ঞানের কথা বলতে এসেছিল উদ্ধব। কৃষ্ণ মথুরায় গেছেন বলে তোমরা বিরহে ব্যাকুল কেন? কৃষ্ণ তো সর্বাত্মক, তোমাদের সঙ্গে তো তাঁর বিয়োগ নেই। তিনি মথুরায় আছেন বৃন্দাবনে নেই এ তো হতে পারে না। আমরা অতশত বুঝি না জ্ঞানের কথা। আমরা যাকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি গুজিয়েছি খাইয়েছি পরিয়েছি তাকে ধ্যান করে পেতে যাব কোন দুঃখে? যে মন দিয়ে ধ্যান করব সে মন কি আর আমাদের আছে? আমরা কাঁদছি, আমাদের সেই ভালোবাসার ধনকে এনে দাও। তোমাদের কান্নাই হরিগুণগান। বললে উদ্ধব। তোমাদের হরিকথাগীত লোক-ত্রয় পবিত্র করুক।

তাই হরিকথা বলে যাই প্রাণ ভরে। যদি ডাক-নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে মনে অনুরাগের রঙ লাগে। যদি বজ্রসার নিষ্ঠার থেকে চলে আসে বিগলিত ভক্তি। পবিত্রতার পরিপূর্ণতা।

৬ই ফাল্গুন ১৩৬১

অচিন্ত্যকুমার

৩য় খণ্ড

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
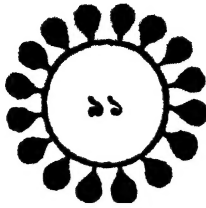
নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলেন।

বরানগরে ভবনাথ চাটুজ্জের বাড়িতে নেমতন্ন ছিল নরেনের। বিকেল থেকেই আড্ডা জমিয়েছে সেখানে। সঙ্গে বন্ধু সাতকড়ি লাহিড়ি আর দাশরথি সান্যাল।

রাত দুটো, চার বন্ধু ঘুমিয়েছে একসঙ্গে, খবর এসে পৌঁছুল, বাবা আর নেই। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।

আরামশয্যা থেকে উন্মূলিত হল নরেন। প্রথমটা সম্মূঢ় হয়ে গেল। জীবনের প্রথম প্রতিবেশী মৃত্যুকে দেখলে। যে অপেক্ষা করে না, কিছুমাত্র কৈফিয়ত শোনে না, সবলে কেশ আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যায়।

ছুটল ঘরের দিকে। ভবনাথ বললে, 'দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি।'

'জন্মান্তরে তুই নরেনের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।' ভবনাথকে নিয়ে রহস্য করেন ঠাকুর।

এমনি ভাব নরেনের সঙ্গে। গাছের সঙ্গে যেমন ছায়া। একটি পাতা যেন ফুলের বৃন্তে।

'ভবনাথ, বাবুরাম—এদের প্রকৃতি ভাব।' বলেন ঠাকুর: 'আর হরীশ তো মেয়ের কাপড় পরে শোয়। বাবুরাম বলেছে ঐ ভাবটা ভালো লাগে। ভবনাথেরও তাই।'

যে যে-ভাবে আছে, যার যে-ভাব ভালো লাগে। স্ব-ভাবটিই আসল ভাব। আমার অঙ্কে মাথা, আমি সাহিত্য দিয়ে কি করবো। আমার চিত্রে অভিরুচি, আমি চাই না মসীজীবী হতে। স্বভাব কখনো বর্জনীয় নয়। স্বভাবে নিধনও শ্রেয়।

শুধু একটু বাঁক ঘুরিয়ে দেওয়া। কামকে প্রেম করা। ক্রোধকে তেজ করা। লোভকে ব্যাকুলতায় নিয়ে যাওয়া। অবন্ধন স্রোত থেকে বন্দরে নৌকো ভেড়ানো।

শুধু একজনকে বা একটাকে ধরো। যাকে ভালো লাগে, যাকে ভালোবাসি, যাকে ভাবলে অন্তর-বাহির আলোকিত হয়ে ওঠে। ভাবো তো ডুবে গিয়ে ভাবো। ধরো তো পাকা করে ধরো। নড়নচড়ন নেই, ছাড়ানছোড়ান নেই।

'ভাব কি জানো?' বললেন ঠাকুর, 'তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতানো। সেইটে সর্বক্ষণ মনে রাখা। যেমন তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি। প্রথম অবস্থায় তুমি-টুমি, ভাব বাড়লে তুই-মুই। যেমন ধরো, নষ্ট মেয়ে। পরপুরুষকে প্রথম-প্রথম ভালোবাসতে শিখছে, তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা। তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠল, তখন আর কিছু নেই—একেবারে তার হাত ধরে

সকলের সামনে কুলের বাইরে এসে দাঁড়াল। তখন যদি সে পুরুষ আদর-যত্ন না করে, ছেড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধরে বলে, তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কিনা বল্। তেমনি যে ভগবানের জন্যে সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েছে, সে তাঁর উপর জোর করে বলে, তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দেখা দিবি কিনা বল্।'

কালীবাড়ির নবতে বাজনা শোনা যাচ্ছে।

ঠাকুর বলছেন কেশব সেনকে, 'দেখলে কেমন সুন্দর বাজনা! একজন পোঁ করছে, আরেকজন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগরাগিণীর আলাপ করছে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পোঁ করব—কেন শুধু সোঽহং সোঽহং করব! আমি সাত ফোকরে নানা রাগরাগিণী বাজাব। কেন শুধু ব্রহ্ম-ব্রহ্ম করব! শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মাধুর্য—সব ভাবে ডাকব। আনন্দ করব বিলাস করব।'

হায়, রুদ্ধরন্ধ্র বাঁশি হয়ে পড়ে আছি। নানা অহঙ্কারে আর মোহে ফোকরগুলি বন্ধ হয়ে আছে। তাই আর বাজছে না একটুও। ছিদ্র যদি না শূন্য হয়, বাজবে কি করে? দরজা যদি না মুক্ত হয় আসবে কি করে সে অতিথি-পথিক?

তাই, 'শূন্য করিয়া রাখ তোর বাঁশি, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।' পূর্ণ করা সোজা, শূন্য করাই তপস্যা।

ভবনাথ যে দক্ষিণেশ্বরে আসে তার বাড়ির লোক পছন্দ করে না। তার চেয়ে ব্রাহ্ম-সমাজে যে নাম লিখিয়েছে সে অনেক ভালো। কিন্তু প্রাণ জানে তার টানের কথা।

'তুই এত দেরিতে-দেরিতে আসিস কেন?'

'আজ্ঞে, পনেরোদিন অন্তর দেখা করি।' ভবনাথ হাসল। 'সেদিন আপনি নিজে রাস্তায় দেখা দিলেন, তাই আর আসিনি।'

'সে কি রে?' ঠাকুর ফোড়ন দিলেন: 'শুধু দর্শনে কি হয়? স্পর্শন, আলাপ, এ সবও চাই।'

তোমাকে দেখব অথচ তোমাকে ধরতে পারব না এ সইব কি করে? তুমি আমার মুখোমুখি বসবে অথচ কথা কইবে না এ যে আমার মরণাধিক যন্ত্রণা। শুধু চোখের উপর চোখ রাখলেই চলবে না, আমার হাতের উপর তোমার হাত রাখো। আর আমার বুকের মধ্যে তোমার পা দুখানি।

কি করে তোমার কৃপা আকর্ষণ করব তাই ভাবি। কায়দা-কানুন কিছুই জানি না, শুধু কর্ম দিয়েছ দুহাত ভরে, তাই করে যাচ্ছি উদয়াস্ত। ক্লান্ত করছি নিজেকে, যদি তোমার দক্ষিণ সমীরের আনন্দটি অহেতুক এসে স্পর্শ করে। যদি তুমি এক-খানি হাত সন্তর্পণে তুলে ধরো। তখন এক হাতে তোমাকে ধরব আরেক হাতে কাজ করব। কখন আবার আরেকখানি হাতও তুলে নেবে। তখন দুহাতে ধরব তোমাকে। আর কোনো সাধন-ভজন জানি না আমরা। কর্ম আর ক্লান্তি—এই আমাদের সাধন-ভজন।

'ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ি—দুজনে যেন স্ত্রী-পুরুষ।' বললেন ঠাকুর, 'তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললুম। ওরা দুজনেই অরূপের ঘর।'

হরি-নামের মাহাত্ম্যের কথা হচ্ছিল সেদিন। ঠাকুর বললেন, 'যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।'
ভবনাথ বললে, 'হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়।'
সব অহঙ্কারের পোশাক যেন খুলে দিতে পারি গা থেকে। যেন মা'র কোলে নগ্ন শিশু হয়ে খেলা করতে পারি। অহঙ্কার করছি, কিন্তু এ অহংটি কার? ঠাকুর বললেন, 'মান করাতে একজন সখী বলেছিল, শ্রীমতীর অহঙ্কার হয়েছে। বৃন্দে বললে, এ অহং কার? এ তাঁরই অহং। কৃষ্ণগরবে গরবিনী।'
চৈতন্যদেব অবতার হয়ে যেকালে হরিনাম প্রচার করেছিলেন সেকালে এ অবশ্য ভালো—এই বলেও অন্তত লেগে যাক সকলে। যদি চৈতন্যমন্ত্রেও চৈতন্য হয়। রসিকতা করলেন ঠাকুর: 'চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে। তাদের জিগগেস করা হল, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বললে, যদি বাবুরা খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন সেকালে ভালোই হয়েছে।'
'কিন্তু যাই বলো,' বললেন ঠাকুর, 'আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ বলে জ্ঞান করি। আর আমি ওর অনুগত।'
অনুগত তো, কী সুরাহা হল নরেন্দ্রের! বাবার মৃত্যুতে জগৎ-সংসার নিবে গেল এক ফুঁয়ে। সৌভাগ্যের ঝাড়-লণ্ঠনটা মৃত্যুর পাথরের উপর ছিঁড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সংসার সরতে-সরতে থমকে দাঁড়াল পাতালের গুহামুখে। ছোট-ছোট ভাই আর মা, পাঁচ-সাতটি আর্ত মুখ তাকিয়ে রয়েছে নরেনের দিকে। বাবা এটর্নি ছিলেন, রেখে যাননি সংস্থান? দুরস্থ আত্মীয় পালন করে-করে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। রেখে গেছেন ঋণ। আয়ের ঘরে শস্যহীন মাঠ, ব্যয়ের ঘরে লবণাক্ত বন্যা।
সেবার বি-এ দিয়েছে নরেন। কত রঙিন ভাবনার ফোঁড়-সেলাই করে বিচিত্র করে রেখেছিল জীবনের নক্সা। সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আর সব আচ্ছাদনের আগে গ্রাসাচ্ছাদন। উদরপূরণ না হলে উদার অম্বর অর্থহীন। কিন্তু উদরপূরণের ব্যবস্থা কি! সঞ্চিত টাকা নেই, জমিদারি নেই, কৃপালু আত্মীয়-রক্ষক কেউ নেই আশে-পাশে। চারদিকে শুধু একটা নিস্তৃণ মরুবিস্তার। থাকবার মধ্যে আছে এই নগ্ন পদ আর দৃপ্ত বাহু।
"আর কেউ নেই?' কে যেন জিগগেস করল কানে-কানে।
তুমি আছ? করুণানিধান হয়ে আছ? কে জানে! আছো তো, এত দুঃখ কেন, দারিদ্র্য কেন, কেন এত অপ্রতিকার অবিচার?
পায়ে জুতো নেই, গায়ে একটা আস্ত জামা নেই, চাকরির জন্যে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। এ আফিস থেকে ও আফিস, এ দরজা থেকে ও দরজা। সর্বত্র এক উত্তর। এক নিরুত্তর নিশ্ছিদ্র প্রত্যাখ্যান। হবে না, জায়গা নেই, পথ দেখ। পাথুরে দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল, ঠেলতে লাগল লৌহদুয়ার। নিশ্চল নিষেধ রয়েছে দাঁড়িয়ে—দুর্ধর্ষ ঔদাসীন্য। এতটুকু টলে না, এতটুকু পথ ছাড়ে না। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে কেউ আনে না এতটুকু ছায়া-স্নেহ। রাশি-রাশি নৈরাশ্যের বালুকায় শুধু বৈফল্যের অনাবৃষ্টি।

বন্ধুরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, সুখীরা সহানুভূতি করতে আসে, আর অপরিচিত জনস্রোত ফিরেও তাকায় না। সর্বত্রই একটা নীতিহীন অসামঞ্জস্য। একটা পাগলের খামখেয়াল।

তবে কি তিনি নেই? এ সমস্ত কি একটা দায়িত্বহীন দানবের রচনা?

আর কার কাছে প্রার্থনা করবে? নিজের কাছেই প্রার্থনা করে নরেন। আশ্রয় নেয় আত্মশক্তির তরুতলে। দৃঢ়হাতে সরিয়ে দেব এ দুর্দিনের যবনিকা। উচ্ছেদ করব এ দুঃখ-দুর্যোগের আবর্জনা। ওঁ সহোঽসি সহং ময়ি ধেহি। ওঁ মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। তুমি সহনশক্তির ঘনীভূত মূর্তি, আমাকে সহিষ্ণুতা দাও। তুমি অন্যায়ের প্রতি ক্রোধস্বরূপ দণ্ডদাতা, আমাকে অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের শক্তি দাও।

শুধু একটা গাড়োয়ানই বুঝি ডেকে জিগগেস করে। খালি গাড়ি নিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে। চেনা গাড়োয়ান। বাবা থাকতে কত দিন চড়েছে এ গাড়ি, ভাড়ার উপরে বকশিস দিয়েছে গাড়োয়ানকে—

'বাবু, আসুন না! কোথায় যাবেন?' নুয়ে পড়ে জিগগেস করল গাড়োয়ান।

'পয়সা নেই।'

'তাতে কি! আসুন না! আমি নিয়ে যাব।'

রাজী হয় না নরেন। পায়ের নিচে প্রস্তররুক্ষ পথ পেয়েছি, মাথার উপরে নগ্ন নিষ্ঠুর আকাশ—আমি একাই যেতে পারব দিগন্ত পর্যন্ত।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল গাড়োয়ান। চাবুকের শব্দটা নরেনের বুকে লাগল একটা তীক্ষ্ন চমকের মতো।

আমি কোচোয়ান হব। একদিন বলেছিল সে বাবাকে। এ মহাজড়বুদ্ধির দেশটাকে নিয়ে যাব রাজসিক কর্মৈশ্বর্যে। সত্ত্বগুণের ধুয়ো ধরে দেশ নেমে যাচ্ছে তমোময় মহাসমুদ্রে। জন্মালস বৈরাগ্যের লেপ মুড়ি দিয়ে অক্ষম জড়পিণ্ড শুয়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। পরাবিদ্যার ছলনায় ঢাকতে চাচ্ছে নিজের মূর্খতা। ভণ্ডের দল তপস্যার ভান করে অবিবেক আর অবিচারকে মানছে ধর্ম বলে। নিজের আলস্য আর অসামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য নেই, অহোরাত্র অন্যের দোষদর্শন। এ তামসী রাত্রির অবসান ঘটাবো, চতুর্দিকে হানব শুধু চেতনার চাবুক, বেগবীর্যহীন তামসিকতার ঘোড়াকে উজ্জীবিত করব দিবস্পতি ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবায়।

হায়, সঙ্কল্পও বুঝি কল্পনা! নইলে তুচ্ছ একটা চাকরিও জোটাতে পাচ্ছি না এত দিন ধরে! পেট ভরিয়ে খাওয়াতে পাচ্ছি না ভাইগুলোকে। মায়ের মুখের বিষাদ ও ক্লান্তির করুণ রেখাটি অটুট হয়ে রয়েছে।

'এ কি, স্নান করে উঠেই চললি কোথায়?' মা দাঁড়ালেন এসে পথের সামনে: 'খাবি নে?' চোখ নামাল নরেন। বললে, 'বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।'

মনে-মনে একটু কি আরাম পেলেন ভুবনেশ্বরী? বাড়িতে আজ পর্যাপ্ত আহার নেই সকলের, হাত শূন্য। এমন অদিনে বাইরে কোথাও নিমন্ত্রণ আছে—সেটা শুধু আস্বাদনীয় নয় আরাধনীয়।

পথ ছেড়ে দিলেন ভুবনেশ্বরী। শুকনো মুখে বেরিয়ে গেল নরেন। মনে খটকা লাগল। নরেন কি ছলনা করল? তবে কি সে অনশনে থাকবে?

খালি পায়ে রোদে ঘুরে-ঘুরে পায়ের নিচে ফোস্কা পড়েছে। গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের নিচে বসেছে বিশ্রাম করতে। হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সুখে-শান্তিতে আছে খেয়ে-পরে। সুখে-শান্তিতে আছে বলেই হয়তো ঈশ্বরভক্ত। জানত সব নরেনের কথা। তার ভাগ্যহীন দুঃসময়ের কথা। তার চেষ্টা ও অসাফল্যের কাহিনী। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বসল তার পাশটিতে। গান ধরল: 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে—'

'নে, নে, রাখ তোর ব্রহ্মনিশ্বাস।' ক্ষোভে অভিমানে ঝাঁজিয়ে উঠল নরেন: 'যারা খেয়ে-পরে সুখে-সৌভাগ্যে আছে তাদেরই ভালো লাগে ব্রহ্মনিশ্বাস। ইজিচেয়ারে শুয়ে টানাপাখার হাওয়া খাচ্ছে আর ভাবছে, ব্রহ্মনিশ্বাস খাচ্ছি! আর ক্ষুধার তাড়নায় যার মা-ভাইয়েরা কষ্ট পাচ্ছে, দোরে-দোরে ঘুরে একটা যে চাকরি জোটাতে পাচ্ছে না, তার কাছে আর ব্রহ্মনিশ্বাস নেই, বজ্রনিশ্বাস!'

বন্ধুকে অকারণে আঘাত দিল হয়তো। তা আর কি করবে! পেটে ভাত নেই, বলে কিনা আফিঙের মৌতাত চড়াও। কর্ম জোটে না একটা, বলে কি না ধর্ম করো।

ঠনঠনের ঈশান মুখুজ্জের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। সকাল বেলা। মাস্টারমশাই এসে খবর দিলে নরেনকে। বললে, তোমাকে যেতে বলেছেন।

গিয়ে কি হবে! চাকরি জুটিয়ে দেবেন একটা? উপবাসী মা-ভাইয়ের মুখে অন্ন তুলে দেবেন? তবু গেল নরেন। প্রণাম করে ঠাকুরের পাশটিতে এসে বসল।

ঠাকুরের কেমন চিন্তিত ভাব। সব খবর রেখেছেন আদ্যোপান্ত। নরেনের বাড়ির কষ্টে তাই তিনিও বিমর্ষ। হঠাৎ নরেনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ঈশানকে তোর কথা বলেছি। অনেকের সঙ্গে তার আলাপ আছে। একটা কিছু যোগাড় হয়ে যাবে হয়তো।'

কাষ্ঠ হাসি হাসল নরেন। এমনি কত লোকই কত আশ্বাস দিয়েছে এতদিন। শুধু কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাসটিই টের পাওয়া যায়নি।

উপরের ঘরে চলে এসেছেন ঠাকুর। বলছেন মাস্টারকে, 'সংসারে কিছুই নেই। ঈশানের সংসার ভালো তাই—তা না হলে ছেলেরা যদি রাঁড়খোর গাঁজাখোর মাতাল অবাধ্য এই সব হত, কষ্টের একশেষ হত। সকলেরই ঈশ্বরের দিকে মন—বিদ্যার সংসার! এরূপ প্রায় দেখা যায় না। এরূপ দু-চার বাড়ি দেখলাম। নইলে, কেবল ঝগড়া কোঁদল হিংসা—তারপর রোগ শোক দারিদ্র্য। দেখে বললাম, মা, এইবেলা মোড় ফিরিয়ে দাও।' একটু থামলেন ঠাকুর। বললেন, 'এই দেখ না, নরেন্দ্র কি মুশকিলেই পড়েছে! বাপ মারা গেছে, বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না, কাজকর্মের এত চেষ্টা করছে, জুটছে না একটাও। এখন কি করে বেড়াচ্ছে দ্যাখো।' হঠাৎ জনান্তিকে বললেন, 'তুমি আগে অত যেতে, এখন তত যাও না কেন? পরিবারের সঙ্গে বেশি ভাব হয়েছে বুঝি?'

নিচে হঠাৎ গান শোনা গেল। কে গায় রে? কার কণ্ঠস্বর?

এ কি আর চিনতে ভুল হয়? নরেনের গলা। নরেন গান করছে। কী গান করছে? 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে?' না কি 'ওহে ধ্রুবতারা মম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে!'
কে জানে কী গান! ঠাকুর তাকে গান গাইয়ে ছাড়লেন।

১২
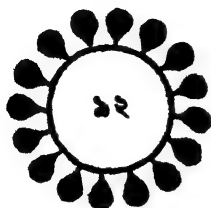
ঈশ্বর কি শুধু কোমলকান্ত পদাবলী? শুধু কি কলিতললিত বংশীস্বর? বিলাস-আলস্যে সুখে-সমৃদ্ধিতে থাকলেই কি বলব তিনি আছেন? তাঁর আবির্ভাব কি শুধু আরামরম্যতায়? কণ্টক-শয়নে তিনি নেই? নেই কি কোপককর্শ বজ্রবহ্নিতে? তাঁর আশীর্বাদ কি শুধু ধনমান সাফল্য-স্বাচ্ছন্দ্য? এই আঘাত আর অভাব, সংগ্রাম আর ব্যর্থতা—এ কি নয় তাঁর অনুকম্পা? সুখের পেলবতাটুকুই তাঁর স্পর্শ, দুঃখের কাঠিন্যটুকুই আর তাঁর স্পর্শ নয়?
হায়, সুখ হচ্ছে চকিতে একটু ছোঁয়া, দুঃখই হচ্ছে নিবিড় আলিঙ্গন।
যা দেন সব নেব নতশিরে। খরশর হোক, হোক বা পুষ্পবৃষ্টি। জল যেখান থেকেই আসুক, কুম্ভ থেকেই হোক বা কূপ থেকেই হোক, হোক তা খাল-বিলের বা বর্ষা-বাদলের, নেব সব অঞ্জলি ভরে। ঈশ্বর সুখকরও নন দুঃখকরও নন, ঈশ্বর কল্যাণকর। নন শুধু শীতনিবারিণী কন্থা, তিনি আবার হিমরাত্রির অনাবরণ।
তাই ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বরের নাম করে নরেন।
পাশের ঘর থেকে একদিন শুনতে পেলেন ভুবনেশ্বরী। ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'চুপ কর্। ছেলেবেলা থেকেই তো কত ভগবান-ভগবান করলি—ভগবান তো সব করলেন!'
বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল নরেন। সর্বংসহা যে মা তিনিও অস্থির হয়েছেন। ভগবান তাঁর কান্নাও কানে নেননি। তবে তাঁকে করুণাময় বলি কি করে? যিনি কল্যাণ করেন তিনি একটু করুণা করতে পারেন না?
পর-দুঃখে কাতর হয়ে তাই বলেছিলেন বিদ্যাসাগর: 'ভগবান যদি দয়াময়ই হবেন তবে দুর্ভিক্ষে লাখ-লাখ লোক দুটি অন্নের জন্যে কেঁদে-কেঁদে মরে কেন?'
ঠিকই বলেছিলেন। যার ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা আছে সে যদি এত কান্নায়ও বিচলিত না হয়, তবে কী বলব? হয় বলব তিনি নেই বা তাঁর ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা নেই, কিম্বা বলব তিনি নিশ্চেষ্ট নিষ্ঠুর অনাত্মীয়। কেউ নন তিনি আমাদের।

এই প্রশ্ন নিয়েই একদিন সটান গিয়েছিল ঠাকুরের কাছে।

'বলুন ঈশ্বর কিসে দয়াময়? দয়াময় তো, এত দুঃখ কেন দিনে-রাত্রে? যারা নিষ্পাপ-নির্দোষ তাদের কেন এত যন্ত্রণা?'

আয়ত-স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, বোস পাশটিতে। একটু স্তব্ধ হয়ে তাকা একবার রাতের আকাশের দিকে।

কোথায় রাতের আকাশ! রাতের আকাশের মতই রহস্যগভীর যে দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে রইল নরেন।

হ্যাঁ রে, কী দেখছিস? গুঁড়ো-গুঁড়ো কাঁচের টুকরোর মত কত তারা ছড়িয়ে রয়েছে আকাশে গুনতে পারিস? কেউ পারে? একথালা শুপারি, গুনতে নারে বেপারী। তেমনি গুনতে পারিস গঙ্গাপারের ক্যাঁকড়া? চেয়ে দ্যাখ ভালো করে। শর্বরীর নীলাম্বরীতে কুচি-কুচি চুমকি। একটা দুটো নয়, লক্ষ-লক্ষ, হয়তো কোটি-কোটি। তার মধ্যে তোর এই পৃথিবী। হাওয়ায় উড়ে আসা ছোট্ট একটা বালুকণা। সেই পৃথিবীই বা কি কম বড়! হাঁটতে শুরু করলে পথ আর ফুরোয় না একজন্মে। অন্তরীক্ষের প্রেক্ষিতে তোর এই বিশাল পৃথিবীই বা কি। তুচ্ছ একটা কীটাণু। তার মধ্যে আবার তুই! তোর মস্তিষ্ক! তোর হৃৎস্পন্দন!

নরেন মাথা নোয়াল।

হ্যাঁ, নত কর মাথা। কার বিচার করবি তুই, কোন আইনে? সেই বিচারদৃষ্টি কতদূর প্রসারিত করবি? তারপর শেষে আকাশে এসে ঠেকবে না? এই কালো রাত্রির আকাশে? তখন কী বলবি রে নরেন? এতগুলো তারা কেন? কোন ভূতের বাপের পিণ্ডি দিতে? সূর্য-চন্দ্র বুঝি, কিন্তু তারা দিয়ে কি মানুষ ধুয়ে খাবে? কী উত্তর দিবি? যদি বলি ওরা সব চিন্তামণির নাচ-দুয়ারের মণি-মাণিক্য, পারবি মেনে নিতে? বলি, বিচার কতদূর যাবে? শেষে সকল পথ পায়ে হেঁটে দুয়ারে এসে আছড়ে পড়বি! বিচার থা পাবে না।

না পাক, নোয়াব না মাথা। ঈশ্বরের কাছেও না। নিজের পায়ে দাঁড়াব। লড়ব নয় মরব। আকাশটাকে ছিনিয়ে আনব দুহাতে।

পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে পড়ে গিয়েছেন ভুবনেশ্বরী। যেন ধরা পড়ে গিয়েছেন। যেন জল খাচ্ছিলেন ডুবে-ডুবে। মুখে ঠাট্টা, অন্তরে কান্না। মুখে রাগ, অন্তরে অনুরাগ!

তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিলেন ভুবনেশ্বরী। আর কিছুর জন্যে নয়, যে চেলি পরে আহ্নিক করছিলেন সেটা শতছিন্ন হয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথাটা: 'আমাকে একখানা চেলি বা গরদের কাপড় কিনে দিতে পারিস? এটা পরে আর পারা যায় না।'

মাথা হেঁট করল নরেন। কোথায় পাবে সে চেলি-গরদ? সে বেকার, উদয়াস্ত ভূতের বেগার খাটছে। কোথায় পাবে সে পট্টবস্ত্রের পয়সা? লজ্জা মা পাবে কেন, লজ্জা পেল ছেলে। মা'র সমুখ থেকে চলে গেল ম্লানমুখে।

সেইদিনই বিকানির থেকে এক মাড়োয়ারি এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে মিছরির থালা তার উপরে একখানা গরদের কাপড়। দেখে ঠাকুরের বড় খুশি-খুশি ভাব। ভুমো-

ডুমো মিছরি দিয়ে ভর্তি-করা গরদ-ঢাকা থালা নামিয়ে প্রণাম করল মাড়োয়ারি।

দু দিন পরে নরেন এসে হাজির। যাকে মানে না সেই আবার টানে। যারে নিন্দে তায়েই বন্দে।

'শোন, কাছে আয়—' নরেনকে ডাকলেন ঠাকুর।

নরেন কাছে এল। দাঁড়িয়ে রইল, বসল না।

'শোন, এই মিছরির থালা আর গরদখানা তুই নিয়ে যা—'

উচ্চশব্দে হেসে উঠল নরেন! পরবার নেংটি নেই দরবারে যেতে চায়! মিছরি দিয়ে আমি কী করব? আমি কি ছোট ছেলে যে মিষ্টি দিয়ে ভোলাবেন? আর গরদ—

'গরদখানা তোর মাকে নিয়ে দে গে। তার আহ্নিক করবার চেলি ছিঁড়ে গিয়েছে। সে এ গরদ পরে আহ্নিক করবে।'

বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল নরেনের। তা আপনি কি করে জানলেন? আপনাকে বললে কে?

ওরে, আমি জানতে পাই। উৎসটি ঠিক থাকলে ধ্বনিটি ঠিক আমার কানে লাগে। দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের সময় এক হাতে নিজের কাপড় ধরে আরেক হাত তুলে ডাকছিল কৃষ্ণকে। প্রথম-প্রথম শত কান্নায়ও কৃষ্ণ সাড়া দেয়নি। কিন্তু দ্রৌপদী যখন দু হাত তুলে দিলে, ছেড়ে দিলে, তখনই বস্ত্রভার কাঁধে নিয়ে দাঁড়ালেন শ্রীকৃষ্ণ। যোগক্ষেম বহন করে নিয়ে এলেন। তেমনি যে দু হাত ছেড়ে দিয়ে ডাকে, তাকে তুলে নেন ভগবান। তার ডাকাটি ঠিক।

'শোন, নিয়ে যা গরদখানা। তোর নিজের জন্যে বলছি না, তোর মা'র জন্যে।'

'মা'র জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষে করতে যাব কেন?'

'ভিক্ষে?'

'তা ছাড়া আবার কি! মা আমার কাছে চেয়েছেন। আমাকে বলেছেন কিনে দিতে। যখন উপার্জন করতে পারব তখন কিনে দেব। আপনার কাছ থেকে ভিক্ষে করে নেব কেন?'

নরেনের তেজ দেখে প্রসন্নবয়ানে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'এই না হলে নরেন! আমরা হলুম নর আর তুই যে নরের ইন্দ্র।'

কিছুতেই নিল না নরেন। গরদের কাপড় মা'র কত দরকার, আকস্মিক ভাবে পেয়ে গেলে কত খুশি হতেন—তা জেনেও টলল না একচুল। মা আমার কাছে চেয়েছেন, আমি রোজগার করে তা কিনে দেব। কিন্তু হাত পেতে ভিক্ষে নিতে যাব কেন? না, কিছুতেই ভিক্ষে করব না। স্বয়ং ভগবানের কাছেও নয়।

নরেন চলে গেলে ডাকলেন রামলালকে। বললেন, তোকে একটা কাজ করতে হবে রামনেলো!

কি কাজ?

'কাল শিগ্‌গির করে খেয়ে নিয়ে চলে যাবি কলকাতায়। সেই শিমলেয় নরেনের বাড়িতে। বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যখন বুঝবি নরেন বাড়িতে নেই, সটান চলে যাবি তার মা'র কাছে। ঠিক তার মা'র হাতে এই গরদখানা আর এই মিছরির থালা

পৌঁছে দিয়ে আসবি। বুঝলি? বলবি, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। কি, পারবি তো?'
পারব।
'দেখিস বাইরে থেকে যেন ডাকাডাকি করিসনে।' নরেনকে যেন কত ভয় ঠাকুরের।
'দেখিস অন্যের হাতে গিয়ে যেন পড়ে না। নরেন টের পেলে দরজা বন্ধ করে দেবে।'
কিন্তু ঠাকুর যখন নিজে নরেনকে খুঁজতে আসেন, বাড়ির ভিতর ঢোকেন না। বাইরে থেকে বলেন, 'নরেন কোথায়? নরেনকে ডেকে দাও।'
কিন্তু রামলালের জন্যে অন্য ব্যবস্থা। তাকে তাগ বুঝে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে। ঢুকতে হবে নরেনের দৃষ্টি এড়িয়ে।
চাদরের তলায় থালা আর কাপড় লুকিয়ে গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে আছে রামলাল। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের তিন নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। দুপুরের রোদ উঠে এসেছে মাথার উপর। চারদিক ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কখন না-জানি নরেন বেরোয় বাড়ি থেকে। তার দৈনন্দিন চক্রাবর্তে।
কি হল? নরেন আজ আর বেরুবে না নাকি?
না, ঐ বেরুচ্ছে। খুলেছে সদর দরজা। মলিন চাদরখানা গায়ে ফেলে চলেছে পথ দিয়ে। অমনি ঐ ফাঁকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে রামলাল। একেবারে ভুবনেশ্বরীর দরবারে।
'আপনাকে এই মিছরির থালা আর গরদের কাপড় পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুর।'
গরদের কাপড়! পাঠিয়ে দিলেন লোক দিয়ে! হাসলেন ভুবনেশ্বরী। কি করে জানলেন তিনি? তিনি কি দূরের ভাষা শুনতে পান? শুনতে পান মনের মৌন? বললেন, 'এইখানে কি কথা হল বিলের সঙ্গে, তাই দক্ষিণেশ্বরে অমনি টেলিগ্রাম হয়ে গেল?'
কেন হবে না? তিনি খুব কানখড়কে। সব শুনতে পান। যত ডেকেছ যত কেঁদেছ সব শুনেছেন। শুধু কথাটিই শোনেন না, বলতে না পারার ব্যথাটিও শোনেন। এক মুসলমান নমাজের সময় হো আল্লা হো আল্লা বলে খুব চেঁচিয়ে ডাকছিল। একজন তার চীৎকার শুনে বললে, তুই অত চেঁচাচ্ছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান। শুনতে পান তোর অস্ফুটতম দীর্ঘনিশ্বাস।
নরেন বাড়ি ফিরে এসে দেখল মা গরদের কাপড় পরে বসে আছেন পূজার ঘরে।
এ কে ওস্তাদ বীণকার! সব সুরের রাগিণীই যেন জানেন খেলতে। কখনো আঘাতে কখনো আনন্দে, কখনো কড়িতে কখনো কোমলে। শুধু তার বাঁধা সুর বাঁধার মুখেই যন্ত্রণা। এই বুঝি ছিঁড়ে গেল তার, শুরু হল বেসুরের আর্তনাদ। বিচ্ছিন্ন তারের ঝঙ্কারকে কবে নিয়ে যেতে পারব একটি সঙ্গীতের সমগ্রতায়? পৃথক-পৃথক জিজ্ঞাসাকে গ্রথিত করতে পারব একটি মহাবিশ্বাসের মূলসূত্রে?
যত দিন তা না পারি তত দিন হাজরার কাছে গিয়ে বসি।
দক্ষিণেশ্বরে বসে জপ করে হাজরা। তারই মধ্যে আবার দালালির চেষ্টা করে। বাড়িতে ক'হাজার টাকা দেনা আছে তা শোধবার ফিকির খোঁজে। জপ করে তার বেজায় অহঙ্কার। রাঁধুনে বামুনদের কথায় বলে, ওদের সঙ্গে কি আমরা কথা কই?

শোনো কথা! রাঁধুনে বামুনরা যেন আর মানুষ নয়!
শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছে সেদিন। ইচ্ছে দু-এক রাত্তির থেকে যায় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাকে যত্ন করে থাকতে বললেন। কিন্তু হাজরা ঝামটা মেরে উঠল। বললে, 'এ ঘরে নয়, ওকে খাজাঞ্চির ঘরে পাঠিয়ে দাও।'
মানেটা বুঝতে পেরেছেন ঠাকুর। মানেটা আর কিছুই নয়, এখানে থাকলে পাছে হাজরার দুধ-মিষ্টিতে ভাগ বসায়। যদি তার বরাদ্দে কিছু টান পড়ে। এত হিসেবী এত স্বার্থপর! ঠাকুর ঝলসে উঠলেন, 'তবে রে শালা! গোঁসাই বলে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর সংসারে থেকে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে নানা কাণ্ড করে—এখন একটু জপ-তপ করে তোর এত অহঙ্কার হয়েছে! লজ্জা করে না?'
লজ্জা করবে কি! জটিল-কুটিল না হলে লীলারস জমবে কি করে?
কিন্তু নরেন বলে, 'হাজরা খুব ভালো লোক।'
'তুমিও একদিন বলবে, আমি বলে রাখছি।' হাজরা লক্ষ্য করে ঠাকুরকে : 'এখন আমাকে তোমার ভালো লাগছে না, কিন্তু দেখো, পরে আমাকে তোমার খুঁজতে হবে।'
আমি হচ্ছি সংশয়। আমি হচ্ছি স্বার্থপরতা। আমি হচ্ছি ব্যবসাবুদ্ধি। সংশয় ছাড়া প্রত্যয়ের দাম কোথায়? স্বার্থপরতা না থাকলে কোথায় থাকবে আত্মত্যাগের মহিমা? ব্যবসাবুদ্ধিতে শেষ পর্যন্ত কুলোবে না বলেই তো শরণাগতির শান্তিজল।
থেকে-থেকে রসিকতা করে। সত্ত্বগুণের রঙ শাদা, রজোগুণের লাল, তমোগুণের কালো। সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, রজ তম ঈশ্বর থেকে তফাত করে। হাজরাকে জিগগেস করলেন ঠাকুর : 'বলো তো, কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে?'
'নরেনের ষোলো আনা।' নির্লিপ্ত মুখে বললে হাজরা। 'আমার এক টাকা দুই আনা।'
'বলো কি? আর আমার?'
'তোমার এখনো লালচে মারছে—তোমার বারো আনা।'
বাইরের বারান্দায় হাজরার কাছে গিয়ে বসেছে নরেন। হাজরাও অভাবী লোক, জীবিকার্জনের জন্যে সংগ্রাম করে, আবার সেই সঙ্গে নিবিষ্ট নিষ্ঠায় জপধ্যান করে, তারই জন্যে বোধ হয় পক্ষপাত। কিন্তু বেশিক্ষণ ঠাকুরকে না দেখেও থাকা যায় না। বারান্দা ছেড়ে ঘরের মধ্যে এসে বসল নরেন।
'তুই বুঝি হাজরার কাছে বসেছিলি?' বললেন ঠাকুর, 'আহা, তুই বিদেশিনী, সে বিরহিণী। হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।'
সবাই হেসে উঠল।
'হাসলে কি হবে? আমি তাকে বলি, তুমি শুধু বিচার করো তাই তুমি শুষ্ক। সে বলে, আমি সৌরসুধা পান করি, তাই শুষ্ক। যদি শুদ্ধা ভক্তির কথা বলি, যদি বলি শুদ্ধ ভক্ত টাকাকড়ি কিছু চায় না, সে বিরক্ত হয়, বলে, কৃপাবন্যা এলে নদী তো উপচে যাবেই খাল ডোবাও পূর্ণ হবে। শুদ্ধা ভক্তিও হয়, আবার ষড়ৈশ্বর্যও হয়, টাকাকড়িও হয়। কি হয় না হয় কে বলবে?'

কৃপাবৃষ্টি অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে দিবানিশি। সেই বৃষ্টির জল ধরি তেমন পাত্রই এখনো হতে পারছি না। কিন্তু আমি যদি তোমার কৃপাপাত্র না হই, তবে আর কোথায় পাবে তোমার কৃপার পাত্র?
নরেন অন্য কথা পাড়ল। বললে, 'গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল। আপনার কথা।

'কি কথা?' একটু বোধ হয় কৌতূহলী হলেন ঠাকুর।
'এই আপনি কিছু লেখাপড়া জানেন না—আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা।'
'তা তো ঠিকই বলছিলি। আমি শুধু সার কথা জেনে নিয়েছি। বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; আর গীতার সার ত্যাগী। আর বই পড়ে কি হবে? জানবার পর এখন শুধু সাধন-ভজন। সর্ষে পিষে তেল, মেঁদিপাতা বেটে রঙ আর কাঠ ঘষে আগুন বের করো।'
আরো এক দিন তর্কের মুখে বলেছিল নরেন : 'তুমি দর্শনশাস্ত্রের কী জানো? তুমি তো একটা মুখ্খু।'
সেবার ঠাকুর করেছিলেন রসিকতা। বলেছিলেন, 'নরেন আমাকে যত মুখ্খু বলে আমি তত মুখ্খু নই।' বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে লিখে দেখিয়ে দিয়েছিলেন : 'আমি অক্ষর জানি।'
ঠাকুরের ইচ্ছে নরেন একখানা গান গায়। মাস্টারকে বললেন তানপুরাটা পেড়ে দিতে। নরেন বাঁধতে লাগল তানপুরা।
বাঁধা আর শেষই হয় না। বিনোদ বললে, 'বাঁধা আজ হবে, গান আরেক দিন হবে।'
আর সকলের সঙ্গে ঠাকুরও হেসে উঠলেন। বললেন, 'ইচ্ছে করছে তানপুরাটা ভেঙে ফেলি। কি টং-টং শুরু হয়েছে—তারপর আবার তানা নানা নেরে নুম হবে।'
'যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্ত হয়।' ফোড়ন দিলে ভবনাথ।
নরেন ঝলসে উঠল : 'সে না বুঝলেই হয়।'
সদানন্দ ঠাকুর প্রসন্ন স্নেহে বলে উঠলেন, 'ঐ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।'
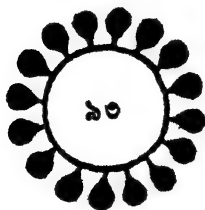
দারিদ্র্যের রন্ধ্র দিয়ে উঁকি দিতে চাইল অবিদ্যা। নানা ভাবে কি পরীক্ষা করে নেবে না? তুমি কি স্ফটিক দিয়ে তৈরি, না, ইস্পাত দিয়ে। পরীক্ষায় না ফেলে

কি করে বুঝব তুমি দুর্বাসনারুক্ষ্ম, নারীকে প্রত্যাহার করতে পেরেছ?
একটি সুন্দরী মেয়ের নজর ছিল নরেনের উপর। শুধু সুন্দরী নয়, ধনিনী। ভাবলে, তার এই দুর্যোগের সুযোগে টোপ ফেলি। গোপনে প্রস্তাব করে পাঠাল, সভূমি-ভূষণা আমাকে গ্রহণ করো। শুধু দারিদ্র্যমোচন হবে না, নিঃসঙ্গতার অবসান হবে। রুক্ষবেশ ছেড়ে ধরো এবার রাজবেশ।
ধ্যান ভেঙে মুনিরা তপস্যার ফল বিসর্জন দিয়েছে নারীর পায়ে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ও-সব মুনি-ঋষির চেয়ে দৃঢ়ব্রত।
প্রথমটা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিল নরেন। মেয়েটা তবু ফেরে না। শেষে কাঁদতে শুরু করল। ভাবলে নারীর বল, চোখের জল। ছলনাজাল গুটিয়ে বিস্তার করলে শোকজাল। যদি এবার একটু বিগলিত হয় সেই পাষাণপিণ্ড।
কিন্তু পাষাণের চেয়েও কঠোর নরেন্দ্রনাথ। ধ্রুব, নির্বিচল। তার শুধু এক প্রার্থনা : 'ব্রতপতে, ব্রতং চরিষ্যামি, সত্যং উপৈমি অনৃতাং।' হে ব্রতপতি, যে দীক্ষা দিয়েছ তাই আমাকে রক্ষা করুক। মিথ্যা থেকে দূরে থেকে যেন সত্যেই শরণাগত থাকি। আর কাউকে চিনি না তুমিই শক্তি দাও। সাহস দাও।
সেই রজনীরঞ্জিনী দুঃখশৃঙ্খলা নারী চলে গেল দুয়ার থেকে।
কিন্তু এবার যে এল প্রলুব্ধ করতে, সে বারবধূ। সে জ্বলন্ত দুষ্কৃতাগ্নিশিখা। গুরুকে এসেছিল পরখ করতে, শিষ্যকে একবার দেখবে না বাজিয়ে?
আগে বীর্যলাভ, পরে ব্রহ্মলাভ। আগে বীর্যানন্দ, পরে ব্রহ্মানন্দ।
বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বাগানবাড়িতে গিয়েছে নরেন। কি অমন দারিদ্র্যদুঃখে ম্লান হয়ে আছিস। চল ফুর্তি করবি চল। 'ন পুণ্যং সুখতঃ পরং।' সুখের চেয়ে আর পুণ্য নেই। দু ঢোক খেলেই দেখবি সমস্ত জগৎসংসার একটা রঙিন ফানুস হয়ে উড়ে চলেছে।
রাজী হয়নি প্রথমে। সে কি কথা, তুই না গেলে গান গাইবে কে? ফুর্তির মুখে হরিনাম—যেন মুড়ির সঙ্গে ফুটকড়াই। যেমন ভোজন তেমন দক্ষিণা। চল চল মনমরা হয়ে বসে থাকিস নে মুখ গুঁজে।
গান গাইবে এই শুধু জানে নরেন। কিন্তু এ কাকে পাঠিয়ে দিয়েছে বন্ধুরা? মাংস-পাঞ্চালীকায়া শৃঙ্গারবেশাঢ্যা রমণী। নর্ববিহঙ্গের বন্ধনবাগুরা।
বুঝল এও এক মহামায়ার খেলা। বিচলিত হল না। বিমোহিত হল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'
স্ফুরৎচকিতচক্ষে তাকাল একবার মোহিনী। উত্তর দিল না।
'তোমার বাবার নাম কি? বাড়ি কোথায়? কেন পা বাড়ালে এ পথে?'
আবার কটাক্ষগর্ভ নেত্রপাত। আবার স্তব্ধতা।
'নিজের কথা একবার ভাবো? ভবিষ্যতের কথা? কি হবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? নিত্য ভিক্ষায় তনুরক্ষাই সাধনা? কিন্তু যখন ভিক্ষে আর মিলবে না?'
অপাঙ্গবীক্ষণ নেই আর মোহিনীর। চোখের দৃষ্টিটি এবার স্থির হয়েছে, শান্ত হয়েছে। ভরে উঠেছে তাতে হতাশার কুয়াশা, লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে!

'যখন থাকবে না এই শরীর? কি সম্বল নিয়ে যাবে তুমি ওপারে?'
এবার বুঝি দিগদর্শন হল মেয়েটির। দেখল চারদিকে শুধু ধু-ধু করছে মরুভূমি। কোথাও এতটুকু পিপাসার জল নেই, নেই অনুতাপের অশ্রুলেখা।
দ্রুতপায়ে চলে গেল। বললে গিয়ে বন্ধুদের, 'অমন লোকের কাছে পাঠাতে আছে আমাকে?'
ঠাকুর নরেনকে বলেন, শুকদেব।
তাই শুনে বিশ্বনাথ দত্ত ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'ব্যাসদেবের ব্যাটা শুকদেব।'
কায়রোতে এক দিন পথ হারিয়ে ফেলেছেন বিবেকানন্দ। সঙ্গীদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলতে-বলতে। সঙ্গী সস্ত্রীক ফাদার লয়সন, শিকাগোর মিস ম্যাকলিয়ড আর সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা এম্মা ক্যালভি। পথ হারিয়ে চলে এসেছেন একটা নোংরা গলির মধ্যে।
দুদিকে সার-সার ঘর, দরজা-জানলা খোলা। সেই সব জানলা আর দরজার সামনে অর্ধনগ্ন নারীর দল বসে আছে দেহের বেসাতি সাজিয়ে। কিছু লক্ষ্য করেননি স্বামীজী, ঈশ্বরোন্মাদনার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আছেন। চারদিকে শুধু ঈশ্বর-প্রতিভাস।
কিন্তু তাঁর লক্ষ্য না ফিরিয়ে ছাড়বে না মেয়েগুলো। কে একটা মুখরা মেয়ে তাঁকে ডাকতে লাগল হেসে-হেসে। দেহে যৌবনের এমন দিব্যশোভা নিয়ে কোথায় তুমি চলে যাচ্ছ, উদাসীন!
সঙ্গীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। কি করে অবিলম্বে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে স্বামীজীকে তার জন্যে তাড়া দিতে লাগল। কিন্তু সহসা বিবেকানন্দ দল ছেড়ে সেই পণ্যাঙ্গনাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কি করেছ! নিজেদের দেবীত্বকে ঢেকেছ এ কোন সৌন্দর্যসজ্জায়! আত্মস্বরূপকে দেখ, দেখ সেই দেবীবৈভব! এ করেছ কি!' বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। রূপাজীবাদের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন কেঁদেছিলেন যীশুখৃষ্ট।
মেয়েগুলির মুখে আর কথা নেই। একজন এগিয়ে এসে স্বামীজীর গৈরিক বাসের এক প্রান্ত স্পর্শ করল, সেই প্রান্তভাগ চুম্বন করে ভাঙা-ভাঙা স্পেনী ভাষায় বলতে লাগল, 'হোমব্রি ডে ডিওস, হোমব্রি ডে ডিওস—দেব-মানব, দেব-মানব।'
আরেকজন চোখ ঢাকল দুহাতে। স্বামীজীর সেই চক্ষুচ্ছটা যেন সে সইতে পারছে না। তার পাপলিপ্ত আত্মা যেন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।
চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল বকে গিয়েছে নরেন্দ্রনাথ, নাস্তিক হয়ে গিয়েছে। মদ আর তার অনুষঙ্গ কিছুতেই তার অরুচি নেই। কেউ যদি এ প্রশ্ন নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়, কি উত্তর পেলে সে সুখী হবে বুঝতে পেরে নরেন বলে, 'বেশ করেছি। যদি কেউ বুঝে থাকে ও-সব ক্ষণিক সুখভোগেই সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকা যায়, তবে তাকে তা বুঝতে দিতে আপত্তি কি? যাও, সরে পড়ো, যত পারো নিন্দা করো মনের সুখে। নিন্দা করে আনন্দিত হও।'
কথা কানে হাঁটে। দেয়ালে শোনে। বাতাসে লেখা হয়ে যায়।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কানে উঠল। তাও আবার কানে এল নরেনের। তবে আর কি, ঠাকুরও এবার বিশ্বাস করুন তাঁর নরেন মন্দিরের দ্বার ছেড়ে চলে এসেছে নরকের দরজায়! তাঁর সেই বৃহদ্ব্রতধর ব্রহ্মতেজা নরেন!
ভবনাথ তো একেবারে কেঁদে পড়ল ঠাকুরের পায়ে।
'নরেনের এমন হবে এ কথা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি।'
ঠাকুর পা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, 'দূর শালারা, চুপ কর। আমার মা'র কথার চেয়ে তোদের কথা বড় হবে? আমার মা বলে দিয়েছেন, সে কখনো ও রকম হতে পারে না, তার জীবনে যোষিৎসঙ্গ হবে না কোনোদিন। তার জন্যে ভাবতে হবে না তোদের। ফের যদি ও কথা বলিস তোদের মুখ-দর্শন করব না।'
কথা শুনে আনন্দে বুক ভরে গেল নরেনের। সত্যদর্শী অন্তর্যামী ঠিক দেখতে পেয়েছেন তার অন্তরের মানচিত্র। তিনিই তাকে রক্ষা করবেন আমরণ।
কেউ যদি কখনো বলে, সে কি মশাই, এ তো নরেনও বলে, তখন ঝলসে ওঠেন ঠাকুর: 'এ তো লরেন বলে! লরেন বলতে পারে, তা বলে তুই বলতে যাসনি। তুই আর লরেন এক না।'
'আপনি নরেনকে এত ভালোবাসেন কেন? নিজের ছোট হুঁকোয় করে নরেনকে তামাক খেতে দিলেন, হুঁকোটা যে এঁটো হয়ে গেল!' আরেকজন কে নালিশ করলে ঠাকুরের কাছে: 'ও যে হোটেলে খায়। ওর এঁটো কি খেতে আছে?'
'ওরে শালা, তোর কি রে? নরেন হোটেলে খাক বা নাই খাক, তাতে তোর কি? তুই শালা যদি হবিষ্যিও খাস আর নরেন যদি হোটেলে খায়, তা হলেও তুই নরেন হতে পারবি নে।'
কেবল নরেন আর নরেন! নরেন যে আপনাকে গাল দেয় তার হিসেব রাখেন?
'নরেন আমাকে গাল দেয়, কিন্তু আমার ভিতরে যে শক্তি আছে তাকে সে মানে, তাকে সে গাল দেয় না।'
সে আশ্চর্য শক্তিই বরাবর রক্ষা করে এসেছে নরেনকে। সে শক্তিই তো ত্রৈলোক্য-কর্ষিণী বংশীধ্বনি। নিরন্তর বেজে চলেছে বাতাসপ্রবাহে। শোণিতপ্রবাহে।
আমেরিকাতে একবার একটি মেয়েকে দেখে খুব সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল স্বামীজীর। কোনো মন্দ ভাব থেকে নয়, অমনি। ইচ্ছে হয়েছিল আরেকবার দেখি। দেখা হল আরেকবার। কোথায় সুন্দরী। দেখলেন একটা বাঁদরের মুখ!
স্বপ্নে কখনো স্ত্রীলোক দেখেননি স্বামীজী। একবার কিন্তু দেখে ফেললেন। একটি স্ত্রীলোক মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। ইচ্ছে হল ঘোমটা খুলে মুখখানি দেখি। যাই ঘোমটা খোলা, অমনি দেখেন ঠাকুর!
'অন্যেরা কলসী বাটি, নরেন্দ্র জালা। অন্যেরা ডোবা পুষ্করিণী, নরেন্দ্র বড় দীঘি, যেমন হালদারপুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু বড় রুই, আর এরা সব পোনা, মৃগেল, কাঠিবাটা।' বলছেন ঠাকুর, 'নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়িতে তাই ডানদিকে বসে। আর ভবনাথের মেদি ভাব, ওকে তাই অন্য দিকে বসতে দিই।'
ওর বিষয়ে নালিশ করতে আসিসনে। ওকে আমার তামাক সাজতে পর্যন্ত দিই না,

দিই না শৌচের জল বইতে। ও সব কাজের জন্যে অন্য লোক আছে। তোরা আছিস।
'আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম—'
'কে নরেন্দ্র?' জিগগেস করলে প্রতাপ মজুমদার।
'ও আছে একটি ছোকরা।' বলতে লাগলেন ঠাকুর : 'আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দ্যাখ, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছে হয় না কি, এই রসের সাগরে ডুব দিই! আচ্ছা, মনে কর এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস। তা হলে তুই কোনখানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। কেন, কিনারায় বসবি কেন? সে বললে, বেশি দূরে গেলে ডুবে যাব আর প্রাণ হারাব। তখন আমি বললুম, বাবা, সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নেই। এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড হয় না।'
দুটোর একটা করো। হয় পাগলামি ছেড়ে দাও, নয় তো ঈশ্বরের নামে পাগল হও।
নববৃন্দাবন প্লে হচ্ছে কেশব সেনের বাড়িতে। নরেন শিব সেজেছে। ঠাকুর দেখতে গিয়েছেন। অভিনয়ের মধ্যেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'নরেনকে নেমে আসতে বলো। হ্যাঁ, ঐ বেশেই নেমে আসুক আমার সামনে। চোখের সমুখে দাঁড়াক একবার স্থির হয়ে, শিব হয়ে।'
নরেন ইতস্তত করছে। কেশব বললে, 'উনি যখন বলছেন তখন এস না নেমে।'
কে নামে, কে ওঠে!
নরেন অবতার মানে না, তাতে কি এসে যায়! এতে যেন আরো উথলে উঠেছে ঠাকুরের ভালোবাসা। নরেনের গায়ে হাত দিয়ে বলছেন, 'মান করলি তো করলি, আমরাও তোর মানে আছি রাই।'
ওরে, কতক্ষণ বিচার? নিমন্ত্রণ বাড়ির শব্দ কতক্ষণ শোনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি-তরকারি পড়ে, বারো আনা শব্দ কমে যায়। অন্যান্য খাবার পড়লে আরো কমতে থাকে। দই পড়লে তখন কেবল সুপসাপ। খাওয়া হয়ে গেলে নিদ্রা। তেমনি ঈশ্বরকে যত লাভ হবে ততই বিচার কমবে। তাঁকে লাভ হলে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হলে আর শব্দ বা বিচার থাকে না। তখন শুধু নিদ্রা—সমাধি।
নরেনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, মুখে হাত দিয়ে আদর করছেন আর বলছেন, 'হরি ওঁ! হরি ওঁ। হরি ওঁ।'
ক্রমশ বহির্জগতের হুঁশ চলে যাচ্ছে। একেই বুঝি বলে অর্ধবাহ্যদশা, যা শ্রীগৌরাঙ্গের হত। আশ্চর্য, এখনো নরেনের পায়ের উপর হাত, যেন ছল করে নারায়ণের পা টিপছেন। অত গা টেপা পা টেপা কেন? কেন কে বলবে! এ কি নারায়ণের পদসেবা, না, শক্তিসঞ্চার!
তারপর হাত জোড় করে বলছেন, 'একটা গান গা। নইলে উঠতে পারব কেমন করে? গোরাপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা।' বলেই নিজে গান ধরছেন : 'দেখিস রাই, যমুনায় যে পড়ে যাবি! সখি, সে বন কতদূরে। যে বনে আমার শ্যামসুন্দর। ঐ যে কৃষ্ণগন্ধ

পাওয়া যায়। আমি যে চলতে নারি—' উঠতে চেয়েই আবার বসে পড়ছেন। বলছেন, 'ঐ একটা আলো আসছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে আসছে আমাকে কে বলে দেবে! ধর একটা গান ধর—'
নরেন গান ধরল :

'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে
সন্ত লোক ভোলে শোক, তোমারে পাইয়ে—
কোথায় আমি অতি দীনহীন!'

ঠাকুরের নেত্র নিমীলিত। দেহ স্পন্দহীন। সমাধিস্থ।
সমাধিভঙ্গের পর বলছেন বিহ্বল কণ্ঠে, 'আমাকে কে লয়ে যাবে?' সঙ্গীহারা বালক যেমন অন্ধকার দেখে তেমনি।
'কে যায় অমৃতধামযাত্রী, আজি এ গহন তিমির রাত্রি, কাঁপে নভ জয় গানে।'
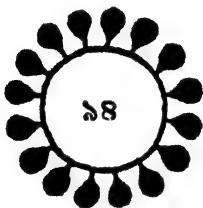
কেশবের খুব অসুখ। দেখতে এসেছেন ঠাকুর।
আগেরবার যখন অসুখ হয় তখন কালীর কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলেন। বলেছিলেন, মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তাহলে কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব?
এবার অসুখ কিছু বাড়াবাড়ি। এমনিতে কতবার গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। শেষ দিকে, একেবারে শুধু-গায়ে। ফল হাতে করে। এখন একেবারে বিছানা নিয়েছে।
'দেখ কেশব কত পণ্ডিত। ইংরিজিতে লেকচার দেয়, কত লোক তাকে মানে, স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে।' বলছেন ঠাকুর ভক্তদের। 'কিন্তু এখানে যখন আসে, শুধু-গায়ে। সাধুদর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসে। একেবারে অভিমানশূন্য।'
একদিন এসে কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে গিয়েছে। প্রতাপ মজুমদার বললে, আজ সব থেকে যাব এখানে। বাড়ি ফিরে আর কাজ নেই।
'না, না, আমার কাজ আছে। আমাকে যেতে হবে।' কেশব ব্যস্ত হয়ে উঠল।
'এই যে সেই মেছুনীর মত করলে।' ঠাকুর হেসে উঠলেন : 'আঁস-চুপড়ির গন্ধ না

হলে বুঝি আর ঘুম হয় না? এক মেছুনী মালিনীর বাড়িতে অতিথি হয়েছে। মাছ বিক্রি করে আসছে, তাই হাতে চুপড়ি। মালিনী তাকে ফুলের ঘরে শুতে দিয়েছে। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেল, কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। কি গো, ছটফট করছ কেন? জিগগেস করলে মালিনী। কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম আসছে না। মেছুনী মিনতি করল, আমার আঁস-চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পারো? তাই আনিয়ে দিল মালিনী। তখন আঁস-চুপড়িতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে মেছুনী ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল।'

গল্প শুনে কেশব আর তার দলের লোকের হাসি আর থামে না।

'রোগটি হচ্ছে বিকার। যে ঘরে বিকারী রুগী সেই ঘরেই আবার আচার-তেঁতুল। সেই ঘরেই আবার জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার-তেঁতুল—এই দেখ,' ঠাকুর তাকালেন সবাইয়ের দিকে, 'বলতে-বলতে আমার মুখে জল এসেছে। সামনে থাকলে কি হয় কে বলবে! মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার-তেঁতুল। ভোগবাসনা জলের জালা। আর সব কিনা এই রুগীর ঘরে।'

দিন কতক ঠাঁই-নাড়া হয়ে থাকো। কদিন এমন জায়গা ঘুরে এস যেখানে আচার-তেঁতুল নেই, জলের জালা নেই। চলে যাও নির্জনে। নীলের নিলয়ে। হয় নীল সমুদ্রে, নীল অরণ্যে, নয় নীল আকাশের নিঃসীমায়। নীল হচ্ছে অনন্তের রঙ, অবিনশ্বরতার রঙ। তোমার নির্জনতার রঙও হচ্ছে নীল। নির্জনে থাকতে-থাকতেই নীরোগ হবে। নীরোগ হয়ে ঘরে ফিরে এলে আর ভয় নেই।

'অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে তখনই চারদিকে বেড়া লাগে। পাছে ছাগল-গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে বেড়ার আর দরকার থাকে না। তখন হাতি বেঁধে দিলেও কিছুই হয় না গাছের। যদি নির্জনে সাধন করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করে বল বাড়িয়ে বাড়ি গিয়ে সংসারী করো, কামিনী-কাঞ্চন তোমার কিছু করতে পারবে না।'

দলের মধ্যে ছিলেন একজন সদরওয়ালা। বললেন, 'সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নেই, বাড়িতে থেকেও যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় এ জেনে মনে বড় শান্তি হল।'

'যা আছে হোথায় তা আছে হেথায়।' রামকৃষ্ণ বললেন দীপ্তস্বরে : 'ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভালো। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সঙ্গে যুদ্ধ তো করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসারে থেকেই সুবিধে। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে—রোগ হলে সেবা পর্যন্ত।'

দেখছ না আমাকে! সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ হয়ে সংসারীর শিরোমণি।

'আমার তো মাগ আছে। ঘরে-ঘরে ঘটি-বাটি আছে। হরে-প্যালাদের খাইয়ে দিই। আবার হাবির মা এলেও ভাবি।'

পিঁপড়ের মত সংসারে থাকো। বালিতে-চিনিতে, নিত্যে-অনিত্যে, মিশেল হয়ে আছে। বালি ছেড়ে চিনিটুকু নাও। থাকো পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে কিন্তু গা ঝকঝক করছে। থাকো পানকৌটির মত। পাখা ঝাপটেই গায়ের জল ঝেড়ে ফেল। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো।

'একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল, আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম। স্ত্রীটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বললে, কেন মিছে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্যে দশ ঘরে যেতে না হয়, তব যাও। আর তাই যদি হয় এই এক ঘরই ভালো।'

তার মানে জ্ঞানলাভ করে সংসারে থাকো।

'জ্ঞান হয়েছে তা কেমন করে জানব?' জিগগেস করলেন সদরালা।

'জ্ঞান হলে ঈশ্বরকে আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তখন তিনি নন। তিনি তখন ইনি। হৃদয়মধ্যে বসে আছেন।'

অন্তরের মধ্যেই সেই স্থিরধাম। কেউ চলেছে দ্বারকানাথ, কেউ মথুরায়, কেউ বা কাশীতে। কিন্তু প্রভু রয়েছেন অন্তরের নিরালায়। পিপাসিত হয়ে কোথায় যাচ্ছ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীতে, মানস-সরোবরেই সঞ্চিত আছে জলপুঞ্জ। সেই মন-সরসীতে এবার স্নান করো।

অনেক রুদ্ধ ঘরে কান পেতেছ। এবার নিজের অন্তরে এসে কান পাতো। এবার শুনতে পাবে সে দুয়ার খোলার শব্দ।

সদরালার তবু সংশয় যায় না। বললেন, 'মশায়, আমি পাপী, কেমন করে বলি যে তিনি আমার ভিতরে আছেন?'

একটু যেন বিরক্ত হলেন ঠাকুর। বললেন, 'ঐ তোমাদের পাপ আর পাপ। এ সব বুঝি খৃষ্টানি মত? সে দিন একটু বাইবেল পড়া শুনলাম। তাতে কেবল ঐ এক কথা। পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি, রাম কি হরি বলেছি, আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। দৃপ্ত বিশ্বাস। তপ্ত বিশ্বাস।'

'মশায়, কেমন করে অমন বিশ্বাস হবে?'

'তাঁতে অনুরাগ করো। তাঁকে ভালোবাসো। ডাকো। তাঁর জন্যে কাঁদো—'

'কেমন করে ডাকবো?'

ডাক দেখি মন ডাকের মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে। কেমন করে ডাকবো! তাও আমায় শিখিয়ে দিতে হবে?

'আমি মা বলে এইভাবে ডাকতাম—মা আনন্দময়ী, দেখা দিতে যে হবে! আবার কখনো বলতাম, ওহে দীননাথ জগন্নাথ, আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ। আমি জ্ঞান-হীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন—আমি কিছুই যে জানি না—দয়া করে দেখা দিতে যে হবে—'

ঠাকুরের করুণ স্বরে সকলের হৃদয় গলে গেল। মহিমাচরণ তো কেঁদে আকুল।

ওরে বিশ্বাস কর, তাঁর নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস? অন্ধ বিশ্বাস?

ওরে, অন্ধ হওয়াই সুবিধে। যার চোখ আছে সে তো নিজের অহঙ্কারে ঘুরে বেড়ায়। যার চোখ নেই তার হাত একজনকে এসে ধরতে হয়। ওরে তুই হাত-ধরা লোক কোথায় পাবি? প্রভুই এসে তার হাত ধরবেন।

কিন্তু কেশবের এমন অসুখ হল কেন? শুধু খাটতে-খাটতে দেহপাত হল। শুধু লেখা আর লেখা। বক্তৃতা আর বক্তৃতা।

যোগীন যখন প্রথম ঠাকুরের ঘরে এসে প্রণাম করে দাঁড়ায়, তার হাতে একখানা খবরের কাগজ।

'কোত্থেকে আসছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'এই দক্ষিণেশ্বর থেকেই। আমি নবীন চৌধুরীর ছেলে।'

চিনতে পারলেন। দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের নাম কে শোনেনি? এ'দের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খেত সেকালে। যেমন অন্যের জাত নিতে পারতেন তেমনি জাত দিতেও পারতেন অকাতরে। কিন্তু ঠাকুর আশ্চর্য হলেন, দক্ষিণেশ্বরের লোক তাঁকে চিনল কি করে? প্রদীপের নিচেই তো অন্ধকার। মন্দিরের যত কাছে, ঈশ্বরের তত দূরে। সামনের মাঠকে হলদে লাগে, দূরের মাঠই সবুজ।

দক্ষিণেশ্বরের লোক বেশি পাত্তা দেয় না ঠাকুরকে। গে'য়ো যুগীরই ভিখ মেলে না। তাই তিনি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এখানকার কথা কি করে জানলে?'

'খবরের কাগজ থেকে।'

'কোথাকার কাগজ?'

'কেশব সেনের। কেশব সেন আপনার সম্বন্ধে লিখেছেন কাগজে।'

কি লিখেছে, পড়িয়ে শোনাও তো? এমন কথা জিগগেসও করলেন না ঠাকুর। ডাকিয়ে আনালেন কেশববাবুকে। বাহবা দিলেন না। বরং ধমকিয়ে বললেন, 'আমি কি মান-ভিখারী? আমি কি ইদানীং-সাধু?'

কেশব হাত জোড় করে বসে রইল।

'যা করেছ করেছ, আর লিখো না।'

কিন্তু কেশবের কথা কে লেখে! একটা লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—চেয়ে দেখ কত বড় শক্তি! কিন্তু আজ ব্যাধির কবলে পড়ে কী নিঃসহায়!

শীতকাল। ঠাকুর দেখতে এসেছেন কেশবকে। গায়ে সবুজ রঙের বনাতের গরম জামা। জামার উপর আবার একখানি বনাত। সন্ধ্যা হয়-হয়। কেশবের বাড়ির লোকেরা ঠাকুরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন উপরে। বৈঠকখানার দক্ষিণে বারান্দা। সেখানে তক্তপোশ পাতা। তার উপরে বসাল ঠাকুরকে। বসে আছেন তো বসেই আছেন। কেউ নিয়ে যাচ্ছে না ভিতরে। তাঁর কেশবের পাশটিতে। বসে-বসে তার কষ্ট-ভরা কাশির আওয়াজ শুনছেন।

কত কীর্তন করেছে কেশব। ঠাকুরকে মাঝখানে রেখে কত নেচেছে। কেশবকে বেশি-দিন না দেখতে পেলেই অধীর হয়েছেন। সেবার যেন বড় বেশি ছটফট করছেন। রাজেন মিত্তির পাশে বসা, তাকে বলছেন বার-বার, দ্যাখো দিকিন কেশব আসছে কিনা। রাজেন মিত্তির একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসে। কই, কোথায় কেশব! আবার কোথাও একটু শব্দ হল। দ্যাখো আবার দ্যাখো। আবার ফিরে এল রাজেন। কেশবের কেশাগ্রেরও দেখা নেই। ঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন, 'পাতের উপর পড়ে পাত। রাই বলে, ওই এল বুঝি প্রাণনাথ।' তার পরে স্বরে অনুযোগ মেশালেন : 'হ্যাঁ, দ্যাখো, কেশবের চিরকালই কি এই রীত? আসে আসে আসে না!'

কিন্তু সেদিন না এসে আর পারল না কেশব। কিন্তু সঙ্গে সেই দলবল।

'রাজ্যের কলকাতার লোক জুটিয়ে এনেছেন! আমি কিনা বক্তৃতা করব! তা আমি পারবো-টারবো-নি। করতে হয় তুমি করো। আমি তোমার খাবো দাবো থাকবো—' তবে তুমি যদি একা-একা আস, বেশ হয়। দুজনে মিলে মনের সুখে কথা কই সংগোপনে। ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে, আমিও একবার টানলাম।
'কেশব, তুমি আমায় চাও, কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের সেদিন বলছিলুম, এখন আমরা খচমচ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন। তারপর তুমি যখন এলে, বললুম, ঐ গো তোমাদের গোবিন্দ আসছেন। আমি এতক্ষণ খচমচ করছিলুম, জমবে কেন?'
ঐ দল-দল করেই গেল! পাকা আমি কি দল করতে পারে? আমি দলপতি, আমি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি, এ আমি কাঁচা আমি।
'কিন্তু, তোমরা এত দেরি করছ কেন? কতক্ষণ বাইরে বসে থাকব? আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।'
'তিনি এখন এই একটু বিশ্রাম করছেন। একটু পরেই আসছেন এখানে।'
'হ্যাঁ গা, তার এখানে আসবার কি দরকার? আমিই যাই না কেন ভিতরে!'
ডাক্তার বলে গেছে বিশ্রামে রাখতে। তাই কেশবের শিষ্যরা খুব হুঁশিয়ার। এই একটু চুপচাপ আছে কেশব। এখুনি যদি আবার তাকে ব্যস্ত করা হয়—
কিন্তু ঠাকুরের ধৈর্য মানছে না। যাই-যাই করছেন।
'আজ্ঞে এই একটু পরেই আসছেন তিনি।'
'যাও, তোমরাই অমন করছ। না, আমিই ভিতরে যাই—'
প্রসন্ন ভুলোতে এল ঠাকুরকে। কেশবের কথা ছাড়া আর কথা কোথায় মনভুলানো! প্রসন্ন বললে, 'তাঁর অবস্থা আরেকরকম হয়ে গেছে। আপনারই মত মা'র সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শুনে কাঁদেন-হাসেন।'
এত দূর! সেবার কেশবকে বললেন, বলো ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব তো বললেই, তার শিষ্যরাও বললে। আবার বললেন, বলো, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব। তখন কেশব বললে, 'মশায়, এখন এত দূর নয়। তা হলে লোকে গোঁড়া বলবে।'
কালী শুধু মানা নয়, কালীর সঙ্গে কথা বলা! শুনেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হয়েছে। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরকে সবাই নিয়ে এল সে ঘরে। আসবাবে ঠাসা, চেয়ার, কৌচ, আলনা, গ্যাসের আলো। ঠাকুর বসলেন একটা কৌচে। তখনো যেন ভাবাবেশ কাটেনি সম্পূর্ণ। ঘরের জিনিসপত্র লক্ষ্য করে বললেন, 'আগে এ সব দরকার ছিল। এখন আর কী দরকার!' বলতে-বলতেই আবার আবেশ উপস্থিত। বলছেন, 'এই যে মা এসেছ! এসো। আবার বারানসী শাড়ি পরে কী দেখাও! হাঙ্গামা কোরো না। বোসো গো বোসো।'
এই কেশবের বাড়িতেই আগে একবার বলেছিলেন ঠাকুর, 'মা গো, এখানে তুই আসিসনি। এরা তোর রূপ-টুপ মানে না। কেবল নিরাকার নিরাকার করে।'
আজ একেবারে সটান এসে পড়েছেন। তায় আবার সেজে-গুজে এসেছেন।

হরীশ ঠিকই বলে। ঠাকুরকে দেখিয়ে বলে, 'এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে। তবে ব্যাঙ্কে টাকা দেবে। নইলে টাকা নয়, ফাঁকা।'
ঠাকুর বলছেন আপন মনে, 'দেহ হয়েছে আবার যাবে। দেহ আর আত্মা। কিন্তু আত্মা যাবে না। যেমন শুপুরি। কাঁচা বেলায় ফলে আর ছালে লেগে থাকে, আলাদা করা যায় না। কিন্তু পাকলে শুপুরি আলাদা হয়ে যায় ছাল থেকে। কিন্তু পাকবে কখন? যখন তাঁর দর্শন মিলবে। তখন দেহ আলাদা আত্মা আলাদা হয়ে যাবে।'
কেশব আসছেন। পুব দিকের দরজা দিয়ে আসছেন। আসছেন দেয়াল ধরে-ধরে। কী হয়ে গিয়েছে চেহারা! কঙ্কালের উপর শুধু একটা চামড়ার প্রলেপ! চোখ মেলে তাকানো যায় না। বুক ফেটে যায়!
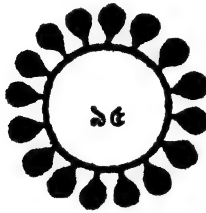
এই সেই বীর-বিদ্রোহী ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্র।
কেশবের সমস্ত ধর্মসাধনার মূলে হচ্ছে তার মা, সারদাসুন্দরী। কেশব প্রাচীন ধর্ম-কর্ম মানছে না এই তাঁর বিষম চিন্তা। অভিভাবকরা ঠিক করেছেন কুলগুরুর মন্ত্র দিতে হবে তাকে। দিন ঠিক হয়েছে। গুরুদেব উপস্থিত। সব উপকরণ সাজিয়ে মা বসে আছেন। অভ্যাগত-নিমন্ত্রিতের ভিড় বাড়ছে। কিন্তু যাকে উপলক্ষ্য করে এই আয়োজন তার দেখা নেই। কেশব চলে এসেছে দেবেন ঠাকুরের আশ্রয়ে। বলে পাঠিয়েছে পৌত্তলিক গুরুমন্ত্র আমি নেব না।
বাড়ির আর সবাই ঘোরতর বিরক্ত, পারে তো ছিঁড়ে খায় কেশবকে, কিন্তু সারদা-সুন্দরী নিজের দুঃখকে ছেলের সত্যের চেয়ে বড় করে দেখতে পেলেন না। ছেলে যদি সত্যভ্রষ্ট হয় সে দুঃখ যে দ্বিগুণ হয়ে বাজবে।
ব্রাহ্মসমাজের কখানা বই মা'র হাতে দিয়ে গেল কেশব। বললে, পড়ে দেখ।
সুন্দর-সুন্দর কথা। কেশব ব্রহ্মজ্ঞানী হবে, গুরুর থেকে মন্ত্র নেবে না—কি এর তাৎপর্য ভালো বুঝতে পারেননি সারদা। কোথায় সে ব্রাহ্মসমাজ কে জানে। কিন্তু এ বইয়ে যা লেখা আছে তা যদি ওদের ধর্ম হয় তো মন্দ কি। গুরুঠাকুরকে দেখালেন বই। বললেন, 'কেশব কি ধর্ম পেয়েছে দেখুন।'
গুরুঠাকুর পড়লেন যত্ন করে। বললেন, 'এ তো খুব ভালো ধর্ম। তুমি ভেবো না, তোমার কেশব যে পথ ধরেছে তাতেই তার মঙ্গল হবে।'

সুন্দর অক্ষরে মাকে কটি প্রার্থনা লিখে দিল কেশব। রোজ তাই পড়েন সারদাসুন্দরী। নির্মল একটা তৃপ্তির স্পর্শে অন্তর-বাহির জুড়িয়ে যায়। হরিমোহন সেন, কেশবের জ্যাঠামশাই, একদিন দেখে ফেললেন। কী পড়ছ দেখি?

নাটক-নভেল কিছু নয়। ঈশ্বরের কথা। ঈশ্বরকে প্রার্থনা।

'কে লিখে দিয়েছে? কার হাতের লেখা?' গর্জে উঠলেন হরিমোহন।

চোখ নত করলেন সারদাসুন্দরী। কথা কইলেন না।

'বুঝতে পেরেছি কার। কেশবের।' বলেই হরিমোহন কাগজ কখানা ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো-টুকরো করে।

ছেলেকে গিয়ে আবার ধরলেন সারদাসুন্দরী। বললেন, 'আমাকে আরেকবার লিখে দে।' কেশব বললে, 'লিখে লাভ নেই, আবার ছিঁড়ে ফেলবে।'

বিশ বছরের ছেলে, বিজ্ঞ অভিভাবকদের কথা রাখে না, এ অসহ্য। কিন্তু যে হরিমন্ত্র দিয়ে জগজ্জনকে নববিধানে দীক্ষিত করতে এসেছে, তার কাছে কিসের গুরুমন্ত্র! যে নিজে জগদগুরু তার কাছে আবার কিসের গুরুজন!

হিন্দু পরিবারে থেকে গুরুমন্ত্রে দীক্ষা না নেওয়া গুরুতর পরীক্ষা। কি হল জানবার জন্যে ছেলে সত্যেনকে পাঠিয়ে দিলেন দেবেন ঠাকুর। সত্যেন গিয়ে খবর দিল, জিতেছে কেশব। দেবেন ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন।

বক্তৃতা করে ফিরতে লাগল কেশব। এক-একটা বক্তৃতা তিন-চার ঘণ্টা ধরে। যতক্ষণ স্বর-ভঙ্গ না হয় ততক্ষণ উচ্চগ্রামে বলে যাও হরিনাম। অগ্রসর হও, ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যাও। যিনি আমাদের আলোক আর শক্তি, পিতা আর বন্ধু, তাঁর দিকে স্থির চোখে ভিখারীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকো। তিনি তোমার অন্তরে দেবেন জ্ঞান হৃদয়ে প্রেম আত্মায় পবিত্রতা আর দুহাত ভরে দেবেন শৌর্যে আর সাহসে। এগিয়ে যাও।

'হ্যাঁ গা, ছেলেকে একটু দাবতে পারো না?' বললে কে এক হিতৈষিণী। 'রাত্রে ঘুমোয় না, মারা যাবে যে।'

ছেলে আমার অসাধ্যসাধন করবে। গর্ব না করে প্রার্থনা করেন সারদাসুন্দরী। ছেলে-বেলা থেকেই সে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে। ছেলেবেলা থেকেই গরদের চেলি পরে নাকে তিলক গায়ে ছাপ এঁকে গলায় মালা দিয়ে ভক্ত সাজতে সে ভালোবাসে। সে যে একটা কাণ্ড-কারখানা করবে এ আর বিচিত্র কি।

দেবেন ঠাকুরের সঙ্গে সিংহল গেলেন কেশব সেন। আর কিছুর জন্যে নয়, জাহাজে চড়া ম্লেচ্ছাচার—এ কুসংস্কার অমান্য করবার জন্যে। কলুটোলা সেনপরিবারে এ এক নিদারুণ ঘটনা। কিন্তু কেশব ছাড়া আর কার হবে এ দুঃসাহস!

সারদাসুন্দরী ভয় পেলেন পরিণাম ভেবে। আর কেশবের বালিকা-বধূ কান্নার রোল তুললে। সমুদ্রের ঢেউয়ে সে কান্না আর শোনা গেল না।

দিগ্বিজয় করে ফিরল কেশব। খৃষ্টানির সংস্পর্শে যত কুরীতি-দুর্নীতি এসেছিল সমাজে তার বিরুদ্ধে লড়তে লাগল। লড়তে লাগল যত অন্ধ সংস্কার ও যত বন্ধ দরজার বিরুদ্ধে। মেয়েদের অবরোধ ঘুচে গেল, নতুন ব্রাহ্মিকার সাজে পরদার বাইরে

আসতে লাগল একে-একে। ব্রাহ্মণ যুবকেরা ছিঁড়ে ফেলল পৈতে। দেবেন ঠাকুরও উপবীত ত্যাগ করলেন।
এ দিকে রণে ভঙ্গ দিতে লাগল পাদরিরা। যে খৃষ্টধর্ম তারা প্রচার করছে, সেটা যে মেকি তাই বাইবেল দেখিয়ে প্রমাণ করল কেশব। পাদরির উপর পাদরিগিরি চালালো। কেশবের সভায় লোক ধরে না, আর পাদরির সভায় ঠনঠন।
ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য পদে বরণ করা হবে কেশবকে। সেই উপলক্ষ্যে দেবেন ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিরাট উৎসব। পত্রপুষ্প-পতাকা আর দীপমালার শোভা। সে শোভার সভাপতি কেশব!
কেশব ঠিক করল স্ত্রীকে নিয়ে যাবে সে সভায়। মা'র কাছে অনুমতি চাইল আগের রাত্রে। বীর-বিপ্লবীর মা সারদাসুন্দরী, অনুমতি দিলেন। স্ত্রী তো শয্যাসঙ্গিনী নয়, স্ত্রী সহধর্মিনী। স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গে যাবে ঠিক সীতার মত।
কিন্তু বাড়ির আর সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মেয়ের দল ধমকালো সারদাসুন্দরীকে। 'বউকে সেতখানার মধ্যে বন্ধ করে রাখো। নইলে জাত-কুল সব যাবে।'
সে কথা কানে নিলেন না মা। কিন্তু গৃহস্বামী হরিমোহনের আদেশ আরো দুর্দান্ত। ফটকের দরজায় তালা লাগিয়ে দাও। সর্বক্ষণ মোতায়েন রাখো দারোয়ান।
স্ত্রীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল কেশব। বললে, 'হয় আমার সঙ্গে চলো, নয় পরিবারের গুরুজনদের সঙ্গে থাকো। এই শুভমুহূর্ত—দ্বিধা করবার দেরি করবার সময় নেই।' পঞ্চদশী কিশোরী বধূ স্বামীর সহগামিনী হল।
পরিচিত প্রাচীন চাকর, সেও পর্যন্ত শাসন করে উঠল: 'আরে, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে তুমি কোথা যাও?'
বন্ধ ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। স্ত্রীকে পাশে পেয়ে কেশবের শক্তি দ্বিগুণ দুর্জয় হয়ে উঠল। রূঢ় ধমক দিল দারোয়ানকে: 'খোলো দরজা।' সম্মূঢ়ের মত দরজা খুলে দিল দারোয়ান। বাড়ির কাছেই পালকির আড্ডা। একটা পালকি ভাড়া করে স্ত্রীকে বসিয়ে দিলে। নিজে চলল পায়ে হেঁটে।
শুধু বন্ধনমোচনেই নয় যোগসাধনের সহধর্মিনী। নৈনিতালের নির্জন পর্বতে সস্ত্রীক শিলাসনে বসে ধ্যান করছে কেশব। কেশবের পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, আর স্ত্রীর পরনে গৈরিক। মহাদেবের পাশে অপর্ণা।
উৎসবগৃহে বিচিত্র আমিষ-ভোজ্যের আয়োজন হয়েছে। অশাস্ত্রীয় মাংস। কেশব ইংরিজি শিখে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে, আহারব্যাপারে নিশ্চয়ই তার কুসংস্কার নেই। কিন্তু যে আমিষবস্তুই কাছে আনে কেশব বলে, খাই না। ক্ষুব্ধ হলেন দেবেন ঠাকুর। কিন্তু উপায় কি! বাড়ির ভিতর রুগীর জন্যে তৈরি কিছু নিরামিষ রান্না ছিল তাই দেওয়া হল কেশবকে। তাতেই কেশবের অখণ্ড তৃপ্তি। তার তো আহার নয়, তার আহুতি। সে যে কর্মজ্ঞানমার্গ থেকে চলে আসবে ভক্তিমার্গে। সে তো শুধু ভাঙবার জন্যে নয়, বাঁধবার জন্যে নয়, কাঁদবার জন্যে।
ব্রাহ্মসমাজে খোল করতাল ঢোকাল কেশব। নিন্দা কুৎসা উপহাস করতে লাগল সকলে। কিন্তু স্বদেশের ধর্মপ্রকৃতির নিগূঢ় মর্মটি ঠিক বুঝতে পেরেছে কেশব।

হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে হবে, ভক্তিকে প্রগাঢ় করতে হবে ভালোবাসায়। ছাড়তে যেমন বিদ্রোহী ধরতেও তেমনি। কীর্তনরসে কঠোর ব্রাহ্মধর্মকে রসসিঞ্চিত করলেন। আগে ছিলেন যীশুখৃষ্ট এখন 'প্রমত্ত মাতঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ।'

হেসেছে কেঁদেছে নেচেছে! জগজ্জনকে মাতিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরনেশায় বিভোর করেছে! হায় হায় সে-কেশবের এই দশা! কোথায় সেই কনককান্তি, সেই বিদ্যুৎ-উন্মেষ-দৃষ্টি! সেই বাগবজ্রে বংশীধ্বনি!

দল—দলই ওকে দ'লে দিয়েছে। লাট করে ফেলেছে। ভগবানে যোগ করতে গিয়ে ও দলের সঙ্গে যোগ দিলে! ওরে যোগ মানে সমষ্টিকরণ নয়, ইষ্টিকরণ। যোগাড় করা বা যোগান দেওয়া নয়, শুধু ভগবানে মনোযোগ।

'ওরে, আমি উলুবনে মুক্তো ছড়াই না।' নব্যবাঙলার মাতব্বর ছোকরাদের বলছেন ঠাকুর: 'কালে সব বুঝতে পারবি। ওই যে কথায় আছে না—যাঁরে ধ্যানে না পায় মুনি, তাকে ঝাঁটায় ঝেঁটোয় নন্দরানি। তো শালারা আমাকে লাট করে ফেললি। আমাকে সেই এক বুঝেছিল কেশব সেন।'

কেশব সেন বলেছিল বলরামকে, 'তোমরা বুঝতে পারছ না উনি কে। তাই অত ঘাঁটা-ঘাঁটি করছ। ওঁকে মখমলে মুড়ে ভালো একটি গেলাসকেসের মধ্যে রাখবে, দু-চারটি ফুল দেবে, আর দূর হতে প্রণাম করবে—'

তাতে আবার একজন রাগ করল। ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললে, 'আমরা তো আর কেশববাবু নই যে তাঁর মত আপনাকে দেখব। না হয় কাল থেকে আপনাকে আর বিরক্ত করতে আসব না।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'বা গো সখী! ঠোঁটের আগায় রাগটুকুও আছে।'

কেশব দেয়াল ধরে-ধরে টলতে-টলতে আসছে। দাঁড়াতে পারছে না। কখন ইতিমধ্যে কৌচ ছেড়ে নিচে নেমে বসেছেন ঠাকুর। কেশবও তাঁর পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে।

ঠাকুরের ভাবাবস্থা। মা'র সঙ্গে কি কথা কইছেন আপন মনে।

'আমি এসেছি। আমি এসেছি।' চেঁচিয়ে বলতে লাগল কেশব। ঠাকুরের বাঁ হাতখানি তুলে নিল নিজের হাতে। হাত বুলুতে লাগল।

ঠাকুর তখন মাতোয়ারা। বলছেন ভাবারূঢ় হয়ে: 'যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এই সব। পূর্ণজ্ঞান হলেই এক চৈতন্য। ভাবসমুদ্র উথলালেই ডাঙায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসতে হত, এক রাজ্যের পথ। বন্যে এলে একাকার। তখন সোজা নৌকো চালিয়ে দিলেই হল।'

চোখ চাইলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রির শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কলকাতায় এলে ডাব-চিনি দিয়েছিলুম সিদ্ধেশ্বরীকে। মা'র কাছে মেনেছিলুম, যাতে অসুখ সেরে যায়।'

কিন্তু এবার, এবার কি মানেননি?

১৬
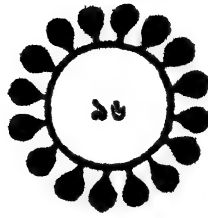
ঢং করে ঘণ্টা বাজল। ঢং শব্দটা হল সাকার ভাব। তারপর ঢং-এর অংটি থেকে গেল অনেকক্ষণ। ঐ অংটি হল নিরাকার।

ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন ঠাকুর।

'নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। বাণ শিখতে হলে আগে কলাগাছ তাক করতে হয়, তারপর শরগাছ, তারপর সলতে। তারপর উড়ে যাচ্ছে যে পাখি।'

এক সন্ন্যেসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েছে। গিয়ে সন্দেহ হয়েছে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতের দণ্ড ঠেকিয়ে দেখতে গেল তাঁর গায়ে লাগে কিনা। একবার দেখল লাগল, আবার দেখল লাগল না। একবার দেখল মূর্তি, আবার দেখল অমূর্তি। ঘট আর আকাশ। ঢং আর অং। সন্ন্যেসী বুঝল ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার।

কাঠ মাটি মনে কোরো না সাকার মূর্তিকে। শোলার আতা দেখলে যেমন আসল আতা মনে পড়ে, বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে যেমন বাপকে মনে পড়ে, তেমনি। প্রতিমায় সত্যের উদ্দীপনা। রূপের মধ্যেই অরূপরতন।

ভক্তির জন্যে সাকার, মুক্তির জন্যে নিরাকার। মুক্তি দিলেই নিশ্চিন্ত, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, ঈশ্বরকে ফিরতে হয় না সঙ্গে-সঙ্গে। ভক্তি দেওয়াই কঠিন, ছুটি পায় না ভগবান, লেগে থাকতে হয় সব সময়। তাই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই রে, ভক্তি দিতে কাতর হই।

এমনি কত কথা বলে যাচ্ছেন ঠাকুর। প্রিয়তন্ময়ের মত শুনছে কেশব সেন।

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই করো। আনন্দময়ীকে সঙ্গে নিয়ে যেথা ইচ্ছে সেথা যাও।

'দেখনি ময়রার দোকানে ছানা চিনি মিশিয়ে একটা ঠাশা তৈরি করে। পরে তা থেকেই তৈরি হয় গোল্লা আর বরফি, তালশাঁস আর আতা সন্দেশ। ছানা চিনির রূপান্তরে যেমন নানান রকম সন্দেশ, তেমনি ভাব ভক্তির রূপান্তরে নানান রকম বিগ্রহ—শিব দুর্গা কৃষ্ণ বিষ্ণু। পলতা থেকে কলকাতাতে যে জল আসে রাস্তায় আর বাড়িতে, তা একই জল, কিন্তু সে কলের জল কোথাও পড়ছে সিংহের মুখ দিয়ে কোথাও বা মানুষের মুখ দিয়ে। নানা রূপে ঈশ্বরই খেলা করছেন।'

যাই বলো, দল চাই নে, চাই উদারবুদ্ধি। গেড়ে ডোবাতেই দাম বাঁধে, যেমন হিঞ্চে কলমির দল। স্রোতের জলে দল বাঁধে না। গোঁড়ামিতেই দল পাকায়, উদারবুদ্ধির দল নেই।

এত কথা বলছেন, একবারও জিগগেস করছেন না, কেশব তুমি কেমন আছ? কেবল ঈশ্বরের কথা।

নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনো জিগগেস করিনি, তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানা বাড়ি?

প্রতিমায় পুজো হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে হবে না? তিনিই তো মানুষ হয়ে লীলা করছেন। 'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবই যে তাঁর অবতার। তুই নতুন লীলা কি দেখাবি তাঁর নিত্য লীলা চমৎকার।'

তাঁকে সর্বভূতে দেখতে লাগলুম। বেলপাতা তুলতে গেলুম সে দিন। পাতা ছিঁড়তে গিয়ে খানিকটা আঁস উঠে এল। দেখলুম গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হল। ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পুজো হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হল না।

হাসিমুখে তাকালেন কেশবের দিকে। বললেন, 'তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে।'

উৎসুক হয়ে তাকালো কেশব।

'শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গিয়েছে কিনা তাই এই অবস্থা। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেক দিন পর শরীরে এসে আঘাত লাগে। দেখনি সেই গঙ্গার উপরে বড় জাহাজ? বড় জাহাজ যখন গঙ্গা দিয়ে চলে যায়, তখন প্রথম কিছু টের পাওয়া যায় না। শেষে, ওমা দেখি, পাড়ের গায়ে জল ধপাস-ধপাস করছে, আর পাড়ের খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল। কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢুকলেও এমনিই হয়। কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢুকলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙেচুরে দেয়। তেমনি ভাবহস্তী তোমার দেহঘরে প্রবেশ করেছে। তোলপাড় করে ভেঙে দেবে না তো কি!'

কেশব চক্ষু নত করল।

'হয় কি জানো? আগুন লাগলে কতগুলো জিনিস পুড়িয়ে-টুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হৈহৈ কাণ্ড লাগিয়ে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথম কাম ক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে, পরে অহং বুদ্ধির উৎখাত হয়। তারপর তোলপাড়!' ঠাকুর থামলেন একটু। বললেন, 'তুমি মনে করছ, সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি একবার নাম লেখাও, আর চলে আসবার যো নেই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে ছেড়ে দেবে না ডাক্তার সাহেব। তুমি নাম লেখালে কেন?'

কেশব হাসতে লাগল। হাসপাতালের উপমাটি বড় ভালো লেগেছে।

কত রুগী হাসপাতালে ঢোকে এসে জাঁক করে। কিন্তু যখন দেখে ইনচার্জ ডাক্তার কিছুতে ছাড়ে না তখন একদিন ফাঁক বুঝে চম্পট দেয়। কেউ বা আবার চাদর বালিশ নিয়ে সরে পড়ে। কোথায় রোগ সারাবে তা নয় চুরি করে। ধর্মপথে এসে আবার জাহান্নমে যায়।

'তখন আমার দারুণ অসুখ। মাথায় যেন দুলাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথার বিরাম নেই। নাটাগড়ের রাম কবরেজ দেখতে এল। সে এসে দেখে আমি বসে

বিচার করছি। তখন সে বললে, এ কি পাগল! দুখানা হাড় নিয়ে বিচার করছে!' যে খানদানি চাষা, সে চাষ করাই চায়, হাজা-শুকো মানে না। আর কিছু জানে না সে চাষ ছাড়া। তেমনি জীবনের দৈন্য-দুর্ভিক্ষেও হরিনাম ছাড়ে না। মা যদি সন্তানকে মারে, সন্তান মা-মা বলেই কাঁদে। গলা ধরে যদি ফেলেও দেয় তবুও তার মা-মা ডাক। সে তো আর যাকে-তাকে মা বলছে না, তার মাকেই মা বলছে। তাই ছন্দে একটি মন্ত্র বাঁধলেন ঠাকুর। 'দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

দুঃখ তো শরীরের ব্যাপার, আর মন, তুমি তো আনন্দের মৌচাক। দুঃখের হুলেই এই মধুকণা সঞ্চিত হচ্ছে। সারা জীবনই তো দুঃখ—রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা। যারা বলে আগে দুঃখ দারিদ্র্য যাক, পরে ঈশ্বরভজন করা যাবে, তারা সেই সমুদ্র-স্নানার্থী তীর্থবাসীর মত। ভাবছে, সমুদ্রের ঢেউ আগে থামুক, পরে স্নান করে নেব। হায়, সমুদ্রের ঢেউ কোনোদিন থামবে না, স্নানও হবে না সেই তীর্থঙ্করের। ঢেউয়ের মধ্যেই স্নান করে নিতে হবে। দুঃখের মধ্যেই নিতে হবে সেই আনন্দস্পর্শ। এ তো দুঃখের ঢেউ নয় এ হচ্ছে সুখস্বপ্নরসরাশির ঢেউ।

মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়, যেদিন হরিকথামৃতপান হয় না সেদিনই দুর্দিন।

'তোমার শেকড়সুদ্ধ তুলে দিচ্ছে।' কেশবের দিকে আবার তাকালেন ঠাকুর। 'শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শেকড়সুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভালো করে গজাবে। তাই এই হুলুস্থুল।'

কেশবের মা দাঁড়ালেন এসে দরজার পাশে।

'মা আপনাকে প্রণাম করছেন।'

আনন্দে হাসলেন ঠাকুর।

'মা বলছেন কেশবের অসুখটি যাতে সারে' কে একজন বললে মায়ের হয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো। তিনিই দুঃখ দূর করবেন।' পরে লক্ষ্য করলেন কেশবকে: 'বাড়ির ভিতরে অত থেকো না। যেখানে যত বেশি ঈশ্বরীয় কথা সেখানেই তত বেশি আরাম। দেখি, তোমার হাত দেখি।' কেশবের একখানি হাত তুলে নিয়ে ওজন করতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'না তোমার হাত হালকা আছে। যারা খল তাদের হাত ভারি হয়।'

সবাই হেসে উঠল।

কেশবের মা বললেন, 'কেশবকে আশীর্বাদ করুন।'

'আমার কী সাধ্য! তিনি আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।'

'ঈশ্বর দুবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দু ভাই জমি বখরা করে, আর দড়ি মেপে বলে, এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার। ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে আমার আমার করছে। আরো একবার হাসেন। ছেলের সঙ্কটাপন্ন অসুখ। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলে, ভয় কি মা, আমি ভালো করব। বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।'

কেশবের একটা কাশি উঠল। সে কাশি আর থামে না। কঠিন কষ্টকর কাশি। বুকের মধ্যে ব্যথার ধাক্কা লাগছে সকলের।
বেগটা একটু থামল। থামতেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। দেয়াল ধরে-ধরে চলে গেল আপন ঘরে। তার শেষ শয্যায়।
কেশবের বড় ছেলেটিকে ঠাকুরের পাশে এনে বসাল অমৃত। বললে, 'এইটি কেশবের বড় ছেলে। আপনি আশীর্বাদ করুন। ও কি, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন।'
'আমার আশীর্বাদ করতে নেই।' বলে ছেলেটির সর্বাঙ্গে হাত বুলুতে লাগলেন ঠাকুর। অমৃত বললে, 'আচ্ছা, তবে গায়ে হাত বুলোন।'
সে হাত মানেই তো অপরিমেয় করুণার পারাবার।
'অসুখ ভালো হোক, ও সব কথা আমি বলতে পারি না। ও ক্ষমতা আমি মা'র কাছে চাইও না। মাকে শুধু বলি, মা, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও।'
কেশবকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'ইনি কি কম লোক গা! যারা টাকা চায় তারাও মানে, আবার সাধুতেও মানে। দয়ানন্দকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। কেশবের যাবার কথা—কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর-বার করছে, কখন কেশব আসেন।'
মিষ্টিমুখ করলেন ঠাকুর। এইবার উঠবেন গাড়িতে। ব্রাহ্ম ভক্তেরা সঙ্গে এসে তুলে দিচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখলেন, নিচে আলো নেই। বললেন ঠাকুর, 'এ সব জায়গায় ভালো করে আলো দিতে হয়। আলো না দিলে দারিদ্র্য হয়। দেখো এ রকমটি যেন হয় না আর কোনোদিন।'
এলোপ্যাথিতে কিছু হচ্ছে না। ডাকা হল মহেন্দ্রলাল সরকারকে। কিছুতেই কিছু হবার নয়।
তবু তারই মধ্যে বাড়ির এক পাশে দেবালয় তৈরি করাল। প্রতিষ্ঠার দিনে, উত্থান-শক্তি নেই, তবু জোর করে নেমে এল নিচে। একটা চেয়ারে বসিয়ে চার-পাঁচজনে ধরে নামাল অতিকষ্টে, বেদী এখনো শেষ হয়নি, না হোক, যা হয়েছে এই বেদীতে বসেই আমি উপাসনা করব।
এসেছি মা, তোমার ঘরে। ওরা আসতে বারণ করেছিল, কোনোমতে শরীরটা এনে ফেলেছি। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। আমার বড় সাধ ছিল কয়েকখানা ইট কুড়িয়ে এনে তোমাকে একখানা ঘর করে দি। তুমি মা নিজেই স্বহস্তে ইট কুড়িয়ে এনে এই প্রশস্ত দেবালয় করিয়ে দিলে। এখন বড় সাধ, ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, আমার কাশী মক্কা, আমার জেরুশালেম। মা আমার দয়া, মা আমার পুণ্যশান্তি, আমার শ্রীসৌন্দর্য, আমার সম্পদস্বাস্থ্য। বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা।
রোগের তাড়নায় দিন-রাত আর্তনাদ করছে কেশব। সে নিদারুণ বেদনার নিবারণ নেই। শরীরের রক্ত দিলে যদি উপশম হত, শত-শত লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।
মা, আমার মুখ যেন তোমার নিন্দা না করে। তুমি আমাকে ভেঙে-ভেঙে তোমার কোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছ মা।
'বাবা, আমার শাপেই তোমার এত যন্ত্রণা—' সারদাসুন্দরী বললেন কাঁদতে-কাঁদতে।

মায়ের বুকে মাথা রাখল কেশব। বললে, 'এমন কথা তুমি মুখেও এনো না। তোমার মত মা কে পায়? তুমি আমার বড় ভালো মা, তোমার গর্ভে জন্মেই তো আমি এত ভালো হতে পেরেছি—'

কেশবের তিরোভাবের কথা জানানো হল ঠাকুরকে।

ঠাকুরের মনে হল, একটা অঙ্গ যেন পড়ে গেল। এমন কম্প এল যে লেপ চাপা দিয়ে পড়ে রইলেন। তারপর তিনদিন বেহুঁস।

সিঁদুরেপটির মণি মল্লিকের ছেলেটি মারা গেছে। উপযুক্ত ছেলে—এ শোক রাখবার জায়গা নেই। ছেলেকে শ্মশানে পুড়িয়ে রেখে ঠাকুরের কাছে সটান এসে উপস্থিত।

ঘরভরা লোক। সব জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল তার দিকে। ঠাকুরেরও চোখ পড়ল, জিগগেস করলেন, 'কি গো, আজ অমন শুকনো দেখছি কেন?'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মণি মল্লিক। বললে, 'আমার ছেলেটি আজ মারা গেল। আসছি সব শেষ করে।'

সহসা সমস্ত ঘর বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে রইল। ক্রমে-ক্রমে নানা জনে নানা রকম সান্ত্বনার কথা আওড়াতে লাগলো। সব মামুলি, বাজে কথা।

কিন্তু ঠাকুর তো কিছু বলছেন না। এই দারুণদহন শোকে তাঁর কি একটু মৌখিক সহানুভূতিও পাওয়া যাবে না? ঠাকুর এত হৃদয়হীন।

বুড়ো মণি মল্লিক আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। ঠাকুর দুটো মিষ্টি কথাও বলবেন না এ কঠোরতা যেন পুত্রশোকের চেয়েও দুঃসহ।

কেঁদে-কেঁদে শোকের কলসী খালি করল মণি মল্লিক। তখন সহসা তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত তেজের সঙ্গে গান ধরলেন ঠাকুর:

> জীব সাজো সমরে।
> ঐ দ্যাখ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
> আরোহণ করি মহা পুণ্যরথে
> ভজন সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে,—তাতে
> দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান
> ভক্তিব্রহ্মবাণ সংযোগ করো রে॥

মণিমোহন স্তব্ধশোক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কে পুত্র? কার পুত্র? কার জন্যে এই শোক?

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর বললেন, 'পুত্রশোকের মত কি আর জ্বালা আছে? তবে কি জানো? যারা ঈশ্বরকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই ফের সামলে নেয়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলোই একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে, তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় স্টিমারগুলো গেলে জেলেডিঙিগুলো কি করে, মনে হয় যেন একেবারে গেল, আর সামলাতে পারলে না। কোনোখানা বা উলটেই গেল। আর বড়-বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দু-চার-

বার টালমাটাল হয়েই তেমন তেমনি স্থির হলো। দু-চারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।'

ঠাকুরের স্বরে বিষাদ গাম্ভীর্য। 'মানুষ সুখের আশায় সংসার করে। বিয়ে করল ছেলে হল, সেই ছেলে আবার বড় হল, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চলল। তারপর এটার অসুখ, ওটার বিসুখ, এটা মলো ওটা বয়ে গেল, ভাবনায় চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত। যত রস মরে তত একেবারে দশ ডাক ছাড়তে থাকে। দেখনি? ভিয়েনের উনুনে কাঁচা সুঁদরির চেলাগুলো প্রথমটা বেশ জ্বলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে, কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাঁজলার মত হয়ে ফুটতে থাকে আর চুঁ-চাঁ ফুস-ফাস নানা রকম আওয়াজ হতে থাকে—সেই রকম।'

'এই জন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। বুঝলুম, এ জ্বালা শান্ত করবার আর লোক নেই।'

ধাত্রী ভুবনমোহিনী মাঝে-মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসে।

সকলের জিনিস খেতে পারেন না ঠাকুর। বিশেষত ডাক্তার, কবরেজ বা ধাত্রীর। অনেক যন্ত্রণা দেখেও তারা টাকা নেয় তার জন্যে।

'ভুবন এসেছিল। পঁচিশটা বোম্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছিল।' বলছেন অধর সেনকে। 'আমায় বললে, আপনি একটা আঁব খাবে? আমি বললাম, আমার পেট ভার। আর, সত্যিই দেখ না, একটু কচুরি সন্দেশ খেয়েই পেট কি রকম হয়ে গেছে।' অন্য কথায় গেলেন তখুনি। 'কেশব সেনের মা বোন এরা এসেছিল। তাই আবার খানিকটা নাচলাম। কি করি। ভারি শোক পেয়েছে।'

সেদিন আবার বললেন মাস্টারমশাইকে। 'কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ির ছোকরারা হরিনাম করলে। কেশবের মা তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগলো। দেখলাম শোকে কাতর হয়নি। এখানে এসে একাদশী করলে। মালাটি নিয়ে জপ করে। বেশ ভক্ত।'
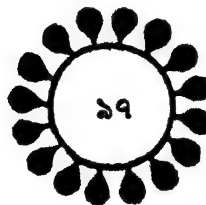
সমরসজ্জায় সেজে শোক তাড়ালেন ঠাকুর। বীরবিক্রমে হুঙ্কার দিয়ে। পরাস্ত, পরাভূত করে। কিন্তু মা, শ্রীশ্রীমা কি করে তাড়ালেন?

'মাঝি-বউ অনেক দিন আসে না। তার খবর কেউ জানো তোমরা?' মা যখন জয়রাম-বাটিতে, জিগগেস করলেন একদিন।
কোয়ালপাড়ার মজুরনী। চিনতে পেরেছে সবাই। কিন্তু খবর রাখে না কেউ। সংসারে এত খবর থাকতে কোন এক মজুরনীর খবর!
বলতে-বলতেই মজুরনী এসে হাজির। কোয়ালপাড়ার হাটে মস্ত বাজার করে কে এক ভক্ত তার মাথায় মোট চাপিয়ে দিয়েছে। তাই বয়ে নিয়ে এসেছে ধুকতে-ধুকতে। এ কেমন চেহারা! রাতারাতি যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছে মজুরনী। ধুলোমাখা রুক্ষ চুল, গভীর গর্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে চোখ, কেমন সর্বশূন্য চাউনি। হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, যেন হাতের লাঠি কেউ কেড়ে নিয়েছে জোর করে।
'এ তোমার কী হয়েছে মাঝি-বউ?'
'মা গো, আমার জোয়ান রোজগারী ছেলেটি মারা গেছে।'
'বলো কি মাঝি-বউ?' এক মুহূর্তও স্তব্ধ থাকলেন না শ্রীমা, ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। আকুল, অন্ধ আর্তনাদ। উপরে আকাশ, সামনে দিগন্ত পর্যন্ত রেখা টানা সে আর্তনাদের। কখনো লুটিয়ে পড়ছেন মাটিতে, কখনো বা কাঁদছেন বারান্দার খুঁটিতে মাথা রেখে। জগতের সমস্ত মৃতপুত্রা জননীর শোক নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে ধুয়ে দিচ্ছেন নিরর্গল অশ্রুজলে।
মাঝি-বউ তো অবাক। যেন তার ছেলে মরেনি, মা'র ছেলে মরেছে! কোথায় মা তাকে সান্ত্বনা দেবেন, উলটে এখন তাকেই মাকে সান্ত্বনা দিতে হয়।
যেমন বুদ্ধদেব সান্ত্বনা দিয়েছিলেন উব্বিরীকে।
কোশলের রানি উব্বিরী। অচিরাবতীর তীরে কাঁদছে অঝোরে।
'এখানে বসে কে কাঁদছ?' জিগগেস করলেন বুদ্ধদেব। বললেন, 'এ যে শ্মশান—'
'এই শ্মশানেই আমার মেয়েটিকে ছাই করে দিয়েছি।'
'কোন মেয়ে?'
জলভরা চোখে তাকালো একবার উব্বিরী। কোন মেয়ে! একটি বই আমার আর মেয়ে কোথায়!
'চুরাশি হাজার মেয়ে এই চিতার ভস্মে ঘুমিয়ে রয়েছে! তুমি চিরন্তনী জননী, তুমি কার জন্যে, তোমার কোন মেয়েটির জন্যে কাঁদছ? কত তো কাঁদলে জন্ম-জন্ম ধরে, কেউ ফিরে এল, চিনতে পারলে কাউকে? যদি চুরাশি হাজার মেয়ে চিতাশয্যা ছেড়ে জেগে ওঠে চোখের সামনে, চিনতে পারবে মেয়ে বলে?'
স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল উব্বিরী।
'পথিক যেমন চলতে-চলতে তরুতলে আশ্রয় নেয় তেমনি তারা তোমার অঙ্কছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলো। ক্ষণমুগ্ধা, ভেবেছিলে ওদের উপর তোমার বুঝি শাশ্বত অধিকার। কিন্তু চেয়ে দেখ, সবই অচিরস্থায়ী, শ্মশান-নদীর নামটিও অচিরাবতী। সংসারে শুধু এক বস্তু সার জেনো। সে হচ্ছে যাত্রা, অনন্তযাত্রা। তুমিও চলেছ অনন্ত পথে, তোমার মেয়েরাও তেমনি। শুধু এগিয়ে যাওয়া, নিবতে-নিবতে শেষ জ্বলে ওঠা।'

চোখের জল মুছল উম্বিরী। কিন্তু শ্রীমা'র কান্নার বিরাম নেই।
উম্বিরী কে'দেছিল নিজের কন্যার শোকে। শ্রীমা কাঁদছেন পুত্রহারা মজুরনী মাঝি-বউ হয়ে।
শ্রীমাই চিরন্তনী মা।
শোকের বেগ কমে এলে নবাসনের বউকে নারকেল তেল আনতে বললেন। তেল এনে ঢেলে দিলেন মাঝি-বউয়ের মাথায়। হাত চাপড়ে-চাপড়ে মাখিয়ে দিলেন ভালো করে। আঁচলে বে'ধে দিলেন মুড়ি-গুড়। যাবার সময় বললেন, 'আবার অাসিস মাঝি-বউ।'
মাঝি-বউ মৃদু-হাসির ঝিলিক দিল। তার আর শোক নেই।
ঠাকুর শোক তাড়িয়ে দেন। আর মা শোক শুষে নেন।
আরেক ভাবে বলি। ঠাকুর দুঃখকে ঠেলে দেন। মা নেন টেনে।
কিন্তু ও আমার কে?
রামলালের বিয়ে, সারদা চলেছে কামারপুকুর। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন ঠাকুর। যতদূর চোখ যায়। ভাবলেন ও আমার কে!
খেতে বসেছেন ঠাকুর। বলরাম কাছে ব'সে। আরো হয়তো কেউ-কেউ।
'আচ্ছা আবার বিয়ে কেন হল বলো দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্যে হল? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই, তার আবার স্ত্রী কেন?'
বলরাম হাসল একটু মুখ টিপে।
'ও, বুঝেছি।' থালা থেকে এক গ্রাস ভাত তুললেন ঠাকুর। বলরামের দিকে ইশারা করলেন। 'এই, এর জন্যে হয়েছে। নইলে কে আর অমন রে'ধে দিত বলো! কে আর অমন করে খাওয়াটা দেখত! ওরা সব আজ চলে গেল—'
কে চলে গেল!
'রামলালের খুড়ী গো! রামলালের বিয়ে হবে—তাই সব গেল কামারপুকুর। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলুম। কিছুই মনে হল না। সত্যি বলছি, যেন কে তো কে গেল! কিন্তু তারপর ভাবনা হল কে এখন রে'ধে দেয়।' আবার বললেন আপন মনে : 'সব রকম খাওয়া তো আর পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ার হু'শও থাকে না। ও বোঝে কি রকমটি ঠিক সয়। এটা ওটা করে দেয়। তাই মনে হল, কে করে দেবে!'
অপূর্ব মমতা। সর্বঢালা নির্ভরতা।
শিখিয়ে দিয়েছিলেন সারদাকে : 'গাড়িতে বা নৌকোয় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনো জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখেশুনে সকলের শেষে নামবে।'
ভাবে আছি বলে বাস্তব ভুলব কেন?
বলরাম বোসের বাড়ি যাচ্ছেন, সঙ্গে রামলাল আর যোগীন। সকালবেলা। যাচ্ছেন ঘোড়ার গাড়িতে। গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের ফটক পর্যন্ত এসেছে, জিগগেস করলেন যোগীনকে, 'কি রে, নাইবার কাপড়-গামছা এনেছিস তো?'
'গামছা এনেছি। কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে।' কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইল

যোগীন। 'তা, বলরামবাবুরা আপনার জন্যে একখানা নতুন কাপড় দেখে-শুনে দেবে খন।'

'সে কি কথা? সবাই বলবে কোত্থেকে একটা হাবাতে এসেছে। কে জানে, তাদের কষ্ট হবে, হয়তো আতান্তরে পড়বে—যা, গাড়ি থামিয়ে নেমে নিয়ে আয় গে।'

যেমন কথা তেমন কাজ। যোগীন ছুটল ফের কাপড় আনতে।

'ভালো লোক লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়িতে এলে সব বিষয়ে কেমন সুসার হয়ে যায়, কাউকে কিছুতে বেগ পেতে হয় না।' বললেন ঠাকুর, 'আর হাবাতে হতচ্ছাড়াগুলো এলে সব বিষয়ে বেগ পেতে হয়। যেদিন ঘরে কিছু নেই সেদিনই এসে হাজির হয় হতচ্ছাড়ারা।'

ঠাকুরের সঙ্গে হাজরাও মাঝে-মাঝে আসে কলকাতায়। কিন্তু সেবার সেও ফেলে গিয়েছিল গামছা। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে হুঁশ হল।

'কই আমি তো নিজের গামছা বা বটুয়া একবারও ভুলে ফেলে আসি না! ভগবানের নামে কাপড় থাকে না পরনে, কিন্তু ভাবমুখ ছেড়ে বাস্তবমুখে এসে কড়াক্রান্তির ভুলচুক নেই। আর তোর একটু জপ করেই এত ভুল!'

ভক্ত হয়েছিস বলে ভুলো হবি কেন? বোকা হবি কেন?

কে কাকে ভক্তি করে!

'ভক্ত আপনাকেই আপনি ডাকে।' বললে প্রতাপ হাজরা।

'এ তো খুব উঁচু কথা। আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে তো সবই হয়ে গেল। ঐটি দেখতে পাবার জন্যেই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যেই শরীর।' সার্থক উপমা দিলেন ঠাকুর : 'যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয় ততক্ষণ ছাঁচের দরকার। হয়ে গেলে ফেলে দাও মাটির ছাঁচ। ঈশ্বরদর্শন হলে কি হবে আর শরীর দিয়ে?'

তিনি শুধু অন্তরে নন, অন্তরে-বাহিরে। নয়নের সম্মুখে শুধু নন, নয়নের মাঝখানে।

লক্ষ্মী এসেছে এবার। রামেশ্বরের মেয়ে, রামলালের আপন বোন। এগারো বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে ধনকৃষ্ণ ঘটকের সঙ্গে। সেবার রামেশ্বরের অস্থি নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে রামলাল, ঠাকুর জিগগেস করলেন, কেমন আছে লক্ষ্মী?

'তার বিয়ে হয়েছে।' বললে রামলাল।

'বিয়ে হয়েছে? সে বিধবা হবে।' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ঠাকুরের।

হৃদয় কাছে বসে ছিল, ফোঁস করে উঠল। 'তাকে আপনি এত ভালোবাসেন, তার বিয়ে হয়েছে শুনে কোথায় তাকে আশীর্বাদ করবেন, তা নয়, কি একটা ছাইভস্ম কথা বলে ফেললেন।'

'কি বললাম বল তো!' ঠাকুর তাকালেন শূন্যচোখে।

'কি মাথামুণ্ডু বললেন! শুনে আর কাজ নেই।'

'কি করবো! মা বলালেন যে!' ঠাকুর বললেন গম্ভীর কণ্ঠে : 'লক্ষ্মী মা-শীতলার অংশ। ভারি রোখা দেবী, আর যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে সে সামান্য জীব। সে পুড়ে যাবে। সামান্য জীবের ভোগে আসতে পারে না লক্ষ্মী।'

ধনকৃষ্ণ নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোথায় কি কাজের সন্ধানে যাচ্ছে বলে বেরুল আর ফিরল না। বারো বছর কেটে গেল। কুশপুত্তলিকা দাহন করে শ্রাদ্ধশান্তি করে খোলসা হল লক্ষ্মী।

শ্বশুরবাড়ির কিছু সম্পত্তি তার ভাগে পড়েছে। তাই শুনে ঠাকুর বললেন, 'কোনো সম্পত্তি জোটাসনি, আঁটকুড়ের আবার সম্পত্তি কি!'

সরিকদের নামে লিখে দিল অংশ।

'ধর্মকর্ম যা সব ঘরে বসে করবি। বাইরে তীর্থে-তীর্থে একলাটি ঘুরে বেড়াবিনে। কার পাল্লায় পড়বি কে জানে। আর ঐ খুড়ির সঙ্গে থাকবি। বাইরে বড় ভয়।'

বললেন সারদাকে, 'লজ্জাই নারীর ভূষণ। বল্ না লক্ষ্মী সেই পদটি—অবলার অবলায় বুদ্ধি, অবলার অবলায় সিদ্ধি।'

নহবৎখানায় প্রতিষ্ঠা হল সারদার। লজ্জারূপেন সংস্থিতা।

দরমার-বেড়ায় আঙুল-প্রমাণ ছেঁদা হয়েছে একটা। তারই উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে সারদা। পাশ থেকে কখনো বা লক্ষ্মী। মন্দিরের প্রাঙ্গণে এত সব নাম-নৃত্য এত সব ভাব-ভক্তি, একটু দেখবে না ওরা? সেই ছেঁদা ক্রমে-ক্রমে একটু বড় হয়েছে বুঝি। ঠাকুর পরিহাস করে বললেন রামলালকে, 'ওরে রামনেলো, তোর খুড়ির পরদা যে ফাঁক হয়ে গেল।'

নবতকে বলেন খাঁচা। সারদা আর লক্ষ্মীকে, শুকসারী। নিজের ঘরে ফলমূল মিষ্টি নামলে রামলালকে বলেন, 'ওরে খাঁচায় শুকসারী আছে, ফলমূল ছোলাটোলা কিছু দিয়ে আয়।'

ঠাকুর শুয়ে আছেন খাটের উপর। চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সন্ধে হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। খাবার রাখতে সারদা ঘরে ঢুকেছে আলগোছে। বেরিয়ে যাচ্ছে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস।' ভেবেছেন লক্ষ্মী এসেছে বুঝি।

'দিচ্ছি।'

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে কোরোনি।'

দিয়ে যাস? তুই? না, না, তুমি, তুমি। দিয়ে যেও। বন্ধ করে দিয়ে যেও দরজা।

সারা রাত ঠাকুরের আর ঘুম হল না। সকালবেলা নবতে এসে হাজির। বললেন অপরাধীর মত, 'দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে। কেন অমন রুক্ষু কথা বলে ফেললুম!'

বাপ নেই, মা পাগল, নাম রাধু। শ্রীমা'র ভাইঝি। কি অসুখ করেছে, তাই তার মা শ্রীমাকে গালাগাল দিচ্ছে। 'তুমিই ওষুধ খাইয়ে-খাইয়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেললে।' ক্রমেই গলা চড়তে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে গালাগাল।

শ্রীমা'র অসহ্য মনে হল। বলে উঠলেন পাগলীকে লক্ষ্য করে, 'তোকে আজই মেরে ফেলব। আমি যদি তোকে মারি, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই তোকে রক্ষা করতে পারে। আর এতে আমার পাপও নেই পুণ্যও নেই।' পরে বলছেন আপন মনে : 'আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম কখনো আমাকে তুই পর্যন্ত বলেননি। সরুচাকলি আর

সুজির পায়েস তৈরি করে একদিন সন্ধের পর গেছি ঠাকুরের ঘরে। রেখে চলে আসছি, লক্ষ্মী মনে করে বলছেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস। বললুম, হ্যাঁ, রাখলুম ভেজিয়ে। গলার স্বর টের পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন, বললেন, আহা তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে কোরো না। পরদিন নবতের সামনে গিয়ে কত অনুনয়। দেখ গো, সারা রাত ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে। আর রাধুর মা কিনা আমাকে দিন-রাত গাল দিচ্ছে। কি পাপে যে আমার এমন হচ্ছে জানি না। হয়তো শিবের মাথায় কাঁটাশুদ্ধ বেলপাতা দিয়েছি। সেই কণ্টকে আমার এই কণ্টক।'
কিন্তু তোর মাথায় যে আমি ফুল দিয়েছি তাতে কি কোনো কণ্টক আছে? কাঁটা না থাকবে তো কাঁদাস কেন এমন করে?
'কেন এত উতলা হন নরেনের জন্যে?' টিপ্পনি কাটে রামলাল।
'ওরে তোর ফেরেনডো যেমন রসিকলাল, নরেনের ফেরেনডো যেমন হাজরা, আমার ফেরেনডো তেমনি নরেন। বলে গেল বুধবার আসবে, ফিরে বুধবার এল তো সে এখনো এল না। তুই একবার গিয়ে খবর নিয়ে আয়, কেমন আছে।'
শেয়ারের গাড়ি না নিয়ে হেঁটেই চলে গেল কলকাতা। পাকড়ালো নরেনকে। বললে, 'কি গো, ঠাকুরকে বলে এলে বুধবারে যাবে, কত বুধবার চলে গেল, তবুও তোমার দেখা নেই।'
'যাব বলে তো ঠিক করি, কিন্তু সংসারের ঝামেলায় হয়ে ওঠে না, দাদা—'
'আজই চলো।'
টেরি কেটে ওরই মধ্যে ফিটফাট হয়ে বাবু সাজল নরেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলে।
তার কপালের ধুলো হাত দিয়ে মুছে দিলেন ঠাকুর। মাথার টেরি উসকো-খুসকো করে দিলেন। বললেন, 'তোর আবার এ সব কেন?' পরে তাকালেন মুখের দিকে। 'আজ এখানে থাকবি তো?'
না বলতে যেন কান্না পায়। বললে, 'থাকব।'
'ওরে রামলাল, নরেন আজ থাকবে।' উল্লাসে অধীর হলেন ঠাকুর। 'তোর খুড়িকে খবর দে। ভালো করে খাওয়ার বন্দোবস্ত কর। হিন্দুস্থানী রুটি আর ছোলার ডাল।'
শুধু এখানেই খাওয়ান না, নিজের হাতে খাবার বয়ে নিয়ে যান কলকাতায়। একেবারে তার টঙে।
তিন বন্ধুতে মিলে পড়ছে। নরেন, দাশরথি আর হরিদাস। বাইরে হঠাৎ ডাক শোনা গেল : নরেন, ও নরেন!
নরেন ব্যস্ত হয়ে নামতে লাগল। কিন্তু ব্যস্ততর যিনি তিনি উঠে পড়েছেন। বন্ধুরা দেখল, সিঁড়ির মাঝপথে দুজনের সাক্ষাৎকার।
'এত দিন যাসনি কেন? যাসনি কেন এত দিন?' অনুযোগ করছেন ঠাকুর, আর গামছায় বাঁধা সন্দেশ বের করে খাইয়ে দিচ্ছেন নিজ হাতে।
'চল কত দিন গান শুনিনি তোর।'

টঙে উঠে তানপুরা নিয়ে বসল নরেন। কান মলে-মলে সুর বাঁধল। তার পর গাইল গলা ছেড়ে :

জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী,
তুমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপিনী,
তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিনী
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।

ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। নরেনের বন্ধুরা ভাবল হঠাৎ কোনো অসুখ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন বুঝি। জল নিয়ে এল ছুটে। ছিটে দিতে যাবে, বাধা দিল নরেন! বললে, 'দরকার নেই। ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে-শুনতেই প্রকৃতিস্থ হবেন।'
যেমন বলা তেমনি। চলল গানের নির্ঝরস্রোত। ঠাকুর চলে এলেন সহজাবস্থায়। বললেন, 'যাবি, আমার সঙ্গে যাবি দক্ষিণেশ্বর? কত দিন যাসনি। চল না আজ। বেশিক্ষণ না হয় নাই থাকলি। আবার না হয় ফিরে আসবি এখুনি। যাবি?'
যাব। ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল নরেন। পড়ে রইল বই। পড়ে রইল তানপুরা।
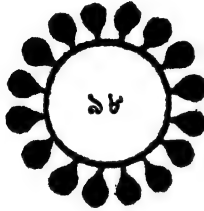
শিব গুহ-র বাড়ির ছেলে অন্নদা গুহ। অন্নদার কাছে নরেন আজকাল খুব বেশি আনাগোনা করছে। হাজরা নালিশ করল ঠাকুরকে।
'নরেন অন্নদা এক আফিসওয়ালার বাসায় যায়।' বললেন ঠাকুর। 'সেখানে তারা ব্রাহ্ম-সমাজ করে।'
'বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।'
'বামুনদের কথা শুনো না।' ঠাকুর পরিহাস করলেন। 'তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভালো। অন্নদাকে আমি জানি, ভালো লোক।'
'শুনলাম বেশ কঠোর করছে আজকাল।' হাজরা বললে। 'সামান্য কিছু খেয়ে থাকে। ভাত খায় চারদিন অন্তর।'
'বলো কি!' যেন একটু আশ্চর্য হলেন ঠাকুর।

শেষে বললেন আত্মস্থের মত : 'কে জানে কোন ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্‌ যায়।'
'অন্নদার বাড়িতে নরেন আগমনী গাইলে।'
'সত্যি?' ঠাকুর যেন খুশি হলেন। নিরাকার থেকে সাকারে আসছে নরেন? জ্ঞানের প্রাখর্য থেকে ভক্তির স্নিগ্ধতায়?
বলতে-বলতেই নরেন এসে হাজির।
'তুই আগমনী গেয়েছিস? কি রকম গাইলি? গা না একটিবার—'
নরেনকে নিয়ে বাইরে এলেন ঠাকুর। গোল বারান্দা পেরিয়ে গঙ্গার পোস্তার উপরে এলেন। 'গা না—'
নরেন গান ধরল :

কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বলমা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই॥
চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে
তুই না কি মা তারি সঙ্গে সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥
কেমনে মা ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে—
এবার নিতে এলে পরে বলব উমা ঘরে নাই॥

সেই অন্নদা গুহ একদিন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। 'তুমি তো নরেনের বন্ধু?' উৎসুক হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর। 'জানো তো ওর বাবা মারা গেছে—'
মাথা হেঁট করে রইল অন্নদা।
'ওদের বড় কষ্ট। দিন চলে না। এখন বন্ধুবান্ধবরা যদি কিছু সাহায্য করে তো বেশ হয়।'
অন্নদা চলে গেলে ঠাকুরকে বকতে লাগল নরেন। সে কি কড়া-কড়া কথা!
'কেন, কেন আপনি ওর কাছে ও সব কথা বলতে গেলেন?'
'তাতে কি হয়েছে?'
'কি হয়েছে মানে? আমার দুঃখ-দৈন্যের কথা যার-তার কাছে বলে-বলে বেড়াবেন? আমার কি একটা মান নেই? আমি কি ভিখিরি?'
বকুনি খেয়ে কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। বললেন, 'ওরে তুই ভিখিরি হবি কেন? আমি ভিখিরি হব। আমি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে করব তোর জন্যে।'
কিন্তু দুঃখে-কষ্টে দেহই যদি না থাকে তবে সবই বৃথা।
'বাঁচবার ইচ্ছে কেন? কেন দেহের যত্ন করি? ঈশ্বর নিয়ে সম্ভোগ করব, তাঁর নাম-গুণ গাইবো, তাঁর জ্ঞানী-ভক্ত দেখে-দেখে বেড়াবো।' ত্রৈলোক্য সান্যালকে বলছেন ঠাকুর : 'তাই মাকে বলেছিলাম, মা, একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি, এখানে-ওখানে যেতে পারি, সঙ্গ করতে পারি জ্ঞানী-ভক্তদের। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু—'
তাই কোথায় কোন দোরে গিয়ে তোর জন্যে ভিক্ষে করব?
ঠাকুরের বড় অভিমান হয়েছে মা'র উপর। নরেনের এখনো একটা হিল্লে হল না!

দিন-দিন ম্লান হচ্ছে সেই চারুকান্তি! তাই বলছেন ত্রৈলোক্যকে : 'এই দেখ না, নরেন্দ্র—বাপ মারা গেছে, বাড়িতে বড় কষ্ট, কোনো উপায় হচ্ছে না। শুধু দুঃখ ভোগ করছে।' একটু হয়তো থামলেন। বললেন, 'তা কি করা! ঈশ্বর কখনো সুখে রাখেন, কখনো দুঃখে রাখেন—'
'আজ্ঞে, তাঁর দয়া হবে নরেনের উপর।' যেন আশ্বাস দিল ত্রৈলোক্য।
'আর কখন হবে!' অভিমানে কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে এল ঠাকুরের : 'তবে কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না! কিন্তু যাই বলো, কারু-কারু সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকতে হয়।' নরেন্দ্র কাছেই ছিল, তার দিকে সস্নেহ চোখে তাকালেন ঠাকুর।
'আমি নাস্তিক মত পড়ছি।' নরেন নিস্পৃহের মত বললে।
'দুটোই আছে—অস্তি আর নাস্তি।' বললেন ঠাকুর : 'দুটোই যখন আছে, অস্তিটাই নাও না কেন?'
কী মনে হয় চারদিকে তাকিয়ে? একটা কিছু আছে? না, সমস্তই এলোমেলো, ভাঙাচোরা? ট্রেনে যেতে-যেতে দেখি মাঠের ধারে পোড়ো বাড়ি, ইটের পাঁজা ভেঙে পড়েছে, ফাটলে-ফাটলে বট-পাকুড়ের জড়িপটি। সহজেই বুঝে নিতে পারি, পরিত্যক্ত, জনশূন্য। আবার হঠাৎ কখনো আগ-রাতের দিকে চকিতে একটা আলো-জ্বালা বাড়ি চোখে পড়ে। কাউকে দেখা যায় না বটে, তেরছা আলোয় চোখে পড়ে কোনো আসবাবের টুকরো কিংবা কোনো দেয়ালের পট-পঞ্জী। কিংবা দিনের বেলায় আরেকটা বাড়িতে চোখে পড়ল, এরিয়েলের তার, কিংবা জামাকাপড় শুকোতে দিয়েছে রেলিঙে। সহজেই বুঝে নিতে পারি, লোক আছে। শ্রী আছে, শৃঙ্খলা আছে, স্থিতি-গতি আছে। তেমনি পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে কি মনে হয় এ একটা দেয়ালে-গাছ-গজানো পোড়ো বাড়ি, না, আলো-জ্বলা গানের-পরশ-লাগা আনন্দ-নিকেতন?
হয় নীতি, নয় শক্তি, নয় শৃঙ্খলা—একটা তো কিছু আছে। অন্তত একটা ধারা-বাহিকতা। অন্তত একটা পুনরাবৃত্তি। থাকাটাই যদি সত্যি হয় তবে তাই, তাই ভগবান।
'কিন্তু ভগবান তো ভক্তকে দেখবেন।' সুরেশ মিত্তির বললে নরেনের পক্ষ হয়ে। 'নইলে তাঁকে ন্যায়পরায়ণ বলি কি করে?'
'সেই তো মায়া! ঈশ্বরের কাজ বুঝি এমন আমাদের সাধ্য কি। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে। পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পর দেখেন, ভীষ্মদেব কাঁদছেন। কি আশ্চর্য! পাণ্ডবেরা প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণকে—পিতামহ অষ্ট-বসুর এক বসু, এঁর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না। ইনিও মৃত্যুর মায়াতে কাঁদছেন? তারই জন্যে কি? জিগগেস করো ভীষ্মকে। জিগগেস করাতে ভীষ্মদেব বললেন, কৃষ্ণ, ঈশ্বরের কাজ কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন সেই পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নেই। যখনই এই কথা ভাবি তখনই কাঁদি। এই ভেবে কাঁদি ঈশ্বরের কার্য বোঝবার যো নেই।'
'একটু গা না—' বললেন ফের নরেনকে।

'ঘরে যাই—অনেক কাজ আছে।' ঘুরে দাঁড়াল নরেন।
ঠাকুর অভিমানের সুর মিশিয়ে বললেন, 'তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন? যার আছে কানে সোনা তার কথা আনা-আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা, তার কথা কেউ শোনে না।'
সকলে হেসে উঠল।
'তুমি বাবু গুহদের বাগানে যেতে পারো। প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না গুহদের বাগানে। এ কথা বলতুম না—তা তুই কেঁড়েলি করলি কেন?'
নরেন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। শেষে বললে, 'যন্ত্র নেই। শুধু গান—'
'আমাদের বাছা যেমন অবস্থা। এইতে পারো তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত!'
'কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার—' গান ধরল নরেন। ভাবাবেশে তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। দেখে ঠাকুরের মহানন্দ!
নরেন কি তবে ধ্যানের পথে? সমাধির পথে? যিনি নাদরহিত, ব্যঞ্জনরহিত, স্বর-রহিত, উচ্চারণরহিত, রেখারহিত—নরেন কি সেই ব্রহ্মের সন্ধানে?
যেমন তিলের মধ্যে তেল, দুধের মধ্যে ঘি, ফুলের মধ্যে গন্ধ, ফলের মধ্যে রস, কাঠের মধ্যে আগুন তেমনি শরীরের মধ্যে আত্মা। সর্বব্যাপী, সর্বস্বরূপ। স্নেহস্বরূপ, স্বাদস্বরূপ, সৌরভস্বরূপ। বাতাস যেমন আকাশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তেমনি ঈশ্বরও হৃদয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। হৃদয়ই আকাশ। বাতাস আর ঈশ্বর দুইই নিশ্বাসবস্তু। এই হৃদয়াকাশেই ধরতে হবে সেই সমীরণকে। নরেন কি সেই হৃদয়াকাশের অভিযাত্রী?
'লাল জ্যোতি দেখলুম।' ঠাকুর বলছেন তাঁর আশ্চর্য দর্শনের কথা: 'তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ। একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, মা ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'
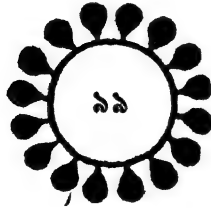
দেহত্যাগের আর দেরি নেই। প্রায়োপবেশনেই সমাধি-শয়ন নেব এবার।
ঠাকুর তবে কি করতে আছেন? তাঁর ভালোবাসায় তবে আর লাভ কি? তিনি থাকতে যদি মা-ভাই-বোনকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয় তবে তাঁরই বা থাকবার কী অর্থ!

এটর্নির আফিসে কিছু খাটাখাটনি করল ক'দিন। অনুবাদ করল কখানা বইয়ের। জল গরম করবার মতও রোজগার নয়।
শত ঠেলা মেরেও সরানো যাচ্ছে না অভাবের হাতিকে। এবার ঠাকুর এসে হাত মেলান। তাঁর মা'র তো অনেক প্রতাপ। মা'র কাছে তাঁর তো অনেক খাতির। এবার তাঁর মাকে বলে-কয়ে একটা ব্যবস্থা করিয়ে দিন।
ছুটল দক্ষিণেশ্বর। একেবারে ঠাকুরের পদপ্রান্তে।
'আপনার মাকে একবারটি বলুন।'
অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কি বলব?'
'মা-ভাই-বোনের কষ্ট আর দেখতে পারি না।' নরেন বললে প্রায় পরাভূতের মত : 'ওদের কষ্টের যাতে লাঘব হয়, একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি হয় আমার, আপনার মা'র কাছে সুপারিশ করুন একটু—'
ঠাকুর তাকালেন স্নিগ্ধ চোখে। বললেন, 'আমার মা, তোর কে?'
পুত্তলিকা। প্রস্তরপ্রতিমা।
নরেন মাথা হেঁট করে রইল। বললে, 'আমার কে না কে, তাতে কী আসে-যায়? আপনার তো সব। আপনার কথা তো আর ফেলতে পারবে না। একটু বলুন না আমার হয়ে। যাতে টাকাকড়ির একটু মুখ দেখি। মা-ভাই-বোনের ম্লান মুখে একটু হাসি ফোটাই!'
'ওরে ও সব বিষয়-কথা বলতে পারি না—'
'ও সব বাজে কথা ছাড়ুন।' নরেন মরীয়া হয়ে উঠল : 'আপনাকে বলতেই হবে। নইলে ছাড়ব না কিছুতেই।'
ঠাকুরের চক্ষু দুটি ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে, জানিস না, কতবার বলেছি তোর হয়ে। বলেছি, মা, নরেনের দুঃখ-কষ্ট দূর কর্। নরেনকে টাকা দে—'
'বলেছেন? বেশ, আজ একবার বলুন।'
'তুই গিয়ে বল। কাছে বসে একবার মা বলে ডাক।'
'আমার ডাক আসে না।'
'তারই জন্যে তো হয় না কিছু সুরাহা।' ঠাকুর তাকালেন তার মুখের দিকে। 'তারই জন্যে তো তোর এত কষ্ট। তুই মাকে মানিস না বলে মা আমার কথাও শোনেন না। শোন,' ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন : 'আজ মঙ্গলবার। রাত্তিরে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তার পর যা চাইবি মা'র কাছে, মা দিয়ে দেবেন। লুট করেও মা'র ভাণ্ডার শেষ করতে পারবিনে।'
'সত্যি?'
'তুই দ্যাখই না চেয়ে।'
তবে আর ভয় নেই। আকুল হয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগল নরেন। প্রার্থনা করা মাত্রই রাত্রির অবসান হয়ে যাবে। সম্পদে-সৌন্দর্যে ভরে উঠবে ঘর-দুয়ার। ক্লেশভার কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যাবে দারিদ্র্য। উচ্ছল দক্ষিণ বাতাসের মত আসবে এবার সচ্ছলতা।

কত সহজ সমাধান। শ‍ুধ‍ু প্রণাম আর প্রার্থনা। শ‍ুধ‍ু স্বীকৃতি আর সমর্পণ!
উৎকণ্ঠার কণ্টকের উপর দিয়ে হে'টে-হে'টে এল সেই মঙ্গলরাত্রি। ক্রমে এক প্রহর কেটে গেল। ঠাকুর এসে বললেন, 'যা এবার শ্রীমন্দিরে। প্রাণ ঢেলে প্রণাম কর। তার পর চা প্রাণ ভ'রে।'
যেন নেশা করেছে নরেন, পা টলতে লাগল। কী না জানি সে দেখবে! কী না জানি শ‍ুনবে মা'র ম‍ুখের থেকে! প্রস্তরময়ী প্রাণময়ী হয়ে উঠবে। জড়প‍ুত্তলী হয়ে উঠবে স‍ুভাষিণী।
মন্দিরে আর কেউ নেই। শ‍ুধ‍ু নরেন আর ভবতারিণী।
কী দেখল নরেন চোখ চেয়ে? দেখল অখিল জগতের জননী প্রেম ও প্রসন্নতার নিত্যনির্ঝরিণী হয়ে বিরাজ করছেন। সৌম্যা স‍ুন্দরী আর্তিহারিণী। সহস্র-নয়নোজ্জ্বলা হয়ে সংসারে সমার‍ূঢ় হয়ে আছেন। কোথাও শোক নেই দ‍ুঃখ নেই অভাব-অভিযোগ নেই।
ত্রিলোকমোহিনী ম‍ূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে নরেন আর কী প্রার্থনা করবে? প্রণাম করে ভক্তিবিহ্বল হ‍ৃদয়ে বলে উঠল, 'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও!'
তন্ময়ের মত ফিরে এল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 'কি রে, গিয়েছিলি মা'র কাছে? চেয়েছিলি টাকাকড়ি?' নরেন বিম‍ূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।
'কি রে, বলেছিলি আমার সংসারের দ‍ুঃখ কষ্ট দ‍ূর করে দাও?'
'কি আশ্চর্য, সব ভুল হয়ে গেল। এখন কী হবে?' অসহায়ের মত ম‍ুখ করলে।
'যা, যা, ফের যা।' ঠাকুর তাকে ঠেলে দিলেন মন্দিরের দিকে। 'গিয়ে ফের প্রার্থনা কর। মনের কথা মাকে না বলবি তো কাকে বলবি? কেন ভুল হবে? মাকে গিয়ে বল, মা আমাকে চাকরি দে, আরাম দে, স্বাচ্ছন্দ্য দে—'
নরেন আবার এসে দাঁড়াল ভবতারিণীর সম‍ুখে।
সেই কনকোত্তমকান্তিকান্তা দয়াদ্র্চিত্তা অখিলেশ্বরী। সর্বব্যাপিনী মহতী স্থিতি-শক্তি। শক্তিমতী সত্তা। বিদ্যার‍ূপে উদ্ভাসিনী।
কী আর ভিক্ষা করব মা'র কাছে? মহীর‍ূপে ম‍ৃত্তিকার‍ূপে জগৎসংসারকে মায়ের মতনই ব‍ুকে করে আছেন। আমিও তো মা'র কোলে অমল শিশ‍ু।
'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও—'
আবার ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।
'কি রে, এবার চেয়েছিলি ঠিক-ঠিক?'
'পারল‍ুম না। এল না ম‍ুখ দিয়ে।'
'সে কি কথা? তুই কি আনাড়ি না আকাট?'
'মাকে দেখামাত্রই কি রকম একটা আবেশ আসে।' নরেন বলতে লাগল ম‍ুগ্ধের মত। 'যা চাইবো বলে ভেবেছিল‍ুম তা আর মনে করতে পারল‍ুম না।'
'দ‍ূর ছোঁড়া! নিজেকে প্রথমে একট‍ু সামলে নিবি।' ঠাকুর যেন তাকে শিখিয়ে দিলেন : 'গোড়াতেই তলিয়ে যাবিনে। সামলে নিয়ে চারদিক ব‍ুঝে-সমঝে মাথা ঠাণ্ডা করে চাইবি। যা, আরেকবার গিয়ে চেষ্টা কর। এমন সোনার স‍ুযোগ আর

আসবে না।' নরেনকে আবার তিনি ঠেলে দিলেন। নরেন আবার এসে পৌঁছুল মন্দিরে।

পরমা মায়া মোক্ষরূপে বসে আছেন সামনে। সুদূরবর্তী আকাশ থেকে সন্নিহিত মৃত্তিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাঁর আসন। দেহবুদ্ধিরূপে তিনি, আবার মনোরূপে তিনি। সুখদুঃখভোক্তা প্রাণরূপে তিনি, আবার বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে তিনি। তিনি সর্বস্বরূপা সর্বেশ্বরী। হীনবুদ্ধির মত তাঁর কাছে কী লাউ-কুমড়ো চাইব! যিনি বরদায়িনী মূর্তিতে অবাধদর্শনা হয়ে আছেন তাঁর কাছে আবার কী ভিক্ষে করব? যিনি সর্বাবাধাপ্রশমনী তাঁর সত্তায় বিশ্বাস হোক এবার। তা হলে আর অভাব নেই কাতরতা নেই অন্ধকার নেই।

'আর কিছু চাই না মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।' বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল নরেন।

প্রকৃষ্টরূপে অবনত হওয়ার নামই প্রণাম। অহংজ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করার নামই প্রণিপাত। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

মানুষের দরজায়, বিষয়ের দরজায় মাথা ঠুকব না আর। সহস্রশীর্ষে প্রকৃতিরূপিণী জননীকে প্রণাম করব।

'কি রে, চাইলি এবার?' ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'চাইতে লজ্জা করল!'

'লজ্জা করল!' আনন্দে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। নরেন বসল তাঁর পদচ্ছায়ে। তখন ঠাকুর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'মা বলে দিয়েছেন তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না কোনোদিন।'

ও-সবে আর যেন আগ্রহ নেই নরেনের। বললে, 'আমাকে মা'র গান শিখিয়ে দিন।'

'কোন্‌টা শিখবি?'

'মা ত্বং হি তারা—সেই গানটা—'

ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন।

'মা ত্বং হি তারা
ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমিই আদ্য মূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অঙ্গপুটে
সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা॥

সারা রাত গাইলে ঐ গান। ঘুমুতে গেল না। নিশীথরাত্রির সঙ্গীতময়ী মহতী সত্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল।
পরদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে নরেন। তার পাশে বসে আছেন ঠাকুর। যেন পাহারা দিচ্ছেন।
বৈকুণ্ঠ সান্যাল এসেছে।
'ওরে এই ছেলেটিকে চিনিস? এ বড় ভালো ছেলে, নাম নরেন্দ্র।'
'এখনো ঘুমুচ্ছে যে?'
'কাল সমস্ত রাত মা'র গান গেয়েছে—মা ত্বং হি তারা। গাইতে-গাইতে রাত কাবার। কাল কী হয়েছিল জানিস নে বুঝি?'
কৌতূহলী হয়ে তাকাল বৈকুণ্ঠ।
'মাকে আগে মানত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছিল তাই মা'র কাছে গিয়ে টাকা-কড়ি চাইতে বলে দিয়েছিলাম। তা গিয়েছিল চাইতে, কিন্তু পারল না! লজ্জা করল!'
বলতে-বলতে আনন্দে উছলে পড়ছেন ঠাকুর: 'বললে, ফুল-ফল চেয়ে কী হবে, মা তোকেই চাই। তাই গান শিখে নিয়ে গাইলে সমস্ত রাত—তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোহরা। কালী মেনেছে নরেন, মা মেনেছে, বেশ হয়েছে—তাই না?'
বৈকুণ্ঠ সায় দিল: 'বেশ হয়েছে।'
হাসতে লাগলেন ঠাকুর: 'নরেন কালী মেনেছে, মা মেনেছে—কী বলো, বেশ হয়েছে। কেমন? তাই না?'

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
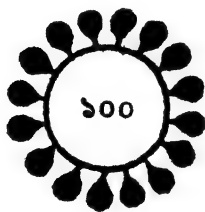
'আত্মজীবনী লেখা মানে কতগুলো মিছে কথার জাল বোনা।' বলছেন গিরিশচন্দ্র। 'শুধু লোকের কাছে দেখাবার চেষ্টা আমি খুব বাহাদুর—আমার খাওয়া, শোওয়া, ঘুম, স্বপ্ন, চিন্তা সব অসাধারণ। দোষগুলি ঢাকা দিয়ে আমি মস্ত একজন ভগবানের স্পেশ্যাল-মার্কার তৈরি—এই তো বলতে হবে। দম্ভের এর চেয়ে আর কিছু প্রকাশ হতে পারে না। শুধু পালিশ করে নিজেকে দেখানো, আমি কত মহৎ,

কত উদার, কত প্রতিভাশালী। আত্মজীবনী মানে নিজের ওকালতি করা।'
'কেউ-কেউ তো আত্মজীবনীতে নিজের দুষ্প্রবৃত্তির কথাও বলে থাকেন।' বললেন একজন।
'তাও নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করবার জন্যে।'
আমার অহঙ্কার ভেঙে ফেল, ধুলো করে দাও। একটি ফুৎকারে উড়িয়ে দাও মৃত-পত্রের জঞ্জাল, আবার একটি ফুৎকারে বাজিয়ে তোলো স্তম্ভিত সমুদ্রের শঙ্খ। নিজের পুচ্ছের আলোতে জোনাকির মত আত্মসংসার আলোকিত দেখছি, সে সীমার বাইরে আর সবই অস্বীকৃত—এবার দেখাও তোমার স্পর্শপ্রগাঢ় অন্ধকার। যেখানে বিচ্ছিত্তি নেই, বিবিক্ততা নেই, শুধু অনন্ত অন্তর্ব্যাপ্তি। তুমি যদি পুত্রের থেকে প্রিয়, বিত্তের থেকে প্রিয়, অন্যতর সমস্ত কিছুর থেকে প্রিয়, তবে সুখসাধনদ্রব্যে কেন সমাসক্ত রেখেছ? ভেঙে দাও এই মধুপাত্র। ভোগ তো একরকম মনোবিকার। ভেঙে দাও এই মত্ততার স্বপ্ন। কাটিয়ে দাও এই রোগরাত্রি। অহং থেকে আত্মাতে নিয়ে চলো।
'আহা, বসেছেন দেখ না!' বললেন ঠাকুর, 'যেন গোঁফে চাড়া দিয়ে সাইনবোর্ড মেরে বসেছেন!'
কিন্তু গোঁফের তেজ কতদিন! কতদিনই বা সাইনবোর্ডের চাকচিক্য।
একজন এলে আরেকজন যায়। আরেকজন এলে সে-একজন থাকে না। তাদের চির-কালের ঝগড়া। কিছুতেই তারা থাকতে পারে না একসঙ্গে। একজনের প্রকাশে আরেকজনের পলায়ন। তারা হচ্ছে 'আমি' আর 'তিনি'। অহং আর আত্মা। হয় আমি থাকি নয় তুমি থাকো। আর, তুমি যদি আসো আমি কোথায়!
"পাছে অহঙ্কার হয় ব'লে গৌরীচরণ "আমি" বলত না—বলত "ইনি"। আমিও তার দেখাদেখি "ইনি" বলতাম। আমি খেয়েছি না বলে বলতাম ইনি খেয়েছেন। সেজবাবু তাই দেখে একদিন বললে, সে কি কথা, তুমি কেন ওসব বলবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার তো আর অহঙ্কার নেই।'
না, আমারও বুঝি অহঙ্কার হত মাঝে-মাঝে!
পূর্বকথা, বেলতলায় তন্ত্রের সাধনার কথা বলতে গিয়ে বললেন ঠাকুর, 'যেদিনই অহঙ্কার করতুম তার পরদিনই অসুখ হত।'
দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির সেই মেথরানির কথা মনে নেই? তার যে কি অহঙ্কার! গায়ে দু-একখানা গয়না ছিল। যে পথ দিয়ে আসে গয়নার ঝলস দিয়ে বলে, এই, সরে যা! তার মানে, এই দেখে যা! মেথরানিরই এই, তা অন্য লোকের কথা আর কি বলবো!
একমাত্র নিরহঙ্কার যুধিষ্ঠির। পাঁচ ভাই চলেছে মহাপ্রস্থানে। সর্বপ্রথম পড়ল সহদেব। ভীম জিগগেস করল, সহদেবের পতনের কারণ কি? যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব মনে করত তার মত প্রাজ্ঞ আর কেউ নেই—সেই অহঙ্কারে। তার পরে পড়ল নকুল। নকুল পড়ল কেন? নকুল ভাবত তার মত রূপবান আর কেউ নেই—সেই অহঙ্কারে। তার পরে অর্জুন। অর্জুন ভাবত, আমিই সর্বাগ্রগণ্য ধনুর্ধর—সেই

অভিমানে। তার পরে ভীম। আমি কেন পড়লুম? তুমি অতিরিক্ত ভোজন করতে, অন্যের শক্তি উপেক্ষা করে নিজের শক্তির শ্লাঘা করতে, সেই দর্পে। সশরীরে স্বর্গে এলেন শুধু যুধিষ্ঠির।

তোমার দম্ভ নয়, তোমার দয়া!

নদীতীরে বসে তপস্বী সন্ধ্যা করছিলেন, এক নিরাশ্রয় বৃশ্চিক ভাসতে-ভাসতে সেখানে এসে উপস্থিত। স্থলে আশ্রয় দেবার জন্যে জল থেকে তাকে তুললেন তপস্বী। তুলতে-না-তুলতেই বৃশ্চিক তাঁকে দংশন করল। বিষজ্বালায় অস্থির হয়ে জলে তখুনি তাকে ছুঁড়ে ফেললেন। জলে পড়ে বিপন্ন বৃশ্চিক আবার হাবুডুবু খেতে লাগল। দেখে আবার দয়া হল তাপসের। আবার তাকে তুললেন হাতে করে। আবার দংশন। আবার নিক্ষেপ। পরে ভাবলেন, বৃশ্চিক তার নিজের ধর্ম বারে-বারে পালন করছে বারে-বারে দংশন করে, কিন্তু আমি কেন ধর্মভ্রষ্ট হচ্ছি? আমার সর্বজীবে দয়া। আমি কেন তাকে জলে ছুঁড়ে ফেলছি? আমার চেয়ে বৃশ্চিক বেশি স্বধর্মাশ্রিত। এই ভেবে আবার তাকে তুললেন জল থেকে। দংশন করলেও এবার আর ফেললেন না। স্থলেই স্থান করে দিলেন।

বার-বার ঘষলেও চন্দন চারুগন্ধ। বার-বার ছিন্ন করলেও ইক্ষুকাণ্ড মধুস্বাদু। বার-বার দগ্ধ করলেও কাঞ্চন কান্তবর্ণ। তেমনি যারা সজ্জন তারা প্রকৃতিবিকৃতি-শূন্য।

তোমার ক্ষোভ নয়, তোমার ক্ষমা।

তুমি অতৃণ মাঠ। সেখানে আগুন পড়লেও বা কি। আগুন মাটির স্পর্শে আপনিই শান্ত হয়ে যায়। তপ্ত লোহকে ছেদন করবার জন্যে তোমার হাতে শীতল লৌহ। ধূলির ধরণীতে তুমিই ধারাধর।

তুমি পিঁপড়েটির পর্যন্ত নিন্দা করো না। বরং তার পায়ের নূপুরগুঞ্জনটি শোনো।

'নগণ্য পিঁপড়ের পর্যন্ত নিন্দে কোরো না।'

এ সংসারে সুখ দুর্লভ, সুখই আবার সুলভ। তাই কেউ যদি আমার নিন্দা করে প্রীতিলাভ করে, সমক্ষেই হোক বা অসাক্ষাতেই হোক, করুক, আনন্দ পাক। নিন্দা করার অধিকার দিয়েই তাকে আমি অভিনন্দিত করছি।

ভববল্লী কি? তৃষ্ণা। দারিদ্র্য কি? অসন্তোষ। দান কি? অনাকাঙ্ক্ষা। ভোগ্য কি? সহজ সুখ। ত্যাজ্য কি? অহঙ্কার।

নিজের অন্তরঙ্গদের দেখবার জন্যে ব্যাকুল তখন ঠাকুর। রাতে ঘুম নেই। কালী-মন্দিরে বসে-বসে কাঁদেন। বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও। মা গো, ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আসতে পারে তা হলে আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। আমি দেখে আসি।'

থেকে-থেকে তাই ছুটে আসেন বলরাম বসুর বাড়িতে। সেখানেই প্রেমের হাট বসিয়েছেন। বলেন, 'জগন্নাথের সেবা আছে বলরামের। খুব শুদ্ধ অন্ন।' এসেই বলরামকে বলেন, 'যাও, নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এস। এদের

খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ানো হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে। এদের খাওয়ালে তোমার ভালো বই মন্দ হবে না।'

বলরাম আবার একটু হাত-টান।

ঠাকুরকে একদিন গাড়ি করে দিয়েছে দক্ষিণেশ্বর যাবে। ভাড়া ঠিক করেছে বারো আনা। সে কি কথা! বারো আনায় দক্ষিণেশ্বর?

'তা ও অমন হয়।' ঘাড় নেড়ে দিয়ে চলে গেল বলরাম। শেষকালে কেলেঙ্কার। রাস্তার মাঝেই গাড়ি পড়ল ভেঙে। ঘোড়া আর যেতে চায় না। চাবুক চালালো গাড়োয়ান। তখন সেই ভাঙা গাড়ি নিয়েই দে-দৌড়। পড়ি কি মরি ঠিক নেই।

যখনই দেখবে বন্দোবস্তটা একটু শিথিল বা কৃপণ, তখনই ঠাকুরের ভাষায় 'বলরামের বন্দোবস্ত'। গাড়ি না করে ঠাকুর যদি নৌকোয় আসেন তবেই যেন বলরাম বেশি খুশি। কড়া-গণ্ডা উশুল করে নেওয়ার পক্ষপাতী। তাই বললেন একদিন ঠাকুর, 'যখন খ্যাঁট দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই আজ বিকেলে নাচিয়ে নেবে।'

কীর্তনের সময় ঠাকুর যখন নাচেন তখন বলরাম খোল বাজায়। সে আবার আরেক যন্ত্রণা। বলরামের তালবোধ নেই। তার ভাবখানা হচ্ছে এই, আপনারা গাও নাচো আনন্দ করো, আর আমি যেমন-তেমন খোলে চাঁটি মারি।

হাজরা ঠাট্টা করে বলে, 'তোমার খালি বড়লোকের ছেলের দিকে টান।'

'তাই যদি হবে তবে হরীশ, নেটো, নরেন্দ্র—এদের ভালোবাসি কেন? ভাত নুন দে খাবার পয়সা জোটে না নরেন্দ্রর।'

বলরাম জিগগেস করল, 'সংসারে পূর্ণজ্ঞান হয় কি করে?'

'শুধু সেবা করে। মায়ের সেবা করে। জগতের মা-ই সংসারের মা হয়ে এসেছেন।' বললেন ঠাকুর। 'যতক্ষণ নিজের শরীরের খবর আছে ততক্ষণ মা'র খবর নিতে হবে। তাই হাজরারে বলি, নিজের কাশি হলে মিছরি মরিচ করতে হয়। যতক্ষণ এ সব করতে হয় মা'র খবরও নিতে হয়। তবে যখন নিজের শরীরের খবর নিতে পাচ্ছি না, তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।'

ঠাকুর ও ভক্তদের খাওয়াবার নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে বলরাম। বারান্দায় বসে গিয়েছে সার বেঁধে। দাসের মতন দাঁড়িয়ে আছে বলরাম, প্রভুর মত নয়। তাকে দেখলে কে বলবে সে এ বাড়ির কর্তা।

একদিন ভাবদৃষ্টিতে বলরামকে দেখলেন ঠাকুর। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত দেখলেন চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দল চলেছে। তার পুরোভাগে বলরাম। কিরূপ ভক্ত এখানে আসবে আগে থেকে তা দেখিয়ে দেয় মহামায়া। বলরাম না এলে চলবে কেন? নইলে মুড়ি-মিছরি সব দেবে কে?

প্রথম যেদিন দেখলেন দক্ষিণেশ্বরে, বললেন, 'ওগো মা বলেছেন তুমি যে আপনার জন। তুমি যে মা'র একজন রসদদার। তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে—কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।'

তাই দেয় বলরাম। চাল-ডাল চিনি-মিছরি আটা-সুজি সাগু-বার্লি। বলেন ঠাকুর, 'ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি। মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।'

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির নাম রেখেছেন 'মা কালীর কেল্লা'—প্রথম কেল্লা। দ্বিতীয় কেল্লা হচ্ছে বলরামের বাড়ি। ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রিট।
সেই বাড়িতেই ঠাকুরের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের দ্বিতীয় দেখা।
প্রথম দেখা এটর্নি দীননাথ বোসের বাড়িতে। বোসপাড়া লেনে। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পড়ে প্রথম জানতে পায় পরমহংসদেবের কথা। এ আবার কেমন পরমহংস! ব্রাহ্মরা বেশ ভোল বদলাচ্ছে যা হোক। হরি ধরেছে, মা ধরেছে, এবার মনের মত এক পরম-হংসও খাড়া করেছে দেখছি। ভেলকি ধরেছে মন্দ নয়। এমনি করে লোক বাগাবার মতলব। যাই একবার দেখে আসি গে।
বেজায় ভিড় হয়েছে। ঠাকুরকে ঘিরে বহু ভক্তের সমাগম। ঐ বুঝি কেশব সেন। ঘন-ঘন সমাধিস্থ হচ্ছেন ঠাকুর আবার সমাধিভঙ্গের পর উপদেশ দিচ্ছেন। যারা শুনছে তারা যেন কর্ণ দিয়ে সুধা পান করছে।
সন্ধে হয়েছে। সেজ জেবলে রেখে গেল ঠাকুরের সামনে। ঠাকুরের তখনো অর্ধবাহ্য-দশা। বললেন, 'সন্ধে হয়েছে?'
ঢং! গিরিশের মন তেতে উঠল। দিব্যি সেজ জবলছে সামনে, আর, বলছে কিনা, সন্ধে হয়েছে? সন্ধে না হলে আলো কেন?
সন্ধে হয়েছে? আবার জিগগেস করলেন ঠাকুর।
হ্যাঁ, হয়েছে। কে একজন বলে উঠল।
কেউ একজন না বলে দিলে যেন সন্ধে হয়েছে কিনা বোঝা যাবে না! চোখের সমুখে আলো জেবলে দিলেও না! বুজরুকি আর কাকে বলে! বিরক্তিতে সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল গিরিশের। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।
বাড়ি ফিরলে জিগগেস করলে পিসেমশাই, সদরালা গোপীনাথ বোস, 'কেমন দেখলে হে?'
একবাক্যে নস্যাৎ করল গিরিশ। 'বুজরুকি।'
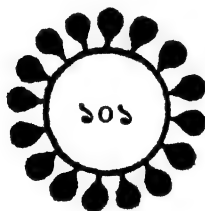
দ্বিতীয় দেখা বলরাম-মন্দিরে।
অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছে বলরাম। গিরিশকেও। কিন্তু ও কে?
ওকে চেন না? ও বিধু। কীর্তনওয়ালী।

ঠাকুরকে প্রণাম করল বিধু। ঠাকুরও মাটিতে মাথা রেখে দীনভাবে নমস্কার করলেন। কথা বলতে লাগলেন বিধুর সঙ্গে। পরিহাসমধুর সরল আলাপ।
অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ছিলেন সেখানে। তাঁর ভালো লাগল না। গিরিশের সঙ্গে জানাশোনা, তাই তাকেই জানালেন তাঁর বিরক্তি। বললেন, 'চলো হে গিরিশ আর কী দেখবে?'
'না, আরো একটু দেখি।'
'এই তো দেখলে—' প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন গিরিশকে।
গিরিশ দেখেও দেখল না, বুঝেও বুঝল না।
চৈতন্যলীলা অভিনয় করছে গিরিশ। দৃশ্যপট আঁকছে যে চিত্রকর তার সঙ্গে কথা কইছে। আঁকিয়ে গৌরভক্ত। ভক্তি না হলে রেখায় ফুটবে কি করে পেলবতা! চোখে জাগবে কি করে সংবেদনের স্বপ্ন!
'তোমার গৌরাঙ্গের মহিমা কিছু বলতে পারো?'
পারি বৈকি। তাঁকে দেওয়া ভোগের রুটিতে তাঁর দাঁতের দাগ দেখি।
'বলো কি হে—'
'সারাদিন খেটে-খুটে বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফিরে স্নান করে নিজের হাতে রাঁধি। গৌর-হরিকে ভোগ দিই। আকুল হয়ে ডাকি তাঁকে অন্ধকারে। দেখি তিনি খেয়ে গেছেন। ভোগের রুটিতে তাঁর দাঁতের দাগ।'
অন্তরের প্রেমধ্যানটি চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে। অগাধ বিশ্বাসের স্বচ্ছ সরোবরে ভক্তির শ্বেতপদ্ম। এ যেন সেই তনু বিনু পরশ নয়ন বিনু দেখা।
ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতে বসল গিরিশ।
কবে নিজের রূপ ভুলে অরূপের রূপ দেখতে পাব? কে দেবে আমাকে সেই তৃতীয় নয়ন? কে আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবে? কে দেবে সেই আলোকময়ের সংবাদ?
চৈতন্যলীলা মূর্ত হল রঙ্গমঞ্চে। নামল জগাই-মাধাই। গগনমণ্ডপ থেকে নামলেন গৌরচন্দ্র। বাজল খোল-করতাল। হরিনামের বান ডেকে এল। সবাই ডুবল সেই নামপ্রেমসাগরে।
'থিয়েটারে গৌর নেমেছে। তীর্থ হয়েছে নাট্যশালা। বসে গিয়েছে ভক্তির চাঁদনি বাজার। চল দেখে আসি—'
লোক আসছে দলে-দলে। শহর-গ্রাম ভেঙে। দিঙমূঢ় হয়ে। কিন্তু হে অমানীমানদ, দূর্বাদলশ্যামমূর্তি, তুমি কবে আসবে? হে লাবণ্যমনোরম, কবে দেখব তোমাকে?
মাধাই বলছে জগাইকে : 'জগা তুই নাচছিস কেন?'
'বৈরাগী হব। ব্যাটারা কিন্তু বেড়ে গায়, হরি হে দেখা দাও। মেধো, আমায় তেলক কেটে দিতে পারিস?'
'আচ্ছা হরে কে রে শালা, জগা, জানিস?' মাধাই টলছে নেশার ঝোঁকে : 'আমি হলে বলতেম, ধরে লে আও শালাকো! আমার মনে হয় এক শালা মালপোওয়ালা। খিদে পেলেই ডাকে।'

'চিক্সে খিদে বাগিয়ে নেয়। আমার তো চারখানা খেতেই কুপোকাৎ। আর ওরা এক-এক ব্যাটা রাধা বলে আর বিশখানা ওড়ায়।'
'এক শালাকে একদিনও বাগে পেলুম না।' মাধাই আপসোস করল।
জগাই ঠেলা মেরে বললে, 'তুই শালা যে মাতাল হয়ে ভোঁ হয়ে থাকিস—'
'দ্যাখ মাতাল বলিস তো ভালো হবে না। কোনো দিন মাতাল দেখেছিস? তুই যেমন ছটাকে—আমি দুসের খেয়ে সানসা আছি। এখন চলেছিস কোথায়?'
'চল না কেত্তন শোনা যাক গে। ব্যাটারা বেড়ে বাজায়—'
'তুই বড় গান শোননেওয়ালা—' ঠেলা মারল মাধাই।
'ওরে বেশ এক রকম রাধে-রাধে বলে, আমার ভাই রাধী নাপতিনীকে মনে পড়ে।'
'তুই দেখছি বৈরাগী হবি—'
'তোর চৌদ্দ দুগুনে বাহান্ন পুরুষ বৈরাগী হোক।'
আহত অভিমানের সুরে মাধাই বললে, 'ভেয়ের চৌদ্দপুরুষ তোলে রে শালা?'
কে এরা জগাই-মাধাই? এরা কি দুকড়ি সেন আর স্বয়ং গিরিশচন্দ্র?
ট্যাঁকে মটর-ভাজা, গিরিশের বাড়িতে এসেছে দুকড়ি। এসেছে মদের পিপাসায়। বাবা, সঙেগ 'দোগ্ধ মটর' আছে, এখন একটু মদিরা পেলেই দাহ মেটে।
মদ নেই। আসবাব-পত্র পালিশ করবার জন্যে এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট আছে। তাই সই।
নরেন সেই স্পিরিট ঢেলে দিল গেলাশে। জল না মিশিয়ে অম্লানবদনে তাই টেনে নিল দুকড়ি। অম্লানবদনে দগ্ধ মটর চিবুতে লাগল।
'এ করলে কি?' নরেনকে ধমকে উঠল গিরিশ : 'এ যে সাক্ষাৎ বিষ। লোকটা যে এক্ষুনি মারা যাবে।'
'আরে মশাই, ওতে আমার কি হবে?' অম্লানবদনে বললে দুকড়ি সেন। 'ও আমি নিত্য খাই।'
'বোতল-বোতল মদ খেয়েছি। একদিন বাইশ বোতল বিয়র খেয়েছিলুম।' অতীতের কথা বলছেন গিরিশচন্দ্র। 'মদ খেয়ে দেখেছি কি জানো? জোর করে মনকে ধরে রাখা—সে চেষ্টায় আবার অবসাদ আসে—আবার সেই অবসাদ দূর করবার জন্যে আবার মদ খাও।'
'তামাক?' জিগগেস করলেন কুমুদবন্ধু।
'তামাক! তামাক ঢের দেখেছি। ওর ঝাড়ে-বংশে খেয়েছি। শুধু কি তামাক? গাঁজা, আফিং, চরস, ভাং—কিছু বাকি রাখিনি।'
'তাই বলে গাঁজা?'
'গাঁজাতে ভীষণ উইল-পাওয়ার বাড়ে। যখন গাঁজা টেনে বুঁদ হয়েছি, তখন সত্যি-সত্যি রোগ সারিয়েছি উইল-পাওয়ারে। কিন্তু যাই বলো, আফিঙের মত ছোটলোক নেশা আর নেই। আমার শেষ নেশা দাঁড়িয়েছিল আফিং। একদিন আঙুর কিনেছি কতগুলি। অবিনাশ, বামুনের ছেলে, সর্বদা আসে এখানে। ওকে চারটে আঙুর দিলাম। কিন্তু দেবার পরক্ষণেই মনে হল চারটে না দিয়ে দুটো দিলেই হত। তখন

মনে-মনে বিচার করলাম—মন শালা এত ছোটলোক হল কেন? ভেবে-চিন্তে দেখলাম, আফিঙের এই কাজ। তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে আফিং ত্যাগ করলাম—'
'আর সব?'
'সব ছেড়েছি।'
'ছাড়তে পারলেন?' বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আপ্লুত কুমুদের কণ্ঠস্বর।
'সাধে ছেড়েছি? প্যায়দায় ছাড়িয়েছে।'
'কোনো নেশা করতে ইচ্ছে হয় না?'
'ঠাকুরের ইচ্ছেয় হয় না।' অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল গিরিশের চোখ: 'জীবনে অনেক অকাজ-কুকাজ করেছি। কোনো পাপ করতে আমার বাকি নেই। সব রকম হয়েছে। কিন্তু ওই আমার গৌরবের পসরা। ধুলোকাদা মেখেই দাঁড়িয়েছি ঠাকুরের সামনে। শুধু এই আমার গৌরব—আর আমার কিছু নেই—এই আমার পাপ, এই আমার ধুলোকাদা। এখন তুমি কোলে তুলে ধুলোকাদা মুছে নাও তো নাও—'
আর আমার কিছু নেই। আমার শুধু শরণাগতি। আমার শুধু সমর্পণের তর্পণ। তুমি যদি আমাকে ফেলে দেবে তো দাও। কিন্তু কোথায় তুমি ফেলবে? যেখানে ফেলবে সেখানেও তোমার কোল মেলা। তোমার কোলের বাইরে তো আর জায়গা নেই। তাই যেখানে রাখবে সেখানেই আমি তোমার কোলে ব'সে।
শাস্ত্রে বলে, কাশীতে মরলে মুক্তি মেলে। তাই মৃত্যুকালে কবীর চললেন কাশী ছেড়ে। বললেন, কাশীর বাইরেও যে মুক্তি আছে এটি প্রত্যক্ষ করব।
পরিচ্ছন্ন ও পুণ্যরুচিকে স্থান দেবে এর মধ্যে বাহাদুরি কি! যে কাঠে ঘুণ ধরে তাকে যজ্ঞের সমিধ করতে পারো তবেই বুঝি বাহাদুরি। যে লোহায় মরচে ধরে তাকে করতে পারো স্বর্ণপ্রভ তবেই বুঝি তোমার কৃতিত্ব। আর যে দেহে কামের বাসা তাকে করতে পারো তোমার মোহন মুরলী তবেই বুঝি তুমি কত বড় কারিগর।
তোমার দরশ-পরশ যে অমৃতসরস তা বুঝি কি করে? তোমার প্রেম যে শুনি স্পর্শমণি তার প্রমাণ কি? আমার হৃদয় ছাড়া কোথায় আর তার পরখ হবে? যদি আমিও হিরণ্ময় হতে পারি তবেই তো বলতে পারি তোমার প্রেম পরমধন পরশমণি। আমি যদি নিরাময় হতে পারি তবেই তো জানবে জগজ্জনে, তুমি অন্নময় অমৃতময় কল্যাণকরুণাময়। তুমি রোগার্তের ভিষক, অকিঞ্চনের সর্বস্ব, দরিদ্রের অক্ষয় কোষাগার।
যখন তপ্ত লোহার শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে ছিদ্র করেছ তখন বুঝিনি, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছি, কিন্তু এখন যখন হাতে তুলে মুরলী করে বাজাচ্ছ, তখন এই বলে কাঁদছি, শুধু সপ্ত ছিদ্র না করে কেন আমাকে তুমি শতচ্ছিদ্র করোনি? বাঁশকে যদি বাঁশিই না করবে তবে কেমন তুমি বংশীধর?
'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখে বৈষ্ণব বাবাজীরা ভয়ানক বিগলিত হয়েছে। সব সময়ে ঘিরে আছে গিরিশকে। তার হল্‌ঘরে তাদের ঘনঘন আনাগোনা। কেউ বলছে তার মধ্যে নিত্যানন্দ আবির্ভূত হয়েছেন, কেউ বলছে আপনার উপর মহাপ্রভুর কী কৃপা!
গিরিশ দেখল তার কাজকর্মের সমূহ বিপদ। এদের না তাড়ালে রক্ষে নেই।
সে দিন হল্‌-ভর্তি লোক। বাবাজী বৈষ্ণবদেরই ভিড়। কেউ বলছে, কি ভক্তি, কেউ

বলছে, কি প্রেম! কেউ বলছে, কি গান! এমন সুধার হরিনাম সাধের পণে কিনবি আয়!
বোতল খুলে গেলাশে মদ ঢালল গিরিশ।
'কি খাচ্ছেন? ওষুধ?' জিগগেস করল এক বাবাজী।
আরেক জন গদগদ হবার চেষ্টায় বললে, 'ও কি মহাপ্রভুর চরণামৃত?'
'না, মদ।' গিরিশ একটা বোমা ফেলল ঘরের মধ্যে।
'রামো! রামো!' নাকে-কানে কাপড় গুঁজে পালালো বাবাজীরা।
হ্যাঁ, মদের নেশা। পদের নেশা। ঈশ্বরপদের নেশা। নেশা ছাড়তে-ছাড়তে চলেছি। একটার পর আরেকটা। নতুনের পর আরো নতুন। নেশা ছাড়া নিশি নেই। সর্বশেষে সর্বনাশের নেশা। শিখর-শিহর।
চৌরাস্তায় রকে বসে আছে গিরিশ। ভক্তপরিবৃত হয়ে সমুখ দিয়ে চলে গেলেন ঠাকুর। চোখের পরে চোখ পড়ল। এক চোখের আকাশ থেকে আলো এসে পড়ল আরেক চোখের উঠোনে।
হৃদয়ের ঘুড়িতে যেন কার সুতো বাঁধা। টান পড়েছে ঘুড়িতে। কান্নিক খাচ্ছে।
'আপনাকে ডাকছেন পরমহংসদেব।' একজন ভক্ত এসে খবর দিল।
লাফিয়ে উঠল গিরিশ। 'কোথায়?'
বলরাম-মন্দিরে।
আর কথা নেই, ডাক এসে গেছে। কিন্তু পাব কি ঠিকানা? ঠিকানা পেলেও কি পারব পৌঁছুতে?
'বাবু আমি ভালো আছি। বাবু আমি ভালো আছি।' আপন মনে বলছেন ঠাকুর। এ কি গিরিশকে উদ্দেশ করে বলা?
বলতে-বলতে ভাবান্তর হল ঠাকুরের। বললেন, 'না, না, এ ঢং নয়। এ ঢং নয়।'
কি করে বুঝলেন আমার মনের কথা? কে এ সত্যবাক, সত্যজ্ঞানী? যে রূপে যা নিশ্চিত তাই সত্য। সর্বরূপে নিত্য যে বিরাজিত সেই সত্য। সমস্ত সংশয়খিন্ন বুদ্ধির উপরে সেই সত্যই কি জ্বলছে সূর্যের মত?
সরাসরি আলাপ হল গিরিশের সঙ্গে।
'গুরু কি?' জিগগেস করল গিরিশ।
'ঐ যে, কুটনি। যে মিলন ঘটিয়ে দেয়। ঘটক।'
সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হলেই বিশ্বজয়। একলব্য কি করেছিল? মাটির দ্রোণ তৈরি করে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণ নয়, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য। তবেই বাণসিদ্ধি। যদি সদগুরু হয় জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। সেই যে ঢোঁড়া ব্যাঙ ধরেছিল, ছাড়াতেও পারে না গিলতেও পারে না। দুয়েরই অশেষ ক্লেশ। জাত সাপে ধরলে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত।
'তা তোমার ভয় নেই। তোমার গুরু হয়ে গেছে।'

হয়ে গেছে? কে সে? কোথায়?

বুঝেও বুঝল না গিরিশ। আবার বলল, 'মন্ত্র কি?'

'ঈশ্বরের নাম।'

দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম যে নাম খুশি। যদি একটু রুচি থাকে তবেই বাঁচবার আশা। তাই নামে রুচি।

এ সেই 'খেতে-খেতে বেশ লাগছে।' জানো না বুঝি গল্প? মা'র রান্নাতে অরুচি—আরে, ছি ছি, এ যে মুখে দেওয়া যায় না। তুমি কি বলছ? এ যে আমি রেঁধেছি। বললে এসে স্ত্রী। তুমি রেঁধেছ? খেতে-খেতে বেশ লাগছে।
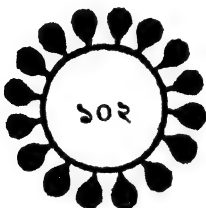
কেন এত ঈর্ষা? ঈশ্বরকে স্মরণ করো। কেন এত পরশ্রীকাতরতা? ঈশ্বরের শ্রী দেখ। কেন মিথ্যা আত্মস্ফীতি? সব দুদিনের।

'সব দুদিনের।' বললেন ঠাকুর : 'তালগাছই সত্য, তার ফল-হওয়া আর ফল-খসা দুদিনের।'

রাখালেরও মাঝে-মাঝে হিংসে হয়। সে বালকের হিংসে। ভালোবাসার অভিমান। গাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে যাবে বলে উসখুস করে। যদি আর কাউকে ডেকে নেন ঠাকুর, হিংসেয় জ্বলে যায়। যদি বলেন, যাই, কলকাতায় গিয়ে ছোকরাদের একটু দেখে আসি, রাগে ঝলসে ওঠে, 'ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে যে আপনি যাবেন?'

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এসেই বা রাখালের কী হচ্ছে? কই এখনো তো লাগল না কৃপার মলয় হাওয়া! তবে কি আমি পাঁকাটি? আমি কি অপদার্থ? আমার মধ্যে কি এতটুকুও সার নেই? কোথায় তবে সেই চন্দনগন্ধ?

জপে বসেছিল নাটমন্দিরে, বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। এত প্রেম এত কৃপা পেয়েও যার কিছু হয় না, তার মুখ দেখিয়ে কাজ নেই। উঠতেই পড়ে গেল ঠাকুরের সামনে।

'কি রে, এরই মধ্যে উঠে পড়লি?'

'আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

'কেন, কি হল?'

রাখাল মাথা হেঁট করে রইল।

'কি রে, মুখখানি অত ম্লান কেন? বল আমাকে।'

বলতে হল না। বুঝতে পারলেন ঠাকুর। বললেন, 'হাঁ কর।'
হাঁ করতেই জিভ টেনে ধরলেন রাখালের। আঙুল দিয়ে তিনটে রেখা টেনে দিলেন। কি যেন মন্ত্র পড়লেন নিচু গলায়। বললেন, 'যা, এখন বোস গে।'
রাখালের মন হাল্কা হয়ে গেল। মুখ ভরে উঠল খুশিতে।
শুধু তাই নয়, ঠাকুর একদিন তাকে টেনে আনলেন ভবতারিণীর সামনে। কপালে কারণের ফোঁটা দিয়ে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দিলেন। শিখিয়ে দিলেন আসন আর মুদ্রা। শিখিয়ে দিলেন ষটচক্র। সোপান-পরম্পরা!
আর রাখালকে পায় কে!
কৃপা আর কাকে বলে! মেঘ নেই জল ঝরে পড়ল। হলকর্ষণ নেই শস্য এল মাটি ফুঁড়ে। এমনি করেই আসে দয়ার দক্ষিণ হাওয়া! চাইতে না জানলেও এসে পড়ে। মনের বায়ুমণ্ডলে একটি উত্তপ্ত শূন্যতা সৃষ্টি হলেই বাতাসের আলোড়ন জাগে।
কৃপাস্পর্শে সাধনার দীপ্তি ফুটছে চেহারায়। কণ্ঠস্বরে মমতাময় মাধুরী।
'আহা, রাখালের স্বভাবটি আজকাল কেমন হয়েছে! দেখ, দেখ, ঠোঁট নড়ে—' বলছেন ঠাকুর ভক্তদের, 'অন্তরে নামজপ করছে কিনা!'
তারপর বললেন, 'কোথায় আমার সেবা করবে, তা নয়, আমাকেই এখন তাকে জল দিতে হয়।'
'কি করছিস রে বাবুরাম?' ঠাকুর ডাক দিলেন: 'এদিকে একটু আয় না।'
পান সাজছে বাবুরাম। বললে, 'পান সাজছি।'
'রেখে দে তোর পান সাজা।' বিরক্ত হলেন ঠাকুর। 'শুনে যা।'
শোন্। গুরুসেবাই সাধনাঙ্গ। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 'ভক্তি কি গাছের ফল রে বাবা পেড়ে খাবি?' বলছেন ঠাকুর: 'সেবা ছাড়া প্রেম নেই। সেবা ছাড়া ভক্তি নেই।'
নিজে-নিজেই পান সাজেন কখনো। ঘর ঝাঁট দেন। মালীর কাজ করেন।
'ওরে, ও মালী, ঐ গোলাপ ফুলটা তুলে দে তো—' একজন সত্যি-সত্যি সেদিন বললে ঠাকুরকে।
যা কাপড় পরেন! আর যেমন ভাবে পরেন! একটা মালী বলে ভাববে তা আর আশ্চর্য কি। বলামাত্রই ঠাকুর ফুলটি তুলে দিয়ে দিলেন লোকটাকে। খুশি হয়ে চলে গেল। কিছুদিন পরে জানতে পারল সেই মালীই শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন লজ্জায়-অনুতাপে মাটির সঙ্গে তার মিশে যেতে শুধু বাকি। দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখা করল ঠাকুরের সঙ্গে। কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'সেদিন আপনাকেই ফুল তুলতে বলেছিলাম—'
'তা কী হয়েছে!' অমলিন কণ্ঠে বললেন ঠাকুর, 'কেউ সাহায্য চাইলে তাকে তা দিতে হয়।'
ঠিক লোককেই তো বলেছিল ফুল তুলতে। মালী ছাড়া আর কি! আগাছার জঙ্গলকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করছেন। প্রার্থীকে ঠিক পেঁৗছে দিচ্ছেন কৃপার প্রফুল্ল ফুল। পঞ্চবটীর উত্তরে লোহার তারের বেড়া। তারই ওপারে ঝাউতলা। ঝাউতলার দিকে যেতে ঠাকুর পড়ে গেলেন বেড়ার উপর। হাতের একখানা হাড় সরে গেল।

তাই দেখে রাখালের মনোবেদনার অন্ত নেই। যাঁর শরীররক্ষা করার কথা তাঁকেই সে ফেলে দিলে! সেই তো ফেলে দিয়েছে! তা ছাড়া আবার কি। যদি সঙ্গে-সঙ্গে থাকত, চোখে-চোখে রাখত, ঘটত না এমন অঘটন। তার দোষেই এই দুর্দশা। ধিক্কারে মন ভরে গিয়েছে রাখালের। ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন। বললেন, 'তোর দোষ কি। তুই থাকলেও তোকে তো নিতুম না ঝাউতলা।'

অপূর্ব মমতায় উথলে উঠলেন। বললেন, 'দেখিস তুই যেন পড়িসনে। যেন ঠকিসনে মান করে।'

কত লোক আসছে কতদিক থেকে। পাছে ঠাকুরের হাত-ভাঙা দেখে কেউ কিছু ভুল বোঝে তারই জন্যে রাখাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় হাতখানি। ঠাকুরের হাত ভেঙেছে এ যেন তার নিজের কলঙ্ক।

'কেন অমন ঢাকাঢাকি করিস?' বিরক্ত হন ঠাকুর। 'মা যে অবস্থায় রেখেছেন সেই অবস্থায় থাকতে দে। লোকে নিন্দে করে তো আমাকে করবে! বলবে নিজের একখানা হাত সামলাতে পারেন না সে আবার কেমনতরো কি!'

মধু ডাক্তার এসেছে তাকে পর্যন্ত লুকোনো! আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি সব বলছে তাকে রাখাল। ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন ঘরের থেকে : 'কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙে গেছে।'

যন্ত্রণায় অধীর হয়ে একে-ওকে হাত দেখান ঠাকুর। রাখাল শুধু চটে। বলে, 'এ কি বাড়াবাড়ি! তা হলে এখান থেকে চলে যাই আমি।'

ওরে স্বভাবের যন্ত্রণায় কাঁদতে দে আমাকে। যন্ত্রণার মধ্যে কান্নাটাই আনন্দ। আমার কান্না দেখে লোকে যদি একটু কাঁদে সেটুকুও আমার উপশম।

এখান থেকে যাবি তো যা। পরেই আবার মাকে বলেন, 'কোথায় যাবে, কোথায় যাবে জ্বলতে পুড়তে!'

ভাবনয়নে দেখলেন মা যেন সরিয়ে নিচ্ছেন রাখালকে। অমনি ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন, 'মা, ওকে হৃদের মত সরাসনি। ও ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না, তাই কখনো-কখনো অভিমান করে—ও চলে গেলে কাকে নিয়ে থাকব!'

আরো একটি ছেলের জন্যে কাঁদেন বসে-বসে। সতেরো-আঠারো বছর বয়েস, গৌর-বর্ণ, নাম নারান। স্কুলে পড়ে। তাকে নিজের হাতে খাওয়াবার জন্যে ব্যাকুল ঠাকুর। তার মাঝেই দেখেন সেই নারায়ণকে।

'মশায়, আপনার গান হবে না?'

প্রশ্নের এই তো ছিরি। তবু যেহেতু নারান বলেছে, নারান গান শুনতে চেয়েছে, ঠাকুর গান ধরলেন। 'অহরহ নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না—এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না—'

বলরামের বাড়িতে নামছেন সিঁড়ি দিয়ে, ভাববিভোর হয়ে, টলতে-টলতে। পাছে পড়ে যান, নারান হাত ধরতে গেল। বিরক্ত হলেন ঠাকুর, নারানের হাত ছুঁড়ে দিলেন। পরে, পাছে ব্যথা পায়, অযতন হয়েছে ভাবে, তাই সস্নেহে বললেন, 'হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে। আমি আপনি-আপনি চলে যাব।'

বলরামের বাড়িতে সেদিন এসেছে নারান।
'বোস কাছে এসে বোস। কাল যাস ওখানে। গিয়ে সেখানে খাবি, কেমন?'
কে নারান? তার পুরো নাম বা পদবীও কেউ জানে না। তবু তার প্রতি কি সর্বঢালা স্নেহ!
কথামত এসেছে নারান। ছোট খাটটির উপর বসিয়েছেন পাশটিতে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। বললেন, জল খাবি? জল খাওয়াচ্ছেন নিজের হাতে।
এখানে আসে বলে বাড়ির লোকে মারে ছেলেটাকে। তাই কানের কাছে মুখ এনে স্নেহভরা স্বরে বললেন, 'একটা চামড়ার জামা কর, মারলে বেশি লাগবে না।'
কীর্তন শুনছেন ঠাকুর, নারান এসে উপস্থিত। তাকে দেখে চটে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুই আবার কেন এসেছিস এখানে? অত মেরেছে তোকে সেদিন তোর বাড়ির লোক, আবার এসেছিস?'
চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নারান।
কোথায় তবে যাব? প্রহারের পর কোথায় তবে উপশম! প্রখর রৌদ্রের পর কোথায় তবে পাদপচ্ছায়া। সংসার-রাক্ষস আমাকে হরণ করে রেখেছে, আরামময় রাম এসে আমাকে উদ্ধার করবেন বলে। প্রহারেই তো আমি দৃঢ় হব বলিষ্ঠ হব, আমার সমস্ত কলুষ ক্ষয় হয়ে যাবে। প্রহার তো তোমারই উপহার। তুমিই হানো তুমিই টানো তুমিই আনো তোমার কোলের কাছে। তুমি ছাড়া আর কে আছে! সকল আত্মীয়ের চেয়েও তুমি আমার আপনার।
ঠাকুরের ঘরের দিকে চলে গেল নারান। বাবুরামকে ঠাকুর বললেন, 'যা, ওকে কিছু খেতে দে।'
কীর্তনে সমাধিস্থ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু মন বসল না। হঠাৎ উঠে পড়লেন। ঘরে ঢুকে নিজের হাতে খাওয়াতে লাগলেন নারানকে।
'আজ নারানকে দেখলুম!' রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বলছেন ঠাকুর। ভাবাবেশে কণ্ঠ-স্বর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।
'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বললে মাস্টার, 'চোখ দুটি জলে ভেজা। মুখ দেখে কান্না পায়।'
'আহা, ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়!' কান্নায় ঠাকুরের গলাও ভিজে উঠল: 'এখানে আসে বলে ওকে বাড়িতে মারে। ওর হয়ে বলে এমন বুঝি কেউ নেই। কুব্জা তোমায় কু বোঝায়। রাই-পক্ষে বোঝায় এমন কেউ নেই।'
'আপনিই বোঝাবেন।'
'দেখ ওর খুব সত্তা। নইলে কীর্তন শুনতে-শুনতে উঠে যাই! ওর টানে কীর্তন ছেড়ে উঠে যেতে হল ঘরের মধ্যে। কীর্তন ফেলে উঠে গেছি এমনিটি আর হয়নি কখনো।'
কীর্তনের চেয়েও ক্রন্দন যে তোমাকে বেশি টানে। কীর্তন হচ্ছে গুণকথন, যশোবর্ণন আর ক্রন্দন হচ্ছে বেদন-নিবেদন। তুমি আমাকে কাঁদাচ্ছ এইই তো তোমার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাই ক্রন্দনই শ্রেষ্ঠ কীর্তন।

'কিন্তু ওকে যখন জিগগেস করলাম, কেমন আছিস? ও এক কথায় বললে, আনন্দে আছি।'
তাই তো আর ওর ভয় নেই। প্রহারের প্রত্যক্ষ ভয়কেও উপেক্ষা করতে পেরেছে। জর্জর হয়েও অবসন্ন হয়নি। ধুলোতে শয়ন নিয়েও ভাবছে ঈশ্বরের কোলে মা'র কোলে শুয়ে আছি। আনন্দে থাকা মানে ধুলোকেও ব্রজরেণু মনে করা। নারানের সেই অবস্থা। কিশোর বালক কিন্তু বিশ্বাসের নিষ্কম্প বর্তিকা। বরিষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। যন্ত্রণাকে নিয়ে এসেছে জয়ধ্বনিতে।
মাস্টারকে বললেন, 'তুমি কিছু কিনে-টিনে মাঝে-মাঝে খাইও ওকে। আচ্ছা, ওকে একবার ওর ইস্কুলে গিয়ে দেখতে পাই?'
'কেন, আমার বাসায় না-হয় ওকে ডেকে আনব। সেখানে চলুন।'
'না, না, একটা ভাব আছে। ওকে ওর স্বভাবে দেখতে চাই। তা ছাড়া, দেখে আসতুম আরো কেউ ছোকরা আছে নাকি—' বলেই আবার নারানে ফিরে এলেন। বললেন গদগদ হয়ে, 'আহা, নাউএর ডোলটা ভালো—তানপুরো বেশ বাজবে। আমায় বলে, আপনি সবই।'
এইটিই তো চরম ভালোবাসার কথা। তুমি আমার সব। তারই জন্যে তো তোমাকে ছেড়ে পালাবার পথ পাই না। দূরে-দূরান্তরে এমন জায়গা নেই যেখানে তুমি নেই। এমন শূন্যতা ভাবা যায় না যা তুমি-ছাড়া। সব হারিয়েও দেখি তোমাকে হারাতে পারিনি।
'ওরে বাবুরাম, একবার নারানের বাড়িতে যা না—' নারানের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন ঠাকুর।
কিন্তু বাড়িতে যেতে ভয় পাছে ওর বাবা খেপে ওঠেন, তেড়ে আসেন লাঠি নিয়ে।
'এক কাজ কর। হাতে করে একখানা ইংরাজি বই নিয়ে যা। তা হলে তার বাবা আর কিছু বলবে না।'
কিন্তু তার মা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কার টানে ছেলে এমন ঘরছাড়া, মার-ঘেঁচড়া, তাকে একবার দেখে আসি নিজের চোখে। পারি তো শুনিয়ে আসি দুটো কঠিন কথা। নিজের পাগলামি নিয়ে আছ থাকো, পরের ছেলেকে পাগল করা কেন? কিন্তু এসেই তার চোখ ডুবে গেল অমৃত-অঞ্জনে। এ কে অপরূপ! একে দেখে আমিই মুগ্ধ হচ্ছি, আমার নারান তো ছেলেমানুষ! যে সরল সে তো ডুববেই যাবে এ সরলতার সমুদ্রে!
'মা, আমার নারানকে বেশি পীড়ন কোরো না।' বললেন তাকে ঠাকুর, 'ভগবানের দিকে যদি ওর মন যায়, ওর মনটিকে দুমড়ে দিও না।'
ঈশ্বর পুত্রের চেয়েও প্রিয়। সেই মুহূর্তে মনে হল নারানের মা'র। ঈশ্বরকেই সব চেয়ে আমরা বেশি ঠকাই। সংসারে সব চেয়ে যেটা অল্পমূল্য, যা খোয়া গেলে বঞ্চিত মনে হয় না নিজেকে, সেইটিই ঈশ্বরকে নিবেদন করি। কাকে-ঠোকরানো ফলটাই সাজাই এনে পুজার থালায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে নারানের মা'র মনে হল এমন প্রিয়তম যে পুত্র তাও সম্ভব দিয়ে দেওয়া যায় ঈশ্বরকে।
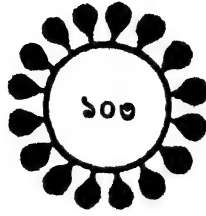
‘ওরে কী শুনছি, থিয়েটারে সত্যি গৌর এল নাকি রে?’ পদরত্নকে জিগগেস করলে তার বাপ। ‘যা তো কলকাতায় গিয়ে একবার দেখে আয়।’

বাপ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

পদরত্ন গেল কলকাতা। যা দেখল তা আর যায় না দৃষ্টি থেকে। রঙ্গমঞ্চের পর্দা পড়ল কিন্তু চোখের আর পলক পড়ল না। গিরিশকে আশীর্বাদ করল প্রাণ ভরে, ‘গৌর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।’

ঠাকুর বললেন, ‘আমি থিয়েটার দেখতে যাব।’

সকলে তো অবাক। যেখানে পণ্যস্ত্রীরা অভিনয় করে সেখানে ঠাকুর যাবেন দেখতে? রাম দত্ত বললে, ‘অসম্ভব।’

‘হ্যাঁ, যাবো। দেখব চৈতন্যলীলা।’

কে ঠেকায়! গৌর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। থিয়েটারের দরজার সম্মুখে দাঁড়াল পালকি গাড়ি। গৌর নিজে এসেছেন থিয়েটারে।

কেন কে জানে গিরিশ নিজে গেল গাড়ির দিকে। তার আগেই নেমে পড়েছেন ঠাকুর। গিরিশকে দেখতে পেয়েই নত হয়ে নমস্কার করলেন। নমস্কার ফিরিয়ে দিল গিরিশ। তখুনি আবার ঠাকুরের নমস্কার। নমস্কারে পারবে ঠাকুরের সঙ্গে? কোনো কিছুতে পারবে?

ছেড়ে দিল, হেরে গেল গিরিশ। শেষ নমস্কার ঠাকুরের। যার শেষ নমস্কার তারই শেষ জয়।

শুধু গায়ের জোরে নমস্কার নয়। এ একটি বিনয়নমিতা দীনতার নির্ঝরিণী। ধারাবাহিকী দ্রবীভূতা প্রীতিসুধা।

উপরে একটি বক্সে জায়গা হল ঠাকুরের। এক পাখাওয়ালা এসে হাওয়া করতে লাগল।

নিমাই বলছে শচীমাকে :

> ‘কৃষ্ণ বলে কাঁদো মা জননি,
> কেঁদো না নিমাই বলে—
> কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকলি পাবে
> কাঁদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে।’

সমাধিতে ডুবে গেলেন ঠাকুর। আবার এলেন জীবভূমিতে। আবার খানিকক্ষণ শোনেন। আবার সমাধিস্থ হন।
আচ্ছা, গিরিশকে আগে কোথায় দেখেছি বলো তো? এখনকার দেখা নয়, যেন বহু আগের দেখা, আগের আলাপ। ঐ সেই দক্ষিণেশ্বরে, প্রথম দিককার সাধনার পরিচ্ছেদে। কালীঘরে বসে আছি, দেখলুম একটি উলঙ্গ বালক নাচতে-নাচতে কাছে এল। কোমরে রুপোর পেটি, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা। এক হাতে মদের ভাঁড়, অন্য হাতে সুধাপাত্র। কে তুই? হাঁক দিলুম। বললে, আমি ভৈরব। তা এখানে কেন? বললে, আপনারই কাজ করব বলে এসেছি। সেই ভৈরবই যে গিরিশ।
ব্রাহ্মসমাজের নাটকে সাধু সেজেছিল নরেন। ঠাকুর দেখতে গিয়েছেন। সাধুবেশে যেই দেখলেন নরেনকে, দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলতে লাগলেন আপন মনে, 'এই ঠিক হয়েছে। ঠিক মিলেছে।' তারপর ডাকতে লাগলেন হাতছানি দিয়ে। এ কি অসম্ভব কথা! সেজে আছে রঙ্গমঞ্চে, সে এখন নেমে আসবে কি! তখন কেশব বললে, 'উনি যখন বলছেন, এসো না নেমে!' উনি যেন সব নিয়মের ব্যতিক্রম! কিন্তু, যাই বলো, নেমে আসতেই হল নরেনকে। ঠাকুর তার হাত ধরলেন, আনন্দ-উজ্জ্বল চোখে বললেন, তোকে এই বেশে একদিন দেখিয়েছিল মা। ঠিক এই বেশে। সত্যি, মিলে যাচ্ছে ঠিক-ঠিক—
অভিনয়ের শেষে চৈতন্য এসে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে। যে এ পার্টে নামে, রোজ গঙ্গাস্নান করে হবিষ্যি করে নামে।
সে মেয়ে, অভিনেত্রী। নাম বিনোদিনী।
বিনোদিনী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল ঠাকুরকে। কল্পতরু ঠাকুর তাকে আশীর্বাদ করলেন, 'মা, তোর চৈতন্য হোক।'
তোমার চিত্তদর্পণের মার্জন হোক, ভবদাবাগ্নির নির্বাণ হোক, মঙ্গলজ্যোৎস্নায় ভরে যাক মনোমন্দির। হৃদয়ে সত্য ও শ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠিত করো। হৃদয়ই সর্বভূতের আয়তন। হৃদয়ই সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ই সম্রাট। হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। চৈতন্যমন্ত্রে তাকে জাগাও। মলয়স্পর্শে সুগন্ধানন্দ চন্দন হয়ে যাও।
রোগ বড় শক্ত, কিন্তু ভয় নেই, রোজাও বড় পোক্ত। রোজার নামেই রোগ পালায়।
হলাম গণিকা, তবু তোমার গণনাতে গণ্য হলাম। হে অখিলরসামৃতমূর্তি, আমি তাতেই ধন্য। আর কিছুই চাই না। গণ্য হয়েই ধন্য হলাম।
একটি স্ত্রীলোক এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। ব্রীড়ার সঙ্গে বিষণ্ণতা মিশে মুখখানি ভারি করুণ। কি চাই? স্বামী মাতাল উচ্ছৃঙ্খল, সংসারে পয়সাকড়ি কিছু দেয় না, সব মদ খেয়ে নষ্ট করে। ঠাকুর যদি কিছু একটা ব্যবস্থা দেন। স্বামীর মন যাতে ভালো হয়।
ঠাকুর পরিচয় নিয়ে জানলেন শ্যামপুকুরের কালীপদ ঘোষের স্ত্রী। কালীপদ মানে দানাকালী, গিরিশের বন্ধু। এক গ্লাশের ইয়ার। জন ডিকিন্সনে বড় কাজ করে কিন্তু মাইনে যা পায় তা প্রায় অকাজেই শেষ হয়।
ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন নহবতখানায়। সতীর দুঃখে সারদা বিচলিত হল। একটি

পুজো-করা বেলপাতায় ঠাকুরের নাম লিখলে। বউটিকে দিয়ে বললে, রেখে দিও নিজের কাছে, আর খুব নাম কোরো।
সতী স্ত্রী বারো বছর নাম করেছে।
তারপর এক দিন দানাকালী হাজির দক্ষিণেশ্বরে। তাকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'বউটাকে বারো বচ্ছর ভুগিয়ে তবে এখানে এল!'
কথা শুনে চমকে উঠল দানাকালী। তুমি কি করে জানলে? কিন্তু নিমেষে আবার আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে তো ভক্তিতে আসেনি, সে এসেছে কৌতূহলে। পাঁচজনে বলাবলি করছে, দেখে আসি কেমনতরো! সেই অলস উসখুসুনি।
'কি চাই তোমার? বলো না গো মুখ ফুটে।' ঠাকুর প্রশ্ন করলেন আত্মজনের মত।
দানাকালী এমন ছ্যাঁচড়, বললে, 'একটু মদ দিতে পারেন?'
'তা পারি বৈ কি। তবে এখানকার মদে এমন নেশা, তুমি সইতে পারবে না।'
দানাকালী হাসল। সে আবার সইতে পারবে না! বললে, 'কি, বিলিতি মদ?'
'না গো, একদম খাঁটি দিশি কারণ-বারি।' ঠাকুর বললেন প্রসন্ন মুখে, 'এখানকার মদ পেলে আর বিলিতি মদ ভালো লাগে না। তুমি ঐ মদ ছেড়ে এখানকার মদ ধরতে রাজী আছ?'
দানাকালী স্তব্ধ হয়ে রইল এক মুহূর্ত। পরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'সেই মদ আমায় দিন যা পেলে আমি সারা জীবন নেশায় বুঁদ হয়ে থাকব।'
এমন কিছু দিন যা পেলে আর আমার কিছু পাবার থাকবে না। এমন প্রাপ্তি দিন যার পরে আর কোনো প্রত্যাশা নেই। এমন আনন্দ দিন যা সুখে-দুঃখে অবিচ্ছিন্ন।
ঠাকুর দানাকালীকে ছুঁয়ে দিলেন। ছোঁয়ামাত্র কাঁদতে লাগল দানাকালী। কত লোকে কত বোঝায়, তবু সে কাঁদে। বাড়ি ফিরে এল বটে, মন পড়ে রইল দক্ষিণেশ্বরে। ক'দিন পরে আবার গিয়ে হাজির। ঠাকুর বললেন, 'তুমি এসেছ? আমার একবার কলকাতা যাবার ইচ্ছে।'
'যাবেন?' দানাকালী উল্লসিত হয়ে উঠল: 'চলুন আমার সঙ্গে। ঘাটে বাঁধা আছে নৌকো।'
সঙ্গে লাটু, ঠাকুর উঠলেন এসে নৌকোয়। মাঝনদীতে এসে বললেন, 'জিব বের করো তো দেখি।'
দানাকালী জিভ বের করল। আঙুলের ডগা দিয়ে কি তাতে লিখে দিলেন ঠাকুর।
মৌতাত ধরল বুঝি এতক্ষণে। মনে হল, এমন বোধ হয় কিছু আছে যা পেলে নিজেকে নিঃস্ব জেনেও আনন্দ হয়। চন্দ্রসূর্যহীন অন্ধকার গুহাও আলো হয়ে ওঠে। যার ঘর নেই, পথই তার ঘর হয়ে দাঁড়ায়। যার সবাই পর, পরের মধ্যেই সে আপন জনের মুখ দেখে।
ঘাটে নৌকো লাগল। দানাকালী জিগগেস করল, 'কোথায় যাবেন?'
'কোথায় আবার! তোমার সঙ্গে এসেছি, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।'
আনন্দে বিভোর হল দানাকালী। গাড়ি করে ঠাকুরকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। শবরীর কুটিরে শ্রীরামচন্দ্র।

'স্ত্রী যদি সতী-সাধ্বী হয়,' বললে লাটু, 'তা হলে সে স্বামীর জন্যে কঠোর করতে পেছপা হয় না। স্ত্রীর জন্যে উদ্ধার হয়ে গেল কালীপদ।'

স্ত্রীর সাধনায় কালীপদ ধ্রুবপদ পেয়ে গেল। বুঝতেও পারেনি স্ত্রীর রূপ ধরে কৃপা এসেছিল তার সংসারে। আর যা দীনতা আর প্রতীক্ষা, যা নিষ্ঠা আর আঘাতসহতা তাই স্ত্রী। সংসারে দীনা দাসীর বেশে রাজেশ্বরী বিরাজ করছে বুঝতেও পারেনি। বুঝতেও পারেনি পরিধানে যে চীরবাস আছে আসলে তা তপস্বিনীর রাজবেশ। বাইরে যা প্রতিবাদ অন্তরে তাই প্রার্থনা।

চিনতে পারল এতদিনে। বারো বছর ধরে যে নিশ্বাসবায়ু রুদ্ধ করে সঞ্চিত করে রেখেছিল তাই এখন কৃপার শীতলবায়ু হয়ে প্রবাহিত হল। এবার নোঙর তোলো, নৌকো ছাড়ো। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে সঞ্চিত ধন বেঁধে রেখেছিলে, সঞ্চিত ধন জলে ফেলে দিয়ে সেই বস্ত্রখণ্ডকে এখন পাল করো। এত দিন তোমার স্ত্রী একা দাঁড় টেনেছেন, এবার হালে এসে বসেছেন স্বয়ং ভবার্ণবের কাণ্ডারী। আর ভয় নেই!

ঠাকুরের অসুখ কাশীপুরের বাড়িতে, নিরঞ্জন দরজা আগলে রয়েছে, অবান্তর লোক কাউকে ঢুকতে দেবে না। যে-সে ঢুকবে আর ঠাকুরকে প্রণাম করবে, প্রণাম করে ঠাকুরের অসুখ বাড়িয়ে দেবে এ অসম্ভব। খুব কড়া মেজাজের ছেলে নিরঞ্জন। দেখতেও বেশ বলশালী। গয়নার নৌকোয় ফিরছে দক্ষিণেশ্বর, আরোহীরা খুব নিন্দা করছে ঠাকুরের। নিরঞ্জন প্রথম প্রতিবাদ করল, যুক্তিতর্কের রাস্তায় গেল, কিন্তু কেউই নিরস্ত হল না। তখন বললে, গুরুনিন্দা সইতে পারব না, নৌকো ডুবিয়ে দেব। শুধু মুখের কথা নয়, সাঁতারে ওস্তাদ নিরঞ্জন, জলে লাফিয়ে পড়ল, নৌকো ফেলতে গেল উলটিয়ে। তখন সকলে দেখলে মহৎভয় সমুদ্যত। করজোড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল সকলে। করতে লাগল অনেক কাকুতি-মিনতি। তখন ছেড়ে দিলে। জল ছেড়ে ফের উঠল গিয়ে নৌকোয়।

কথাটা কানে উঠল ঠাকুরের। নিরঞ্জনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'কে কি বলে না বলে তোর কী মাথাব্যথা পড়েছিল? ক্রোধ চণ্ডাল, তার কি বশীভূত হতে আছে? সৎ লোকের রাগ জলের দাগের মত, হতে না হতেই মিলিয়ে যায়। তা ছাড়া হীন-বুদ্ধি লোক কত কি অন্যায় কথা বলে, তা কি গায়ে মাখতে আছে? তা ছাড়া—'

নিরঞ্জন মাথা হেঁট করে রইল।

'তা ছাড়া নৌকো যে ডোবাতে গিয়েছিলি, মাঝিমাল্লারা কি দোষ করেছিল? নিরীহ গরিবের উপর অত্যাচার হয়ে যেত, খেয়াল আছে?'

আত্মগঞ্জনায় বিদ্ধ হল নিরঞ্জন।

তার পর নিরঞ্জন আবার মাতৃভক্ত। ঠাকুরের পথে এসেছে অথচ চাকরি করছে এ কিছুতেই চলতে পারে না। কিন্তু চাকরি না করলে মা'র ভরণপোষণ হবে কি করে? আমার মুখের দিকে মা চেয়ে আছেন, আমি ছাড়া তাঁর কেউ নেই। কিন্তু ঠাকুর যদি জানতে পান?

'তোর মুখে যেন একটা কালো ছায়া পড়েছে।' ধরতে পেরেছেন ঠাকুর, 'আপিসের কাজ করিস কিনা।'

মুখের উপর যেন আরো এক পোঁচ কালি পড়ল।

'তার জন্যে মুখ ম্লান করছিস কেন? তুই তো তোর মা'র জন্যে কাজ করছিস, ওতে কোনো দোষ নেই। ওরে মা যে ব্রহ্মময়ীস্বরূপা।'

বীর নিরঞ্জন, ভক্তিতে আর নির্মলতায় বিশ্বজিৎ নিরঞ্জন, সে ঠাকুরের দ্বাররক্ষী হবে না তো কে হবে! অপ্রিয় কর্তব্য সমাধা করবার মত নির্বিকার সামর্থ্য শুধু তারই আছে।

দানাকালী তার এক সাহেব-বন্ধু নিয়ে হাজির। বললে, ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত, অসুখ শুনে দেখতে এসেছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল নিরঞ্জন, তাকাল একবার সাহেবের হ্যাট-কোটের দিকে। খাস ইংরেজ নয় হয়তো, কিন্তু ফিরিঙ্গি বলতে আপত্তি হবে না।

সাহেব আর দানাকালী উঠে এল উপরে। ঠাকুরের ঘরে, একেবারে বিছানার কাছটিতে। মাথার থেকে হ্যাট খুলে নিয়ে সাহেব বললে, 'আমি বিনোদিনী! চৈতন্যলীলার বিনোদিনী।'

বলতে-বলতে সে কেঁদে ফেললে। ঠাকুরের রোগক্লিষ্ট মুখ দেখে তার কান্না আরো উথলে উঠল। মেঝেতে বসে পড়ে ঠাকুরের পায়ের উপরে মাথা রাখলে।

কিন্তু ঠাকুরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললেন, 'খুব ফাঁকি দিয়ে এসে পড়েছ তো! মেয়েছেলেকে একেবারে সাহেব সাজিয়ে! হ্যাটকোট পরিয়ে! খুব বাহাদুর তুমি কালীপদ!'

'নইলে ওকে যে আসতে দিত না আপনার ভক্তেরা।' বললে দানাকালী : 'কতদিন থেকে কাঁদছে, বলছে ঠাকুরের এমন অসুখ আমি একবার দেখতে পাই না? আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে একবার নিয়ে চলুন। ঠাকুরকে না দেখে আমি থাকতে পারছি না। তাই দয়া হল। নিয়ে এলুম আপনার কাছে।'

এতটুকু ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হলেন না ঠাকুর। বরং পরিহাসটুকু পরমরসিকের মত উপভোগ করলেন। তাঁর বীর ভক্তদল প্রতারিত হয়েছে বলে এতটুকু তাঁর জ্বালা নেই, বরং ভক্তি ও ব্যাকুলতাকে কেউ যে রুখতে পারে না তাতেই ভীষণ প্রসন্ন হয়েছেন। বললেন, 'তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি!'

'নইলে এমনি এলে ঢুকতেই দিত না যে। সাধারণ লোককেই দেয় না, আর এ তো অভিনেত্রী। বলে কিনা পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে ঠাকুরের অসুখ বাড়বে।' দানাকালী জোরের সঙ্গে বললে, 'এ আমি বিশ্বাস করি না। যে পাপের জন্যে এখন অনুতাপ করছে তার স্পর্শে তো এখন শান্তি।'

নিচে খবর পৌঁছে গিয়েছে ভক্তদের মধ্যে, দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ঠাকুরের কাছে। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে দ্বারীকে কলা দেখিয়েছে। রাগে ফুলতে লাগল ভক্তদল। দানাকালী যতই ঠাকুরের আশ্রিত হোক, গিরিশের অনুগামী হোক, একবার দেখে নেবে তাকে।

কিন্তু কিসের প্রতিশোধ, কার উপর! ঠাকুর যে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ হাসি-পরিহাস করছেন! যা ঠাকুরকে এত আনন্দিত করছে তা তাঁর ভক্তদের ক্রুদ্ধ করে

কি করে? অগত্যা দানাকালী আর বিনোদিনীকে ছেড়ে দিতে হল দরজা।
কিন্তু এবার রাম দত্তকে ঠেকিয়েছে নিরঞ্জন। কিছু মিষ্টি আর মালা উপর থেকে প্রসাদ করে এনে দিতে বলেছিল লাটুকে। হামাকে কেন, আপুনি নিজে যান না। বললে লাটু। তখন নিরঞ্জন বাধা দিলে। লাটু বললে, 'এ'কে যেতে দাও না! আপনা-আপনির মধ্যে এ সব নিয়ম কি জারি করতে আছে?'
নিরঞ্জন তবু অনড়। অনমনীয়।
তখন লাটু ফোঁস করে উঠল : 'সেবার যখন দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল তখন তো তাকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলে, আর আজ এ'র মত লোককে ছাড়তে চাইছ না? এর মানে কি?'
অগত্যা ছেড়ে দিল রাম দত্তকে।
লাটুকে ডাকলেন ঠাকুর। কেউ তাঁর কাছে নালিশ করেনি তবু শুনতে পেয়েছেন অন্তর্যামী। বললেন লাটুকে, 'দ্যাখ কারুর কখনো দোষ দেখবিনি, ভুল দেখবিনি, কেবল গুণ দেখবি, ভালো দেখবি। বুঝলি?'
লাটু চুপ করে রইল। মনকে শাসন করলে ব্যথার চাবুক মেরে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে নিরঞ্জনকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'ভাই আমার মত মুখখুর কথায় দুঃখু করিসনি।'
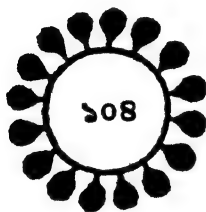
''আরেকদিন দেখাবে?' বালকের মতন জিগগেস করলেন ঠাকুর। নয়নে সানন্দ-কৌতূহল।
'বেশ তো যাবেন যে দিন খুশি। দেখে আসবেন।'
'কিন্তু কিছু নিতে হবে।'
কি নেব? টিকিটের দাম? ঠাকুর পয়সা পাবেন কোত্থেকে? কৃপা করে যে আসছেন সেই কি অনেক নিচ্ছি না?
না, ঠাকুর পীড়াপীড়ি করছেন, নিতে হবে কিছু। কিছু না দিয়ে তিনিই বা দেখবেন কেন?
গ্যালারির সিট আট আনা। গিরিশ হেসে বললে, 'বেশ, আপনি আট আনা দেবেন।'
'বা, আমি গ্যালারিতে বসতে পারব না। সে বড় র‍্যাজলা—'

'না, না, আপনি গ্যালারিতে বসবেন কেন। সে দিন যেখানে বসেছিলেন সেই বক্সেই বসবেন।'
'কিন্তু মোটে আট আনা?' গূঢ় রহস্যভরা হাসি হাসলেন ঠাকুর।
'তা—' গিরিশ তাকিয়ে রইল মুখের দিকে।
'আট আনা নয়, ষোলো আনা দেব।'
ষোলো আনা দেব। ফাঁক রাখব না, ছিদ্র রাখব না, নিরবকাশ করে দেব। ভরে দেব সম্পূর্ণ করে। ষোলো কলা একত্র করে দেব তোমাকে পূর্ণচন্দ্র। করুণার পূর্ণচন্দ্র। প্রসাদের পূর্ণঘট।
কিন্তু তুমিই শুধু দেবে, আর আমি নেব হাত পেতে? আমার এ দারিদ্র্য এ কার্পণ্য আর সহ্য হয় না। শুষ্ক পিপাসা দিয়ে গড়েছি যে শূন্য পেয়ালা তা এবার ভেঙে ফেলব। আমি নিজেকে বুঝেছি এবার মহীয়ান রূপে, ঐশ্বর্যবান দাতারূপে। এবার আমি দেব, তুমি নেবে। তুমি আমার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে প্রার্থী হয়ে আর আমি তোমাকে ভিক্ষে দেব।
বলো তো, কী দেব? নয়নের অশ্রু, হৃদয়ের চন্দন, কণ্ঠের ফুলমালা।
না, আংশিক নয়, তোমাকেও আমি দেব ষোলো আনা। আমার আমি-কে দিয়ে দেব তোমার হাতে। ঢেলে দেব, বিকিয়ে দেব, বিলিয়ে দেব। কিছু রাখব না আপনার বলে। তখন আমিই তোমার আপনার।
তোমার দান, আমার সমর্পণ। তোমার দয়া, আমার উৎসর্গ।
জানি না দাতা হিসাবে কে বড়? তুমি না আমি?
প্রথমবার যখন যান থিয়েটারে, লোকজন আলো দেখে ঠাকুর বালকের মতন খুশি। বক্সে বসে বলছেন মাস্টারমশাইকে, 'বাঃ, এখানে এসে বেশ হলো। অনেক লোক এক সঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন।'
জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি এসেছে। অতিথি চোখ বুজে ভগবানকে অন্ন নিবেদন করছে, নিমাই ছুটে এসে তাই খেয়ে নিচ্ছে পলকে। গঙ্গাস্নানের পর ঘাটে বসে পুজো করছে ব্রাহ্মণেরা, নিমাই এসে কেড়ে খাচ্ছে নৈবেদ্য। বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্যি কেড়ে নিচ্ছিস, সর্বনাশ হবে তোর—এক ব্রাহ্মণ তেড়ে গেল নিমাইকে। পালিয়ে গেল নিমাই। মেয়েরা ভালোবাসে ছেলেটাকে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ডাকতে লাগল, নিমাই, ফিরে আয়, নিমাই ফিরে আয়। নিমাই ফিরল না।
আমি জানি কি করে ফেরাতে হয় নিমাইকে। আমি জানি সেই মহামন্ত্র। বললে একজন উটকো লোক। বলেই সে বলতে লাগল, হরিবোল, হরিবোল। হরিবোল বলতে-বলতে ফিরে এল নিমাই। ফিরে এল নাচতে-নাচতে।
ঠাকুর আর স্থির থাকতে পারলেন না। মুখে বললেন, আহা, আর নয়নে ঝরতে লাগল প্রেমাশ্রু।
বাবুরামও সঙ্গে ছিল। তাকে আর মাস্টারমশাইকে বললেন, 'দেখ আমার যদি ভাব কি সমাধি হয়, গোলমাল কোরো না। ঐহিকেরা ঢং বলবে।'

বহুবার, নাটকের বহু জায়গায় ঠাকুরের সমাধি হল, কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাসের সংবাদ পেয়ে শচী যখন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল ঘর-ভরা দর্শকের দল হায়-হায় করে উঠলেও ঠাকুর বিচলিত হলেন না। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেই ঝড়ে-ছেঁড়া বৃক্ষশাখার দিকে।

অভিনয়ের পর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, একজন এসে জিগগেস করলে, কেমন দেখলেন?

প্রসন্ন-স্বরে ঠাকুর বললেন, 'আসল-নকল এক দেখলাম।'

মহেন্দ্র মুখুজ্জের বাড়ি হয়ে গাড়ি চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর গান ধরেছেন :

'গৌর-নিতাই তোমরা দু ভাই,
পরমদয়াল হে প্রভু—
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই,
কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই,
ব্রজে ছিলে কানাই-বলাই, নদে হলে গৌর-নিতাই।
ব্রজের খেলা ছিল, দৌড়োদৌড়ি,
এখন নদের খেলা ধুলোয় গড়াগড়ি।
ছিল ব্রজের খেলা উচ্চ রোল,
আজ নদের খেলা কেবল হরিবোল॥
ওহে পরম করুণ, ও কাঙালের ঠাকুর—

মাস্টারমশাইও গাইছেন সঙ্গে-সঙ্গে।

মহেন্দ্র মুখুজ্জে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছেন গাড়িতে। বললেন, একবারটি তীর্থে যাব।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু প্রেমের অঙ্কুরটি হতে না হতেই তাকে শুকিয়ে মারবে? কিন্তু যাও যদি, শিগগির এস, দেরি কোরো না।'

তীর্থ কোথায়? তীর্থ তোমার এই অন্তরের নির্জনতায়। সেইখানেই গহন গিরি-গুহা, শিহরময় শৈলশিখর, সেইখানেই সঙ্গবিহীন সমুদ্র-তীর! তোমার বাইরের তীর্থ জীর্ণ হয়, পুরোনো হয়, কিন্তু এই অন্তরের দেবালয় রোজ তুমি নিজের হাতে নিত্যনবীন ভাবরসে নির্মিত করো। ধৌত করো অশ্রুজলে। জ্বালো একটি অনাকাঙ্ক্ষার ঘৃতপ্রদীপ। বাইরের তীর্থে কত বিক্ষোভ কত মালিন্য কিন্তু অন্তর-তীর্থে অনাহত প্রশান্তি। এই অন্তরতীর্থে আশ্রয় নাও। অন্তরতমকে দেখ। তার সামনে দাঁড়াও করজোড়ে।

গিরিশ ঠাকুরকে একটি ফুল দিল।

নিয়ে তখুনি আবার ফিরিয়ে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমায় ফুল দিচ্ছ কেন? ফুল দিয়ে আমি কী করব? ফুলে আমার অধিকার নেই।'

'ফুলে আবার কার অধিকার?'

'দুজনের। এক দেবতার, আর ফুল-বাবুর।'
সকলে হাসতে লাগল।
থিয়েটারে কনসার্টের সময় আরেক কামরায় বসালো ঠাকুরকে। কথায়-কথায় ঠাকুরের ভাবসমাধি হল। মনের আড় যায়নি এখনো গিরিশের। ঠিক ঢং না ভাবলেও ভাবল বোধ হয় বাড়াবাড়ি। যে মুহূর্তে সংশয় ছায়া ফেলল, ঠাকুর চোখ চাইলেন। কুয়াশা কাটিয়ে দেবার জন্যে উদয় হল দিবাকরের।
'মনে তোমার বাঁক আছে।' বললেন ঠাকুর।
শুধু একটা? অসংখ্য। কত কুটিল আবর্ত। অন্ধ ঘূর্ণিবাত। কত অসরল পন্থা, অস্বচ্ছ লক্ষ্য। বক্রতা আর শীর্ণতা। মালিন্য আর আবিল্য। শুধু বিবৃদ্ধ বাসনা।
'এ বাঁক যায় কিসে?' গিরিশের কণ্ঠে লাগল বুঝি কান্নার রঙ।
'শুধু বিশ্বাসে।'
বিশ্বাসে কী না হতে পারে? যার ঠিক, তার সবতাতে বিশ্বাস। সাকার, নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী। বিশ্বাস একবার হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের বড় আর জিনিস নেই।
বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে একজনের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিলে। বললে, সমুদ্রের ওপারে যাবে তো, ভয় নেই, দিব্যি জলের উপর দিয়ে চলে যাও। বিশ্বাস করে চলে যাও। কিন্তু অবিশ্বাস করেছ কি, পড়েছ জলের তলে। বিশ্বাস করে সোজা চলে যাচ্ছে সে লোক, ঢেউয়ের উপর দিয়ে, চোখ সামনে রেখে, ঘাড় খাড়া করে। যাচ্ছে-যাচ্ছে, হঠাৎ মনে হল, কাপড়ের খুঁটে কী বাঁধা আছে একবার দেখি। খুলে দেখে, আর কিছু নয়, শুধু একটি রাম নাম লেখা। এই? শুধু একটি রাম নাম? যেই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল, ঢেউ এসে গ্রাস করলে!
সেই কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস। একবার ঈশ্বরের নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি! অনাময় নির্মল হয়ে গিয়েছি আমি।
আর আমাকে কে টলায়! বিশ্বাস করে বসেছি। আকাশ নিজে জানে না তার ব্যাপ্তি কতদূর। তেমনি আমি নিজে জানি না আমার এ অনুভূতির সীমা কোথায়! কিসের ব্যাপ্তি, কিসের অনুভূতি? আর কিছু নয়, আর কিছু নেই, শুধু তুমি আছ। তোমার প্রকাশেই আর সকলে অনুভাত। তুমিই রথেশ্বর আত্মা। সর্বলোকচক্ষু সূর্য। বিশ্বাস করে ফেলেছি। আর আমাকে কে ফেলে! এবার জলে পড়লেও জলে ডুবব না। আগুনে পুড়লেও পুড়বে না কপাল। ভবমরুপরিখিন্ন হয়ে পথ চলছিলাম, এবার নেমে পড়েছি এক মনোহর সরোবরে। যত ক্লান্তি আর ক্লেদ, যত সন্তাপ আর অতৃপ্তি সব শান্ত হল অবগাহনে। আর কে আমাকে তোলে সেই সরোবর থেকে? সেই আমার তাপতৃষাহর হরিসরোবর।
দেখ, দেখ, তাঁর অঙ্গকান্তি সেই সরোবরের জল, তাঁর করতল ও পদতল পদ্ম হয়ে ফুটে আছে, তাঁর চক্ষু হচ্ছে মীন আর তাঁর বাহুর আন্দোলন হচ্ছে তরঙ্গলীলা। শুধু শান্তি আর শান্তি। অগাধ ভবজলধি ভেবেছিলাম, এখন দেখি সরল-স্বচ্ছ শীতল সরোবর।

তোমাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি। তুমি কত সহজ! আকাশের মত সহজ, প্রাণের মত সহজ, তৃণের মত সহজ। আমার নিশ্বাসের মত সহজ।
তুমি যে আমার নিশ্বাস, এইটিই বিশ্বাস করেছি আজ।
'ও দেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি এল।' বলছেন ঠাকুর, 'মাঠের মাঝখানে আবার ডাকাতের ভয়। তখন সবাই বললাম, রাম কৃষ্ণ ভগবতী। আবার বললাম, হনুমান। আচ্ছা, সব যে বললাম, এর মানে কি? কি জানো, ঐ যখন চাকর বা ঝি বাজারের পয়সা নেয় প্রথমটা আলাদা-আলাদা করে নেয়, এটা আলুর পয়সা; এটা বেগুনের, এ কটা মাছের। সব থাক-থাক হিসেব করে নিয়ে তারপর দে মিশিয়ে।'
একই অনেক হয়ে মিশেছে। অনেক আবার মিশেছে সেই একে। চাই সেই বিশ্বাস। বালকের বিশ্বাস। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। মা বলেছে ওখানে ভূত আছে, তা ঠিক জেনে আছে যে ভূত আছে। মা বলেছে, ওখানে জুজু, তা ঠিক জেনে আছে ওখানে জুজু ছাড়া কেউ নেই। মা বলেছে ও তোর দাদা হয়, তা জেনে আছে, পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা।
চোখওয়ালা বিশ্বাস নয়, চোখ বন্ধকরা অন্ধ বিশ্বাস। বিচারের পরেও আবার বিচার চলে, কথার পরে আরো কথা। কিন্তু বিশ্বাসের পরে আর কিছু নেই। স্তব্ধতার পরে আবার স্তব্ধতা কি!
ভক্তদের জন্যে মা'র কাছে কাঁদছেন ঠাকুর। মা, যারা যারা তোর কাছে আসছে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিস মা। সব ত্যাগ করাসনি! কী নিয়ে থাকবে, খুব কষ্ট হবে যে! সংসারে যদি রাখিস, এক-একবার দেখা দিস! এক-একবার দেখা না দিলে উৎসাহ পাবে কি করে? শেষে যা হয় করিস, একেবারে বিমুখ করিসনে।'
রাম দত্তের বাড়িতে আরেকবার দেখা পেয়েছে ঠাকুরের। জিগগেস করছে আকুল হয়ে, 'বলুন, আমার মনের বাঁক যাবে তো?'
থিয়েটারে এসে সেদিন একটা চিরকুট পেল গিরিশ। কে দিয়েছে? কেউ বলতে পারলে না। লেখা কি? লেখা, আজ রাম দত্তের বাড়ি পরমহংসদেব আসবেন। তাতে গিরিশের কি? জোয়ারের জলে কাছিতে হঠাৎ টান পড়ল, গিরিশ বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।
অনাথবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে থামল গিরিশ। ওই কি নেমন্তন্নের চিঠি? অচেনা লোকের বাড়ি ওই চিরকুটের নেমন্তন্নে যাব? রামবাবুর সঙ্গে আলাপ নেই, তাঁর নেমন্তন্ন কি এমনি উপেক্ষার চেহারা নেবে? দরকার নেই আমার রবাহূতের দল বাড়িয়ে।
কিন্তু ফেরে এমন সাধ্য নেই। তবে ও কার নেমন্তন্ন? চিরকুটটা কি উপেক্ষা? না, কি অন্তিকতম আন্তরিকতার ডাক?
রামবাবু খোল বাজাচ্ছে আর ঠাকুর নাচছেন। ছন্দের দৃঢ়তার উপর দাঁড়িয়ে ভাব-কোমল নৃত্য। সঙ্গে গান হচ্ছে: 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।'
কাকে বলে প্রেম আর কাকে বলে প্রেমের হিল্লোল সমস্ত প্রাণকে দুই চক্ষুর মধ্যে পরিপূর্ণ করে দেখল গিরিশ। আর কাকে বলে টলমল-করা দেখল একবার

অন্তরীক্ষের দিকে তাকিয়ে। আকাশের তারা আর মর্তের মুহূর্ত নাচছে হাত ধরাধরি করে। এখনো চিনতে পারছে না, তার মনে কি এখনো বাঁক আছে? বাঁকাকে দেখে বাঁক কি এখনো সিধে হয়নি?

নাচতে-নাচতে ঠাকুর একবার গিরিশের কাছে এসে পড়েছেন। আর সেইখানেই সমাধিস্থ। মাথাকে নত করে দিল, গিরিশ প্রণাম করল ঠাকুরকে। কীর্তনান্তে ঠাকুর যখন পুরোপুরি নামলেন দেহভূমিতে, গিরিশ জিগগেস করল, আমার মনের বাঁক যাবে?

ঠাকুর বললেন, 'যাবে।'

যেন স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করা যায় না, এমনি দ্বিধান্বিতভাবে আবার জিগগেস করল গিরিশ, 'সত্যি, যাবে?'

'যাবে।'

তবু, বার-বার তিনবার।

'ঠিক বলছেন, যাবে আমার মনের বাঁক?'

'সত্যি বলছি, যাবে, যাবে, যাবে।'

মনোমোহন মিত্তির বসেছিল পাশে। বিরক্তির ঝাঁজ নিয়ে বললে, 'এক কথা একশো-বার জিগগেস করছেন কেন? উনি বলছেন, যাবে, তবু বার-বার ত্যক্ত করা।'

কি আস্পর্ধা লোকটার, মুখের উপর সমালোচনা করে! গর্জে উঠতে যাচ্ছিল, মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল গিরিশ। অনুভব করল তার মনের বাঁক কেটে গেছে। ক্রোধের বদলে দীনতা এসেছে। রূঢ়তার বদলে স্নিগ্ধ্য। কলহ না করে দেখলে আত্মদোষ। সত্যিই তো, ঠাকুরের এক কথাই একশো সত্যের সমান। তবে কেন অসহিষ্ণু হয়েছিলাম? ঠাকুরকে কেন বসাতে পারিনি এক কথায় একাসনে?

পরদিন থিয়েটার যাবার পথে তেজ মিত্তিরের সঙ্গে দেখা।

'ও মশায়, কাল আপনার জন্যে একটি চিরকুট রেখে এসেছিলাম, পেয়েছিলেন?'

'তুমি কোথায় পেলে?'

'কোথায় আবার পাব! থিয়েটারে গিয়ে দেখলাম আপনি নেই, তাই নিজের হাতে লিখলুম চিরকুট।'

'কিন্তু আপনাকে সংবাদ কে দিলে?'

'কিসের সংবাদ?'

বিরক্ত হয়ে ঝাঁজিয়ে ওঠবার প্রশ্ন এই। কিন্তু অদ্ভুত নম্র থেকে গিরিশ বললে, 'রাম দত্তের বাড়িতে পরমহংসদেবের আসার সংবাদ!'

'আর কে দেবে! স্বয়ং প্রভু। আমাকে বললেন থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে একটা খবর দিও।'

"আমাকে কেন খবর দিতে বললেন বলতে পারেন?'

'তার আমি কি জানি!' তেজ মিত্তির দু'হাতে শূন্যায়িত ভঙ্গি করলে: 'মা কেন তার সন্তানকে ডাকবে, এই কৈফিয়ত আমার জানা নেই।'

তুমি আমাকে ডাক দিয়েছ এ কি আসেনি আমার কর্ণকুহরে? আমার অন্তরতিমিরে

জ্বলেনি কি তোমার ডাকের দীপশিখা? হৃদয়ের শুষ্ক মঞ্জরীর মর্মদেশে লাগেনি কি ডাকের লাবণ্যবর্ণ? বিভাবরী ভোর হল, তোমার ডাকটি এল আজ তপস্বিনী ঊষসীর মূর্তিতে। তোমার ডাক শুনে জাগি আজ অম্লান-নির্মল নেত্রে, শ্যামায়মান প্রাণের সমারোহে। বলবান বিশ্বাসের দুর্বারতায়। নিমেষের কুশাঙ্কুরকে পায়ে দলে চলব নবতর প্রভাতের আবিষ্কারে। মৃত্যুর উদার তীর্থে। সেই পরমা নিবৃতির শেষ প্রান্তে।

ভবনাথকে বলছেন ঠাকুর, 'আসবে হে আসবে! আমি চেয়েছিলুম ষোলো আনা, গিরিশ আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিলে। না দিয়ে যাবে কোথা? আলো যখন উপচে পড়বে, তখন যাবে কোথা, দিতেই হবে। প্রেম যখন উপচে পড়বে তখন ধরবে কি আর প্রাণপাত্রে? যাবে কোথায়, ঢালতেই হবে সে মধুপ্লাবন!'

সে দানের ক্ষয় নেই। সে গানের শেষ নেই। আর সে প্রাণ অপরিচ্ছেদ্য।
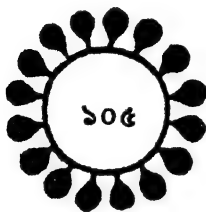
গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। আর গড়িমসি নয় একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, শির, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বাক্য সহযোগে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

দক্ষিণের বারান্দায় একখানি কম্বলের উপর বসে আছেন ঠাকুর। সামনে আরেকখানি কম্বলে ভবনাথ বসে।

'এসেছিস? আমি জানি তুই আসবি। জিগগেস কর একে,' ভবনাথের দিকে ইশারা করলেন ঠাকুর, 'তোর কথাই বলছিলাম এতক্ষণ। বোস, পাশে এসে বোস।'

পায়ের কাছে বসে পড়ল গিরিশ। বললে, 'আপনি জানেন না আমি কত বড় পাপী। আমি যেখানে বসি সাত হাত মাটি পর্যন্ত তলিয়ে যায় পাপের ভারে।'

'তাই নাকি?' অভয়মাখা হাসি হাসলেন ভুবনসুন্দর। বললেন, 'তুই এত পাপী যে পতিতপাবনও সে পাপ হরণ করতে অক্ষম—তাই না?'

'কিন্তু আমি যে পাপের পাহাড় করেছি।'

'পাহাড় করেছিস নাকি?' ক্লান্তিহরণ হাসি হাসলেন আবার। বললেন, 'ও তো তুলোর পাহাড়। একবার মা বলে ফুঁ দে, উড়ে যাবে।'

অকূলে যেন কূল পেল গিরিশ। যেন আর সে ভেসে যাবে না, তলিয়ে যাবে না, হারিয়ে যাবে না। বললে, 'এখন থেকে আমি কী করব?'

'যা করছিস তাই কর।'
কী করছি? বই লিখছি। ধারণা নেই, লিখে চলেছি অভ্যাসবশে। লোকে বলে, অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে অমন জিনিস বেরোয় না কলমে। বিশ্বাসের জোর তো ভারি, কখানি নাটক লেখাচ্ছে। লোকশিক্ষা হচ্ছে নাকি! মস্ত পণ্ডিত আমি, লোক-শিক্ষা দেবার আর লোক নেই দুনিয়ায়! ঠাকুরের পদাশ্রয়ে এসে এখনো বই লেখা! তুচ্ছ পুঁথির পুঁতির মালা তৈরি করা।
'হ্যাঁ, বই লেখাটাও কর্ম। কর্ম না করলে কৃপা পাবে কি করে? জমি পাট করে রুইলেই তো জন্মাবে ফসল।'
সেই দিনানুদৈনিক কাজ, সেই বই লেখা, সেই থিয়েটার করা—এখনো ঠাকুরের এই ব্যবস্থা?
হ্যাঁ, এই। কর্মে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে যখন তোর ঘর্ম ঝরে পড়বে তখনই তোর আসল ধর্ম। তবে একটু স্মরণ-মনন চাই। ওটিই হচ্ছে যুক্ত হবার সেতু। লেগে থাকবার আঠা।
'এখন এদিক-ওদিক দুদিক রেখে চল্।' বললেন ঠাকুর, 'তারপর যদি এই দিক ভাঙে তখন যা হয় হবে। তবে,' ঠাকুরের কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ল: 'সকালে-বিকালে স্মরণ-মননটা একটু রাখিস, পারবিনে?'
মুষড়ে পড়ল গিরিশ। এ আবার কী বাঁধাবাঁধি! সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠে তার ঠিক নেই। বিকেলে হয় থিয়েটারে নয় অন্য কোথাও! স্মরণ-মননের সময় কই! শেষকালে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি আর কি! কিন্তু কত সামান্য কথা। এটুকুও গিরিশ রাখতে পারবে না? কোনো কঠিন ব্রত-নিয়ম করতে বলছেন না, নয় কোনো আসন-প্রাণায়াম, নিশান্তে ও দিনান্তে একটু শুধু মনে করে ঈশ্বরকে বাধিত করা! এটুকুতেও গিরিশ অসমর্থ! লোকে বলবে কি!
কিন্তু মনকে চোখ ঠেরে তো লাভ নেই। সরলতার ঠাকুর, তাঁর সামনে কেন ধরব ছদ্মবেশ? মুখে যাই বলি মনের কথা তিনি ঠিক নখমুকুরে দেখে নেবেন।
'বহু দিনই সকালের সঙ্গে দেখা হয় না, ঘুম ভাঙতে-ভাঙতেই দুপুর। আর বিকেল?' গিরিশ কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'বিকেল যেখানে কাটে সেখানে আরেক রকম মোহনিদ্রা!'
'বেশ, খাবার আগে?' ঠাকুরের কত দায় এমনি ভাবে বলছেন কাতর হয়ে: 'না খেয়ে তো আর থাকিস না? বেশ তো, খেতে বসে একটু নাম করিস মনে-মনে।'
সত্যি, রোজ খাই তো? এমন এক-একদিন গেছে কাজে-কর্মে খাওয়াই হয়নি। খেতে বসেছি, কিন্তু এত দুশ্চিন্তা, খাচ্ছি বলে হুঁস নেই। কোনোদিন দশটায়, কোনোদিন বা বিকেল তিনটেয়। কোনোদিন কতগুলি শিঙাড়া-কচুরি খেয়ে দিন কেটেছে থিয়েটারে। আমার আবার খাওয়া! আসন নেই, বাসন নেই, ফরাসে বসে ঠোঙায় করেই খেয়ে নিলাম। আমার আবার স্থির হয়ে বসে নাম করা!
'ও পারব না।' মাথা চুলকোতে লাগল গিরিশ: 'খাওয়ার আমার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তা ছাড়া খিদের সময় খাবার পেলে আর কিছু তখন মনে থাকে না।'

যেন কত বাহাদুরের মত কথা বলছে। সামান্য একটা অনুরোধ, অত্যন্ত সোজা অত্যন্ত হালকা, তবুও সে অপারগ! সমাজে সে মুখ দেখাবে কি করে!
কিন্তু ঠাকুর দেখুন তার গহন মনের গোপন মুখচ্ছবি। যা সে পারবে না তা সে বলবে করব? অসত্যের চেয়ে অক্ষমতা অনেক নির্দোষ।
তবু নিরস্ত হন না ঠাকুর। বললেন, কণ্ঠস্বরে সেই মমতাময় মিনতি, 'বেশ তো, শোবার আগে? শুতে না শুতেই তো ঘুম আসে না! অন্তত এক-আধ মিনিট তো অপেক্ষা করতে হয়! তখন, সেই এক-আধ মিনিট সময়টুকুর মধ্যে একটু নাম করিস!'
ভালো সময়ই বের করেছ বটে! আমার কি ওটা ঘুম? আমার ওটা বিস্মরণ। কিংবা বিস্মরণের সমুদ্রে আত্মবিসর্জন। একটি শুচিস্নিগ্ধ শান্তির জন্যে প্রতীক্ষা নয়, জ্বালা-নিবারণের ওষুধ। আর শুই কোথায়? কোন বিছানায়? কার বিছানায়?
মাথা হেঁট করল গিরিশ। বললে, 'আমার ঘুম আসে না। আর ঘুম যদি না আসে নামও আসে না।'
ছি-ছি, এমন করে কেউ প্রত্যাখ্যান করেছে ঠাকুরকে! গন্ধমাদন আনতে বলেননি, গাণ্ডীব তুলতে বলেননি, চাননি দধীচির অস্থি। বলেননি, গুহায় যাও পর্বতে গিয়ে ওঠো বা অরণ্যে প্রবেশ করো। শুধু একটি চিহ্নিত সময়ে মনের নির্জনে একটু ঈশ্বরকে স্মরণ করা। এত সংখ্যা জপ করতে হবে, তাও না। কোনো ধরা-বাঁধা মন্ত্র নয় যে মুখস্ত লাগবে বা উচ্চারণে ভুল হবে। একেবারে বেকড়ার, একেবারে বেকসুর। চোখ পর্যন্ত বুজতে হবে না। একটু শুধু ভাবা। মনে দাগ রাখতে হবে বা স্থান দিতে হবে মনের কোণে এমনও কোনো কথা নেই। শুধু সময়ের উড়ন্ত বাতাসে একটি চপল মুহূর্তের ঘ্রাণ নেওয়া। এটুকুও করতে পারবে না, দিতে পারবে না গিরিশ? ছি-ছি, তবে সে জন্মেছিল কেন মানুষ হয়ে?
কিন্তু বৃথা বড়াই করে লাভ নেই। গিরিশ নিজেকে তো জানে। কেমন সে বাউণ্ডুলে কেমন সে ছন্নমতি! শেষে যদি কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারে! আসলে ভগবানের যে নাম করব তাঁর কৃপা না হলে হবে কি করে? এই যন্ত্রে যে তিনি ঝঙ্কার তুলবেন যন্ত্র নিজের হাতে তো তাঁকে বেঁধে নিতে হবে! বাঁধবার সময় ব্যথা লাগবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ব্যথাই তো কৃপা।
কিন্তু, এ কি, এ কৃপা যে ব্যথাহীন। এ কৃপা যে অহেতুক!
'বেশ, তোকে কিছুই করতে হবে না।' ঠাকুর বললেন প্রসন্নাস্যে : 'আমাকে তুই বকলমা দে।'
তার মানে?
তার মানে, তোকে কিছুই করতে হবে না, তোর ভার আমার উপর ছেড়ে দে! তোর হয়ে আমিই নাম করব। তুই শুধু কলম ছুঁয়ে দে, আমিই সই করব তোর হয়ে।
আর কি চাই! আমার একেবারে ছুটি, আমি নেচে-গেয়ে আনন্দ করে বেড়াব। যা করবার প্রভু করবেন। আমি নন্দের গোপাল হামা দিয়ে বেড়াব। তিনিই ধুলো মুছে কোলে তুলে নেবেন।

কিন্তু এ কি গিরিশ ছুটি পেল, না, বাঁধা পড়ল দ্বিগুণ শৃঙ্খলে?
বাঁধা পড়ল। গিরিশের আর আমি রইল না। ঠাকুর যখন ভার নিয়েছেন তখন নিজের আর কোনো কর্তৃত্ব নেই, সব তাঁর ইচ্ছাধীন। আমার হয়ে তিনি সত্যি নাম করছেন কিনা এটুকু প্রশ্ন করবারও আর অধিকার নেই। সব তাঁর খুশি, তাঁর এক্তিয়ার। ভার নেওয়া কঠিন হতে পারে, ভার দেওয়াও কম কঠিন নয়। ভার দেওয়া মানে পালিয়ে যাওয়া নয়, ভার দেওয়া মানে কোলের উপর বসা, কাঁধের উপর চড়া। নইলে, ভার যে দিলাম চাপিয়ে, বোঝাব কি করে?
আমার হয়ে সত্যি নাম করছেন কিনা—মাঝে-মাঝে এ চিন্তা আসে। এমনিতে হলে একবার নাম হত, এ চিন্তায় দুবার করে হচ্ছে। প্রথমত, নাম হচ্ছে কিনা—নামই রাম—আর দ্বিতীয়ত, ঠাকুর করছেন কিনা। নামের সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরের মূর্তি মনে ভাসছে। একের জায়গায় দুই হচ্ছে।
এ যে অছি বসিয়ে দেওয়া। আর 'আছি' নয়, এবার অছি। আর 'আমি' নয়, এবার তুমি। আমার বলে আর কিছু নেই সংসারে। আমার কলম তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। পা-টি ফেলছি এ আমার জোরে নয়, তোমার জোরে। নিশ্বাসটি ফেলছি এ আমার কেরামতি নয়, তোমার করুণা।
'বকলমা দেওয়ার মধ্যে যে এত আছে তা কে জানত! সময় করে নাম করা যেত তার একটা অন্ত থাকত। এ যে একেবারে অনন্তের মধ্যে এসে পড়লুম।' গিরিশ বলছে তদ্‌গত হয়ে : 'কোথাও একটুকু ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। বকলমা দেওয়া মানে গলায় বক্‌লস লাগানো। খাস ছেড়ে দিয়ে দাস বনে যাওয়া!'
স্ত্রী মারা গেল গিরিশের। পুত্র মারা গেল।
উপায় নেই, বকলমা দিয়ে দিয়েছ। মনকে প্রবোধ দেয় গিরিশ : 'তুমি কী জানো কিসে তোমার মঙ্গল, ঠাকুর জানেন। তুমি তাঁর উপর তোমার ভার দিয়েছ তিনিও নিয়েছেন সে-ভার। এখন তো আর বিচার চলবে না, সমালোচনা চলবে না। দলিলে এমন কোনো লেখাপড়া নেই কোন পথ দিয়ে তিনি তোমাকে নিয়ে যাবেন। তুমি তোমার জীবনস্বত্ব দান করে দিয়েছ ঈশ্বরকে। এখন তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে যা খুশি করুন, মারুন-কাটুন, ফেলুন-ভাঙুন, তোমার কিছু বলবার নেই। তাঁর কুলাল-চক্রে তুমি এখন এক তাল নরম কাদা হয়ে যাও।'
তাই হোক। তাই হোক।
আমাকে তুমি নিযুক্ত করো। আমার বাক্যকে নিযুক্ত করো তোমার গুণকথনে, কর্ণকে নিযুক্ত করো তোমার রসশ্রবণে, হস্তকে নিযুক্ত করো তোমার মঙ্গলকর্মে। মন থাক তোমার পদযুগে, মাথা থাক তোমার জগৎপ্রণামে আর দৃষ্টি থাক দিকে দিকে তোমারই মূর্তিদর্শনে।
'যার যা মনের পাপ আছে, অকপটে জানাও ঈশ্বরকে।' বলছেন ঠাকুর বরদমূর্তিতে : 'যিনি বিন্দুকে সিন্ধু করতে পারেন তিনি পারেন পাপকে মার্জনার পারাবারে ডুবিয়ে দিতে।'
'কি করে জানাব!' গিরিশ কেঁদে পড়ল, 'আমি যে দুর্বল।'

'তা কি ঠাকুর জানেন না? খুব জানেন। তাই, একবার তাঁর শরণাগত হও, সব সমাধান হয়ে যাবে। শরণাগতকে শ্রীহরি পরিত্যাগ করেন না। দীনের ত্রাণকর্তা তিনি, নিশ্চয়ই তোমাকে ত্রাণ করবেন।'
'আমি কি হরি-টরি কাউকে চিনি? আমি চিনি তোমাকে।' গিরিশ জোড় হাত করল : 'তোমাকে বকলমা দিয়েছি। তুমি নিয়েছ আমার ভার। তুমিই আমার ভারহরণ—'
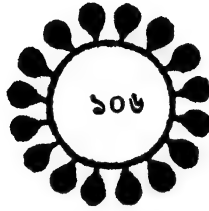
কেদার চাটুজ্জেরও সেই কথা।
গোড়ায় ব্রাহ্ম ছিল এখন ভক্তিতে সাকারবাদী হয়েছে। এত দৃষ্টিময় স্বাদময় হয়েছে যে বলছে দক্ষিণেশ্বরে এসে, 'অন্য জায়গায় খেতে পাই না, এখানে পেট-ভরা পেলুম।'
'সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার।' কেদারকে বলছেন ঠাকুর, 'সাধুই ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ কীরিয়ে দেন।'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।' কেদার বললে, 'যেমন রেলের এঞ্জিন। পেছনে কত গাড়ি বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে যায়। কিংবা যেমন নদী। কত লোকের পিপাসা মেটায়। তেমনি সব মহাপুরুষ। তেমনি আপনি।'
ঈশ্বরের কথায় চোখ জলে ভেসে যায় কেদারের। সংসারে রুচি নেই। মন যেন পাদ-পদ্মলোভী মধুকর।
কালীঘরে মাকে প্রণাম করে এসেছেন, চাতালে বেরিয়ে এসে ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন ভূমিষ্ঠ হয়ে। চেয়ে দেখলেন সামনে কেদার, রাম, মাস্টার আর তারক।
তারক মানে বেলঘরের তারক মুখুজ্জে। প্রথম যখন এসেছিল দক্ষিণেশ্বরে, চার বছর আগের কথা, তখন তার বয়স মোটে কুড়ি। বিয়ে করেছে। বাপ-মা আসতে দেয় না ঠাকুরের কাছে। কিন্তু ঠাকুর যে বাপ-মা'র চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।
সঙ্গে সেবার একটি বন্ধু নিয়ে এসেছে। নাস্তিবাদী বন্ধু। নাকের ডগায় সব সময়ে একটু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা।
ঘরে প্রদীপ জ্বলছে, ছোট খাটটিতে বসে আছেন ঠাকুর। তারককে দেখে শিশুর মত খুশি হয়ে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গের ওই ল্যাজটি কোত্থেকে জুটিয়ে আনল? বন্ধুটিকে ঠাকুর বললেন, 'একবার মন্দির সব দেখে এস না।'

বন্ধু উপেক্ষার একটা ভঙ্গি করল। বললে, 'ও সব ঢের দেখা আছে।'

'শোন,' তারককে কাছে ডাকলেন ঠাকুর, 'বিশালাক্ষীর দ, মেয়েমানুষের মায়াতে যেন ডুবিসনি। যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না। তোর অনেক শক্তি, তুই পড়বি কেন? দেখি তোর হাত দেখি।'

ঠাকুর তারকের হাতের ওজন নিচ্ছেন। বললেন, 'একটু আড় যে নেই তা নয়। আছে। কিন্তু, আমি বলছি ওটুকু যাবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবি আর মাঝে-মাঝে আসবি এখানে।'

তারক মাথা নোয়ালো। বললে, 'বাবা-মা আসতে দেয় না।'

'জোর করে আসবি। বাপ-মা শিরোধার্য, কিন্তু ঈশ্বরের চেয়ে কম।'

'এটা কি বললেন মশাই?' সেই বন্ধু ফোড়ন দিল : 'যদি কারু মা দিব্যি দিয়ে বলে ছেলেকে, যাসনি দক্ষিণেশ্বরে, সে যাবে? মা'র অবাধ্য হবে?'

'যে মা ওকথা বলে সে মা নয়, সে অবিদ্যা। সে মা'র অবাধ্য হলে কোনো দোষ হয় না।' বললেন ঠাকুর : 'ঈশ্বরের জন্যে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা চলে, কিন্তু মনে রাখিস, শুধু ঈশ্বরের জন্যে। তা ছাড়া অন্য সব কথা মাথা পেতে শুনতে হবে বাপ-মা'র। নির্বিবাদে, তর্ক-বিচার না করে।'

'আপনি যে কথাটা বলছেন শাস্ত্রে এর দৃষ্টান্ত আছে?' বন্ধু আবার টিপটেন কাটলো।

'বহু। ভরত রামের জন্যে শোনেনি কৈকেয়ীর কথা। প্রহ্লাদ কৃষ্ণের জন্যে শোনেনি হিরণ্যকশিপুর শাসন। বলি শোনেনি গুরু শুক্রাচার্যের কথা, জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। আর গোপীরা? কৃষ্ণের জন্যে শোনেনি পতিদের নিষেধ। কি বাপু, মিলছে শাস্ত্রের সঙ্গে?'

ওরা চলে গেলে পর ঠাকুর শুয়েছেন ছোট খাটটিতে, আর বলছেন মাস্টারকে, 'বলতে পারো, ওর জন্যে আমি এত ব্যাকুল কেন? সঙ্গে ওটাকে আবার কেন নিয়ে এল?'

'বোধ হয় রাস্তার সঙ্গী।' বললে মাস্টার, 'অনেকটা পথ তাই একজনকে সঙ্গে করে এনেছে।'

যদি সঙ্গী কেউ না জোটে ঈশ্বরই তোর সঙ্গী। ঐ নির্জনতাই তোর নিবিড়তা। কেউ সঙ্গে নেই বলেই তো সে চলেছে তোর পাশে-পাশে।

কালীঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে ফের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর। তারকের চিবুক ধরে আদর করলেন।

'নরেন রাঙাচক্ষু রুই, কিন্তু তুই হচ্ছিস মৃগেল।'

ভাবাবিষ্ট হয়ে ঘরের মেঝেতে বসেছেন ঠাকুর। পা দুখানি সামনের দিকে প্রসারিত। রাম আর কেদার নানা জাতের ফুল দিয়ে সেই পা দুখানি বন্দনা করছে। ঠাকুরের দুপায়ের দুই বুড়ো আঙুল ধরে বসে আছে কেদার। বিশ্বাস, স্পর্শে শক্তি সঞ্চার হবে। কিন্তু তাইতেই কি হয়? যিনি দেবার তিনি যদি না দেন শুধু তাঁর আঙুল ধরলে কিছু হবে না।

'মা, ও আমার আঙুল ধরে কি করতে পারবে?' ঠাকুর বলছেন অর্ধবাহ্যদশায়।

কেদার তো অপ্রস্তুত। মনের কথা কি করে টের পেয়েছেন অন্তর্যামী! তাড়াতাড়ি আঙুল ছেড়ে দিয়ে হাত জোড় করলে।

মনের আরো কথা যেন টের পেয়েছেন। গোপনীয় নিগূঢ় কথা। প্রকাশ্যেই তাই বলছেন ঠাকুর, 'মুখে বললে কি হবে যে মন নেই, কামকাঞ্চনে এখনো তোমার মন টানে! আমি বলি কি এগিয়ে পড়ো। একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরো না যে সব হয়ে গেছে। চন্দন গাছের বনের পর আরো আছে, রুপোর খনি, সোনার খনি, হীরে-মাণিক। এখুনি থামলে চলবে কেন?'

কণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে কেদারের। রামের দিকে চেয়ে বলছে ভয়ে-ভয়ে, 'ঠাকুর এ কি বলছেন!'

ঠিকই বলছেন। এমনি তো মনের মুখোমুখি হবে না, খালি পাশ কাটিয়ে যাবে। ঠাকুর মনের সঙ্গে সম্মুখ-সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন। এখন দেখ একবার নিজের নির্ভেজাল রূপটুকু, আর আত্মতৃপ্তির আবরণ টেনে রেখো না। দেখ এখনো কত বিকৃতি, কত বৈচিত্ত্য। কৃপা পেয়েছে বলেই তো পেলে এই আত্মদর্শনের সুবিধে। দর্পণ আবার মার্জন করো। ক্ষালন করো ক্ষতক্লেদ।

'এই কামকাঞ্চনই আবরণ। এত বড়-বড় গোঁফ, তবু তোমরা ওতেই রয়েছ জুজু হয়ে। বলো, ঠিক বলছি কিনা, মনে-মনে দেখ বিবেচনা করে—'

কেদার চুপ করে আছে। ঠিক বলছেন!

'যাকে ভূতে পায় সে জানতে পায় না তাকে ভূতে পেয়েছে। যারা কামকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবাবোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল! কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে তারা বুঝতে পারে।'

একদিন কেদারের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে হল ঠাকুরের, পারলেন না। বললেন, 'ভিতরে অঙকট-বঙকট। ঢুকতে পারলাম না। বললাম তো, আসক্তি থাকলে হবে না। তাই তো ছোকরাদের অত ভালোবাসি। ওদের ভিতর এখনো বিষয়বুদ্ধি ঢোকেনি। অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই টান ঈশ্বরের দিকে! যেন বনের মধ্যে ফোয়ারা বেরিয়ে পড়েছে। জল একেবারে বেরুচ্ছে কলকল করে।'

সেদিন আপিস যাবার পথে কেদার এসে হাজির। সরকারী একাউন্টেন্টের কাজ করে, থাকে হালিসহরে। সেখান থেকে কলকাতায় আসে। আসবার পথে কি মনে করে ঢুকেছে আজ দক্ষিণেশ্বরে। আপিসের পোশাক পরনে, চাপকান মায় ঘড়ি আর ঘড়ির চেন। হঠাৎ মন কেমন ব্যাকুল হয়েছে, দেখে যাই একবার ঠাকুরকে। যেই মনে হওয়া, অমনি গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সটান দক্ষিণেশ্বর।

তাকে দেখেই ঠাকুরের বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপন হল। প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন ও রাধিকার ভাবে গেয়ে উঠলেন গদগদ হয়ে : 'সখি, সে বন কতদূর! যেথায় আমার শ্যামসুন্দর! আর যে চলিতে নারি।'

ঠাকুর দেখলেন কেদারের অন্তরে গোপীর ভাব। তার সেই ব্যাকুলতাটিই কৃষ্ণান্বেষিণী গোপবালা!

ব্রজবন থেকে কৃষ্ণ যখন অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন তখন গোপীদের কী দশা? বন

হতে বনান্তরে খুঁজতে লাগল পাগলের মত। অশ্বত্থ আর অশোক, কিংশুক আর চম্পক, হে পরার্থজীবিত বৃক্ষ, আমাদের প্রিয়তম কোন পথ দিয়ে চলে গেল তা কি তোমরা দেখেছ? হে তুলসী, যার বুকে থেকেও যার পদযুগল ধ্যান করো, তুমি কি দেখেছ কোথায় পড়েছে তার পদধূলি? মালতী আর যূথিকা, করস্পর্শে তোমাদের শিহরিত করে তিনি কি গেছেন এই পথ দিয়ে? সখীগণ দেখ, দেখ, এই ব্রততী শরীরে পুলক ধারণ করে বিরাজ করছে, তবে কি তিনি একে নখাঘাত করে চলে গেছেন? হে তৃণাঞ্চিত পৃথিবী, কোন পুরুষভূষণের আলিঙ্গনে তোমার এই নবীন রোমাঞ্চ? কৃষ্ণবিরহে আমরা বিগতপ্রাণা, আমাদের পথ বলে দাও। পতি-পুত্র দ্বারা বারিতা হয়েও আমরা নিবৃত্ত হইনি। লোলায়িতকুণ্ডলকর্ণে ছুটে এসেছি এখানে। কেউ গোদোহন ফেলে এসেছি, কেউ বা দুগ্ধাবর্তন; কেউ শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিলাম, কেউ বা করছিলাম অন্নপরিবেশন, কেউ বা অঙ্গরাগলেপন—যার যা হাতের কাজ সব ফেলে-ছড়িয়ে ছুটে এসেছি তাঁর বাঁশি শুনে। সেই অরবিন্দনেত্র এতক্ষণ তো ছিলেন আমাদের সামনে, তিনি কোথায় গেলেন? কেন অদৃশ্য হলেন?

এই ব্যাকুলতাটিই বাস করছে কেদারের বুকের মধ্যে। এই ব্যাকুলতাই ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব বিধিবন্ধনের কাঁটাবেড়া।

অধর সেন বললে, 'শিবনাথবাবু সাকার মানেন না।'

'সেটা হয়তো তাঁর বোঝবার ভুল।' বললে বিজয় গোস্বামী। ঠাকুরের দিকে ইশারা করলে : 'ইনি যেমন বলেন, বহুরূপী কখনো এ রঙ কখনো সে রঙ। যার গাছতলায় বাসা সে ঠিক খবর রাখে। আমি ধ্যান করতে-করতে দেখতে পেলাম চালচিত্র। কত দেবতা, কত কি। আমি বললাম, আমি অত-শত বুঝি না, আমি তাঁর কাছে যাব, তবে বুঝব।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার ঠিক-ঠিক দেখা হয়েছে।'

কেদারের মধ্যে তন্ময়তা এল। বললে, 'ভক্তের জন্যে সাকার। প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে। ধ্রুব যখন শ্রীহরিকে দর্শন কবল, বললে, কুণ্ডল কেন দুলছে না? শ্রীহরি বললেন, তুমি দোলালেই দোলে।'

'সব মানতে হয় গো সব মানতে হয়—নিরাকার সাকার সব। কালীঘরে ধ্যান করতে-করতে দেখলুম, রমণী। বললুম, মা, তুই এরূপেও আছিস? কোন রূপে কার সামনে কখন এসে দাঁড়াবেন কেউ জানে না।'

'যাঁর অনন্ত শক্তি,' বললে বিজয়, 'তিনি অনন্তরূপে দেখা দিতে পারেন।'

'সেই যে গো চিনির পাহাড়ে পিঁপড়ে গিয়েছিল।' বললেন ঠাকুর, 'এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আরেক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব। তেমনি একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বা বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে আমি সব বুঝে ফেলেছি।'

নবগোপাল ঘোষ একবার তিন বছর আগে এসেছিল। তারপর ভুলে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরের কথা। কিন্তু ঠাকুর ভোলেননি। কি জানি কেন, তিন বছর বাদে ঠাকুর তাকে ডেকে পাঠালেন।

নবগোপাল তো অবাক। আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছি অথচ তুমি আমাকে ভোলোনি কিংবা এতদিন ভুলিয়ে রেখে শুভক্ষণ দেখে ডেকে পাঠিয়েছ। নবগোপাল পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'কামকাঞ্চনে ডুবে আছি, কি করে আমার ত্রাণ হবে!'
'কোনো চিন্তা নেই।' ঠাকুর বললেন স্নিগ্ধাননে, 'দিনে শুধু একবারটি আমায় মনে করো। শুধু একবার।'
গুরু-শিষ্য বোঝাচ্ছেন ঠাকুর। যিনি ইষ্ট তিনিই গুরুরূপ ধরে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইষ্টদর্শন হয় তখন গুরু এসে শিষ্যকে বলেন তুইই গুরু তুইই ইষ্ট। যখন পূর্ণজ্ঞান হয় তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।
কে একজন ভক্ত বলে উঠল, 'তাই তো বলে গুরুর মাথা শিষ্যের পা।'
'বোঝো মানে।' বললে নবগোপাল, 'শিষ্যের মাথাটা গুরুর আর গুরুর পা শিষ্যের।'
'না, ও মানে নয়।' বললে গিরিশ, 'বাপের ঘাড়ে ছেলে চড়েছে। শিষ্যের পা এসে ঠেকেছে গুরুর মাথায়।'
'তবে তেমনি কাঁচ ছেলে হতে হয়।' বললে নবগোপাল, 'কাঁচ ছেলে হলেই তবে বাপ তুলবে কাঁধের উপর।'
হতে হবে সরলশুভ্র। হতে হবে লঘুমৃদু। হতে হবে মানহীন ভারহীন সহায়-সম্বলহীন। মা তখন ছেলেকে ধুলো থেকে কোলে, কোল থেকে কাঁধে তুলে নেবেন। চুমু খাবেন পদাম্বুজে।
বেলঘরের তারক মুখুজ্জে অমনি এক খাঁটি ছেলে, কাঁচ ছেলে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, ঠাকুর দেখলেন, তাঁর ভিতর থেকে আলো বেরিয়ে চলেছে তারকের পিছু-পিছু। তারক অসহায়, তারক আশ্রিত অর্পিতসর্বস্ব। তাই তাকে একা ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই তার সঙ্গ নেন, হাত ধরেন, পথ দেখান, শ্রান্ত হলে নেন তাকে কাঁধে করে।
কয়েকদিন পর আবার এসেছে, ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে তারকের বুকের উপর পা তুলে দিলেন। তারক আর কি চায়! যমভয়লয়কারী পরম পদ। কারুণ্যকল্পদ্রুমের ধ্রুব-চ্ছায়া! এ পদের বাইরে আর কী সম্পদ চাইবার আছে!
'খুব উঁচু ঘর তারকের। তবে শরীর ধারণ করলেই ত গোল। স্খলন হল তো সাতজন্ম আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়। বাসনা থাকলেই দেহধারণ।' বললেন ঠাকুর।
কে একজন ভক্ত বলে উঠল, 'যাঁরা অবতার তাঁদেরও কি বাসনা থাকে?'
সরল ঠাকুর বললেন সহাস্যে, 'কে জানে! তবে আমার দেখছি সব বাসনা যায়নি। এক সাধুর আলোয়ান দেখে ইচ্ছে হয়েছিল অমনি পরি একখানি। সেই ইচ্ছে এখনো আছে। জানি না আবার আসতে হবে কিনা—'
বলরাম বসেছিল পাশে। হেসে উঠল শিশুর মত। বললে, 'আপনার জন্ম হবে কি ঐ আলোয়ানের জন্যে?'

'কে জানে। তবে শেষ পর্যন্ত একটি সৎ কামনা রাখতে হয়। ঐ চিন্তা করতে-করতে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চার ধামের এক ধাম বাকি রাখে। হয়তো গেল না শ্রীক্ষেত্র। তা হলে জগন্নাথ ভাবতে-ভাবতে শরীর যাবে।'

ঘরের মধ্যে একজন গেরুয়াধারী লোক ঢুকল। ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

চিরকাল ঠাকুরকে ভণ্ড বলে এসেছে। তবু প্রণাম করবার ঘটা দেখ।

বলরাম হাসছে। ঠাকুর বলছেন, 'বলুক গে ভণ্ড। হাসিসনি। কে জানে ভেক ধরেই হয়তো ওর ভিক্ষে মিলবে। ভেকেরও আদর করতে হয়। ভেক দেখলেও উদ্দীপন হয় সত্যবস্তুর।'
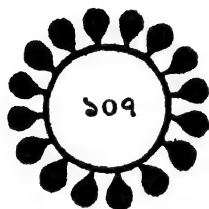
মনোমোহন মিত্তিরও ঈশ্বর মানে না। মেসো রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। বন্ধু বলতে রাম দত্ত, আরেক মেসোর ছেলে। সমপন্থী নাস্তিবাদী।

ব্রাহ্মসমাজের আওতায় এসেছে দুজনে। অথচ কেশব সেনই দক্ষিণেশ্বরে কোন এক সাধুর কথা লিখেছে কাগজে। কেশব যখন লিখেছে তখন উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চল দেখে আসি।

নাস্তিকে-নাস্তিকে মাসতুতো ভাই। এল দুজন দক্ষিণেশ্বরে। রাম দত্ত তখন ডাক্তার, মেডিকেল কলেজে চাকরি করে, আর মনোমোহন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে চল্লিশ টাকার কেরানি।

এসে দেখে ঠাকুরের দরজা বন্ধ। অবিশ্বাস নিয়ে এসেছে, বন্ধ তো থাকবেই। শরণাগতি নিয়ে আসত, খোলা পেত। শরণাগতি কি সহজে আসে?

'ওরে হৃদে, মস্ত এক ডাক্তার এসেছে।' ঠাকুর ডাকলেন হৃদয়কে : 'তোর কি ভাগ্যি! নাড়ী দেখাবি তো এবেলা দেখিয়ে নে।'

হৃদয় তখুনি বাড়িয়ে দিল হাত। রাম দত্তও দিব্যি পরীক্ষা করল। কিন্তু হৃদয়ের হাত দেখে কি হবে! ঠাকুর রামকৃষ্ণের পা কই?

ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছে মনোমোহন, বিশ্বাসের পর্বত ভেদ করে নির্গত হয়েছে ভক্তির নির্ঝরিণী, ইচ্ছে হল পা দুখানি টেনে নেয় বুকের মধ্যে। কিন্তু, কেন কে জানে, সেদিন পা দুখানি গুটিয়ে নিলেন ঠাকুর।

অভিমানে ফুলে উঠল মনোমোহন। বললে, 'বড় যে পা গুটিয়ে নিলেন! শিগগির বার করুন, নইলে কাটারি এনে পা দুখানি কেটে নিয়ে যাব। আমার একার নয় সকল ভক্তের সাধ মেটাব বলে রাখছি।'

তাড়াতাড়ি পা বার করে দিলেন ঠাকুর।

প্রার্থনায় না পাই, অভিমান করে নেব। নেব ছল করে জোর করে কৌশল করে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাবার উদ্যোগ করছে, মাসি এসে বাধা দিল। বললে, যাস নে ওখানে। মাসির বাড়িতে থাকে তাঁর কথার অমান্য করা যায় না, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে না গিয়েই বা থাকা যায় কি করে। রাম দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গেল তাই চুপি-চুপি। গিয়ে দেখে ঠাকুরের মুখ ভার। কি হল?

'ভক্ত আসতে চায় দক্ষিণেশ্বরে কিন্তু তার মাসি তাকে আসতে দিতে নারাজ। ভয় হয় মাসির কথা শুনে সে আসা না বন্ধ করে!'

আরেকদিন দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে, বাধা দিল স্ত্রী। বললে, 'মেয়েটার অসুখ, যেয়ো না বাড়ি ছেড়ে।' কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের ডাক যে ত্রৈলোক্যাকর্ষী বংশীর ডাক। স্ত্রীর কথা তাই কানে তুলল না। এবার আর সঙ্গে নিল না রামকে। কৃতকর্মের ফল সে নিজেই বহন করবে বলে একা গেল। গিয়ে দেখে ঠাকুর বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কি?

'ভক্ত আসতে চায় দক্ষিণেশ্বরে কিন্তু তার স্ত্রী তাকে আসতে দিতে নারাজ। ভয় হয় বউয়ের কথা শুনে সে আসা না বন্ধ করে।'

আসা বন্ধ করল না মনোমোহন। আর, থেকে-থেকে সঙ্গে আছে রাম দত্ত।

দুই নিরীহ গৃহস্থ কিন্তু আসলে দুই বিরাট আবিষ্কর্তা। মনোমোহন আবিষ্কার করল রাখালকে, রাম দত্ত নরেনকে। শুধু সন্ধান দিল না, ধরে নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। প্রতীক্ষিত বারুদের কাছে দুই উড়ন্ত বহ্নিকণা।

মনোমোহন, মহিমাচরণ আর মাস্টার বসে আছেন। মনোমোহনের দিকে চেয়ে বলছেন ঠাকুর, 'সব রাম দেখছি। তোমরা সব বসে আছ, কিন্তু আমি দেখছি রামই সব এক-একটি হয়েছেন।'

'তবে আপনি যেমন বলেন, আপো নারায়ণ—জলই নারায়ণ, তেমনি।' বললে মনো-মোহন, 'জল কোথাও খাওয়া যায়, কোথাও বা মাত্র মুখে দেওয়া চলে, কোথাও বা শুধু বাসন মাজা।'

'ঠিক তাই। কিন্তু তিনি ছাড়া কিছু নেই। জীব-জগৎ সব তিনি।'

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সব তুমি। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার সব তুমি। পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সব তুমি। তুমিই ভোক্তা-ভোজ্য, আধার-আধেয়। তুমিই অখণ্ডমণ্ডলাকার।

হাটখোলার সুরেশ দত্ত নাগমশায়ের বন্ধু। ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে দৃঢ়ীভূত। ঠাকুরকে একবার ভোগ দেবে, নতুনবাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে পাঠিয়েছে গাড়ি করে। নিজে চলেছে পায়ে হেঁটে, দইয়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে। গাড়িতে দিলে ঝাঁকুনিতে দই পাছে চলকে যায়, তাই এই ক্লেশসাধন। ভোগের দই, ভ্রষ্ট হতে পারবে না। তেমনি আমিও অভঙ্গ থাকব।

তেইশ নম্বর সিমলে স্ট্রিট মনোমোহনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বসেছেন বৈঠকখানায়। বলছেন, 'যে আকিঞ্চন যে দীন তারই ভক্তি ঈশ্বরের সব চেয়ে প্রিয়। খোলমাখানো জাব যেমন গরুর প্রিয়। দুর্যোধনের কত ধন কত ঐশ্বর্য, তার বাড়ি ঠাকুর গেলেন না। গেলেন বিদুরের বাড়ি।'

পরামর্শের জন্যে বিদুরকে ডাকলেন ধৃতরাষ্ট্র। কত কিছু ঘটে গেল এর মধ্যে, কিছুই সুফল আনল না। জতুগৃহে দগ্ধ হল না। দ্যূতক্রীড়ায় হেরে গেল, দ্রৌপদীর বেশাভিমর্ষ হল, বনবাস-সত্য-পালন করে ফিরে এল পাণ্ডবেরা। রাজ্যভাগ দাবি করল। কৃষ্ণ এসেছিল অনুনয় করতে, ফিরিয়ে দেওয়া হল। এখন বিদুরের কি মত?

বিদুর বললে, 'মহারাজ, কুরুকুলের কুশলের জন্যে যুধিষ্ঠিরকে দিন তার রাজ্যভাগ। অশিব দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন।'

আর যায় কোথা! এ দাসীপুত্রকে কে ডেকে আনল এখানে? যার অন্নে পুষ্ট তারই সে বিরুদ্ধতা করছে? শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট রেখে একে এখুনি তাড়িয়ে দাও পুরী থেকে। গর্জে উঠল দুর্যোধন।

এও ভগবানেরই লীলা। দ্বারদেশে ধনুর্বাণ রেখে বেরিয়ে পড়ল বিদুর। পরিধানে কম্বল, ধূলিরুক্ষ কেশপাশ, বেরিয়ে পড়ল তীর্থোদ্দেশে। মুখে শুধু কৃষ্ণনাম। 'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।' সর্বাবস্থায় যিনি সর্বচিত্তাকর্ষক। এত মধুর নিজের পর্যন্ত মনোহরণ করেন, নিজেকে নিজেই চান আলিঙ্গন করতে।

যে আকাঙ্ক্ষা অভাব থেকে জাগে তা দূষণস্বরূপ। আর যে আকাঙ্ক্ষা স্বভাব থেকে জাগে তা ভূষণস্বরূপ। ঈশ্বরের স্বভাবই হচ্ছে ভক্তের প্রীতিরস-আস্বাদন। যত খান তত চান। কাউকে ছাড়েন না, যার থেকে যতটুকু পান নিংড়ে-নিংড়ে নেন। শ্রেষ্ঠকে পেলেও কনিষ্ঠকে ছাড়েন না, উত্তমকে পেলেও ছাড়েন না অধমকে। তিনি আর কারু বশীভূত নন শুধু ভক্তের বশীভূত। আর কারুতে বৎসল নন শুধু ভক্তে বৎসল।

'বৎসের পিছে যেমন গাভী যায় তেমনি ভক্তের পিছে ভগবান যান।' বললেন ঠাকুর। কথক প্রহ্লাদচরিত বলছে। হিরণ্যকশিপু যেমন নিন্দা করছে হরির, তেমনি নির্যাতন করছে প্রহ্লাদকে। তবু প্রহ্লাদের বিচ্যুতি নেই। হরিকে প্রার্থনা করছে, হে হরি, বাবাকে সুমতি দাও। আর আমাকে? আমাকে দাও অবিসংবাদিনী ভক্তি।

ঠাকুর কাঁদছেন। পাশে বসে বিজয়, মনোমোহন, সুরেন্দ্র। বলছেন বিহ্বল কণ্ঠে, 'আহা, ভক্তিই সার। সর্বদা তাঁর নাম করো, ভক্তি হবে। দেখ না শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে-ফেলা ছানাবড়া!'

পরে আবার যখন এলেন মনোমোহনের বাড়ি, ঈশান মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলছেন ঠাকুর।

ঈশান বলছে, 'সবাই যদি সংসার ত্যাগ করে তা হলে কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ হয় না?'

"সবাই কেন ত্যাগ করবে? যাকে দিয়ে করাবার তাকে দিয়ে করাবেন। জোর করে কি

কেউ ত্যাগ করতে পারে? মর্কট বৈরাগ্য কি বৈরাগ্য?' বলে ঠাকুর গল্প গাঁথলেন। সেই যে বিধবার ছেলে, মা সুতো কেটে খায়, একটু কাজ পেয়েছিল সে কাজ চলে গিয়েছে। বেকার হয়ে বৈরাগ্য হল, গেরুয়া পরল, কাশীবাসী হল। কিছুদিন পরে মাকে চিঠি লিখলে। মা, আমার একটি চাকরি হয়েছে, দশ টাকা মাইনে। ওই মাইনে থেকেই সোনার আংটি কেনবার চেষ্টা করছে। ভোগের বাসনা যাবে কোথায়?

দ্বিতীয়বার, প্রাঙ্গণে বসেছেন। কেশব এসে প্রণাম করল। গৃহস্থ ভক্তেরা চার দিকে ব'সে।

'সংসারে কর্ম বড় কঠিন।' বলছেন ঠাকুর, 'বন্-বন্ করে যদি ঘোরো, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু যদি খুঁটি ধরে ঘোরো, আর ভয় নেই। ঘুরবে কিন্তু পড়বে না। কর্ম করো চুটিয়ে, কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলো না।'

'বড় কঠিন।' কে একজন বললে। 'তবে উপায় কি?'

'উপায় অভ্যাসযোগ। ছুতোরের মেয়ে একদিকে চিঁড়ে কুটছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছে, কিন্তু সর্বক্ষণ মন রয়েছে মুষলের দিকে।'

অভ্যাসের থেকেই অনুরাগ। কাঁদতে-কাঁদতে শোক, খেতে-খেতে খিদে। ডাকতে-ডাকতে ভালোবাসা। চলতে-চলতে পথ পাওয়া। প্রদীপ জ্বালতে-জ্বালতে নিজে প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠা!

হোক কঠিন। কঠিন বলেও যদি নিবৃত্ত না হও তবেই তো কৃপা করবেন। যারা সংসারে থেকেও তাঁকে ডাকতে পারে তারাই তো বীর ভক্ত। মাথায় বিশ মণ বোঝা তবু ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করছে। যখনই ভগবান দেখবেন এই বীরত্বের কৃতিত্ব তখনই কৃপাস্পর্শে তাকে তিনি মর্যাদা দেবেন। আর তাঁর কৃপাস্পর্শে সমস্ত বোঝা হালকা হয়ে যাবে।

'ভক্তি লাভ করে কর্ম করো।' বলছেন ঠাকুর, 'শুধু কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আটা লাগবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আর আটা লাগবে না।'

নিজে একজন খুব বড় ভক্ত, মনে-মনে ঘোরতর স্পর্ধা মনোমোহনের। এ একরকম ভক্তির অহমিকা। কিন্তু ঠাকুর তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন। একদিন বললেন সকলের সামনে, 'সুরেশের ভক্তিই সকলের চেয়ে বেশি।'

মনোমোহনের অভিমানে ঘা লাগল। ভাবল, তবে আর ঠাকুরের কাছে গিয়ে লাভ কি। ছাড়ল দক্ষিণেশ্বর। রবিবার-রবিবার বৈঠক বসত সেখানে, তারও চৌকাঠ মাড়াল না।

কি হল হে তোমার বন্ধুর? আর আসে না কেন? ভালো আছে তো? রাম দত্তকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

রাম দত্ত কিছুই জানে না। খোঁজ নিয়ে জানল ভালোই আছে। তবে যাও না কেন? আমার খুশি।

ঠাকুরের কাছে খবর গেল। তিনি লোক পাঠালেন। মনোমোহন তা গ্রাহ্য করল না। বললে, 'আমাকে তাঁর কি দরকার! তিনি তাঁর ভক্ত নিয়ে সুখে থাকুন। আমি তাঁর কে!'

অভিমানের কথা! আমার যখন ভক্তি নেই তখন আমাকে আবার ডাকা কেন!

বারে-বারে লোক পাঠাতে লাগলেন ঠাকুর, আর বারে-বারেই তাদের ফিরিয়ে দিলে। বিরক্ত হয়ে মনোমোহন কোন্নগরে চলে গেল, সেখান থেকেই আফিস করতে লাগল, যাতে ঠাকুরের লোক তাকে ধরতে না পায়। ঠাকুরও ছাড়বার পাত্র নন। কোন্নগর পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। একদিন পাঠিয়ে দিলেন খোদ রাখালকে।

রাখালকে ফিরে যেতে দিল না মনোমোহন। সঙ্গের লোকটিকে বলে দিল, 'ঠাকুরকে গিয়ে বোলো, ভক্তিহীনকে ডেকে লাভ কি! আগে ভক্তি-টক্তি হোক, তারপর যাব একদিন।'

ক্রোধে পুড়তে লাগল মনোমোহন। বিপরীত আচরণ করছে বটে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ঠাকুরকে ভুলতে পারছে না। মন বসছে না আফিসের কাজে, থেকে-থেকেই ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর। যাকে পরিহার করতে চাইছে সর্বক্ষণ তারই উপর অভিনিবেশ!

যেমন কংসের অবস্থা। পান-ভোজন, ভ্রমণ-শয়ন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সর্ব সময়েই দেখছে চক্রধারীকে। কেশাকর্ষণ করে উচ্চ মঞ্চ থেকে ফেলছেন নিচে তখনো শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে অপলক চোখে। দেখতে-দেখতে তাঁরই দুষ্প্রাপ্য রূপ প্রাপ্ত হচ্ছে।

তেমনি মনোমোহনেরও সব সময়ে মনোমোহনদর্শন। বৈমুখ্যের জন্যে সব সময়েই অভিমুখিতা। বৈরূপ্যের জন্যে সব সময়েই সারূপ্য। যাকে সরিয়ে দিতে চাই বারে-বারে তারই কাছটিতে গিয়ে বসা। যাকে এড়িয়ে যেতে চাই তাকেই জড়িয়ে ধরা।

অশান্ত মনে দিন কাটছে মনোমোহনের। একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়েছে, দেখল সামনে একখানি নৌকো। তাতে বলরাম বোস বসে। বলরামকে দেখে নমস্কার করল মনো-মোহন। বলল, 'কি সৌভাগ্য আমার! সকালেই ভক্তদর্শন।'

কথার সুরে কি সেই পুরোনো অভিমানের ঝাঁজ রয়েছে লুকিয়ে?

হাসিমুখে বলরাম বললে, 'শুধু ভক্ত নয়, গুজরত খোদ এসেছেন।'

কে, ঠাকুর? কোথায় তিনি? নৌকোর দিকে ফের চোখ পড়ল। কোথায়? ও তো নিরঞ্জন!

হ্যাঁ, নিরঞ্জনই তো! নিরঞ্জন বললে, 'আপনি যান না কেন দক্ষিণেশ্বর? আপনি যান না বলে ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে এসেছেন আপনার কাছে।'

এসেছেন? কোথায় তিনি? ঐ যে নিরঞ্জনের পাশটিতে বসে আছেন লুকিয়ে।

ওরে, না এসে কি পারি? তুই যে সর্বক্ষণ আমাকে ডাকছিস। তুই যে আমাকে দূরে রাখছিস ঐ তো তোর আমাকে কাছে ডাকা। ঠেলে দিচ্ছিস বারে-বারে ঐ তো তোর আমাকে কাছে টানা। আমাকে তুই আর বসে থাকতে দিলি কই?

ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। জলের মধ্যেই মনোমোহন ছুটল তাঁর দিকে। জলের মধ্যেই প্রায় টলে পড়ে—ধরে ফেলল নিরঞ্জন। টেনে তুলল তাকে নৌকোয়। ঠাকুরের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

আমি তোমাকে চাইনি, কিন্তু, আশ্চর্য, তুমি আমাকে চেয়েছ। আমি তোমাকে পিছনে ফেলে পালাতে চেয়েছি, কিন্তু, আশ্চর্য, সামনেই আবার তুমি দাঁড়িয়ে। পাশ কাটিয়ে

চলে যেতে চেয়েছি, তুমি নিজেই কখন ধরা দিয়েছ। তোমাকে চাই না, এ কথা বললেও তুমি ছাড়ো না। তোমার কাছে না গেলেও তুমি আস। না ডাকলেও খুঁজে বার করো। বারে-বারে হেরে গিয়ে জয়ী হও। তোমার সঙ্গে পারি এমন সাধ্য কি!
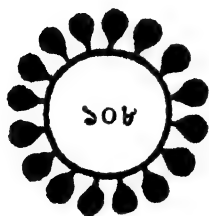
রসিকের কথা মনে আছে? সেই রসিক মেথর? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ঝাড়ুদার? পঞ্চবটীর কাছটায় ঝাঁট দিচ্ছে, ঠাকুর যাচ্ছেন ঝাউতলার দিকে। পিছনে গাড়ুহাতে রামলাল। ঠাকুরকে দেখে সরে গেল রসিক। কে জানে যদি অশুচি ধূলির দূষিত স্পর্শ তাঁর গায়ে লাগে। ফেরবার সময় সরল না। কোমরের গামছাখানি খুলে গলায় জড়ালে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে ঠাকুরকে।

ঠাকুর হাসিমুখে শুধোলেন, 'কি রে রসিক, ভালো আছিস তো?'

'বাবা, আমরা হীন জাত, হীন কর্ম করি, আমাদের আবার ভালো কি!' হাত জোড় করে বললে রসিক!

মথুরবাবু ছাড়া আর কেউ বাবা বলতে পায়নি এতদিন। মথুরবাবুর পরে এই আবার রসিক মেথর। তার বাবা-ডাক মেনে নিলেন সস্নেহে। কিন্তু সতেজে বলে উঠলেন, 'হীন জাত কি! তোর ভেতরে যে নারায়ণ আছেন। নিজেকে জানতে পাচ্ছিস না তাই হীন মনে করছিস—'

'কিন্তু কর্ম তো হীন।'

'কি বলিস! কর্ম কি কখনো হীন হয়?' ঠাকুর আবার বললেন তেজী গলায়: 'এইখানে মায়ের দরবার, দ্বাদশ শিবের দরবার, রাধাকান্তের দরবার, কত সাধুসজ্জন আসছে-যাচ্ছে, তাঁদের পায়ের ধুলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ঝাঁট দিয়ে সেই ধুলো তুই তোর গায়ে মাখছিস! কত পবিত্র কর্ম। কত ভাগ্যে এ সব মেলে বল্ দেখি।'

রসিক যেন আশ্বস্ত হল। বললে, 'বাবা, আমি মুখ্খু, তোমার সঙ্গে তো কথায় পারব না। কে বা পারবে তোমার সঙ্গে? শুধু একটা কথা তোমাকে জিগগেস করি। বাবা, আমার গতিমুক্তি হবে তো?'

ঠাকুর চলে যাচ্ছেন, যেতে-যেতে বললেন, 'হবে, হবে। বাড়ির উঠোনে তুলসী-কানন করে সন্ধ্যেবেলায় হরিনাম করবি, কোনো ভয় নেই।'

এ যেন স্থির হয়ে ঠিক বললেন না। কে জানে হয়তো বা স্তোক দিয়ে গেলেন।

রসিক পিছু নিল। প্রলুব্ধের মত জিগগেস করলে, 'বাবা, সত্যি আমার গতিমুক্তি হবে?'
এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন ঠাকুর। বললেন, 'হবে হবে হবে। শেষ সময়ে হবে।'
ঠাকুরের অপ্রকট হবার পর দু বছর কেটে গেছে। একদিন কাজে রসিক না এসে এসেছে তার স্ত্রী। রামলাল জিগগেস করলে, 'কি রে রসকে এল না কেন?'
'বাবাঠাকুর, তার খুব জ্বর।'
পরদিন আবার রসিকের স্ত্রী এলে রামলাল কুশল-প্রশ্ন করল। রসিকের স্ত্রী বললে, 'ভালো নয়। চার টাকা ভিজিট দিয়ে ভালো ডাক্তার আনা হয়েছিল। কিন্তু এমনি জেদ, ওষুধ কিছুতেই খাবে না। আমাকে বললে ঠাকুরবাড়ি থেকে চন্নামৃত নিয়ে আয়। চন্নামৃতই আমার ওষুধ।'
রামলাল চরণামৃত দিল। কালকে আবার কেমন থাকে না জানি।
মেথরপাড়ার মোড়ল এই বুড়ো রসিক। কাঁচড়াপাড়ার কর্তাভজার দল থেকে দীক্ষা নিয়েছে। তুলসী-মালা জপ করে। ঠাকুরের কথা শুনে বাড়ির আঙিনায় কানন করেছে তুলসীর। মেথরদের সব ছেলে-বুড়ো নিয়ে রোজ সন্ধ্যেবেলা কীর্তন করে। হরি-নামের তুফান তোলে।
ভর দুপুরবেলা সেদিন হঠাৎ স্ত্রীকে হুকুমজারি করলে, 'আমাকে তুলসীতলায় নিয়ে চলো।'
সে কি কথা? স্ত্রী তো স্তম্ভিত!
'ছেলেদের ডাকো। আমার এখন শরীর যাবে।'
'তুমি তো এখন দিব্যি ভালো আছ—' স্ত্রী প্রতিবাদ করল।
'যা বলছি তাই শোনো। ছেলেদের ডাকো। তুলসীতলায় মাদুর বিছিয়ে শুইয়ে দাও আমাকে।'
একবার জেদ ধরলে কিছুতেই টলানো যায় না। ছেলেরা জোয়ান, রোজগেরে। বাপের কথায় ছুটে এল। ধরাধরি করে বের করে শুইয়ে দিল তুলসীতলায়। খাড়া রোদের মধ্যে।
'আমার জপের মালা নিয়ে আয়।' বললে রসিক। স্বাভাবিক সুস্থ কণ্ঠস্বর।
জপ করতে-করতে হঠাৎ যেন কি দেখতে লাগল তীক্ষ্ণ চোখে। সমস্ত রৌদ্রে যিনি ছায়াময় ও সমস্ত ছায়ায় যিনি জ্যোতির্ময় তিনি যেন দাঁড়িয়েছেন সামনে। তৃপ্তির একটি সচেতন লাবণ্য ফুটে উঠল মুখমণ্ডলে। বললে, 'কি বাবা এয়েছ? তাই বলি, এয়েছ? আহা কি সুন্দর, কি সুন্দর!' টান-টান শ্বাস কিছু হল না। বলতে-বলতে গভীর প্রশান্তিতে চোখ বুজল।
নীলকণ্ঠ মুখুজ্জে গান শোনাতে আসে ঠাকুরকে। কী সুস্বন সে গান! যে শোনে সেই মজে।
'আহা, নীলকণ্ঠের গান কী চমৎকার!' বলছেন শ্রীমা : 'ঠাকুর বড় ভালোবাসতেন। কি আনন্দেই তখন ছিলাম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত। দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।'

তাঁর ঘরে মেঝেতে মাদুরের উপর বসে আছেন ঠাকুর। দীননাথ খাজাঞ্চিও দর্শন করতে এসেছে। পাঁচ-সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঘরে ঢুকল নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ না সুধাকণ্ঠ।

তাকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'আমি ভালো আছি।'

সেই ভালোটিই তো চাই। নীলকণ্ঠ যুক্তকরে বললে, 'আমায়ও ভালো করুন। এই সংসারে পড়ে রয়েছি।'

'পাঁচজনের জন্যে তিনি রেখেছেন তোমাকে সংসারে।'

পাঁচজনের সেবাতেই তো ঈশ্বরপূজা। তিনি কাজের মধ্য দিয়ে পূজা নিচ্ছেন। কাজ যেমন হোক, পূজা ঠিকই হচ্ছে। বলো এ তাঁর সংসার। যাদের সেবা করছি তারা তাঁরই প্রতিনিধি।

'তুমি যাত্রাটি করেছ, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'তুমি যদি এখন ছেড়ে দাও তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথায় যাবেন?'

ঠিকই তো। আমাকে দিয়ে কতগুলো লোকের ভরণপোষণ হচ্ছে। এ দিয়েই আমি ঈশ্বরের সাধন-ভজন করছি। যাকে দিয়ে তিনি যা করাবেন তাতেই তাঁর তুষ্টি। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।

'তোমাকে দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর যেমন খুশি। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না।' আবার বলছেন রামকৃষ্ণ, 'গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে নাইতে যায়। তখন শত ডাকাডাকি করলেও ফেরে না।'

নীলকণ্ঠ বললে, 'আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

'যেকালে তাঁর নাম করতে তোমার চোখ জলে ভেসে যায় সেকালে আর তোমার ভাবনা কি? তাঁর উপরে তোমার যে ভালোবাসা এসেছে।'

শুধু ঐটিই তো মন্ত্র। ভালো হও আর ভালোবাসো। ভালো হতে পারলেই ভালো-বাসবে। কিংবা ভালোবাসতে পারলেই ভালো হবে।

'তোমার ও গানটি বেশ। শ্যামাপদে আশনদীর তীরে বাস।' বলছেন ঠাকুর, 'পদে যদি নির্ভর থাকে তা হলেই হল। তাই বলে চুপ করে থাকলে চলবে কি? ডাকতে হবে, কাজ করতে হবে। উকিল সওয়াল শেষ করে শেষে বলে, আমি যা বলবার বললাম, এখন হাকিমের হাত।'

সকালে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে কীর্তন করে এসেছে নীলকণ্ঠ। সেখানে গিয়েছিলেন ঠাকুর। তবু আবার এসেছে বিকেলে। শত কথাবার্তার মধ্যেও এই অনুরাগের অঙ্গীকারটুকু রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। শেষকালে বললেন, 'তুমি সকালে এত গাইলে। আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু "অনারারি"।'

'কি বলেন!' নীলকণ্ঠ অভিভূতের মত বললে, 'আমি এখান থেকে অমূল্য রতন নিয়ে যাব।'

'সে অমূল্য রতন নিজের কাছে। না হলে তোমার গান অত ভালো লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তাঁর গান অত মধুর। জানো তো, সাধারণ জীবকে বলে মানুষ, যার চৈতন্য হয়েছে সে মানহুঁস। তুমি সেই মানহুঁসের দলে।'

মাস্টারমশায়ের সঙ্গে হরিবাবু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সন্ধ্যা সাতটা-আটটা। ছোট খাটটিতে মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করছেন। ওরা এসে মেঝের উপর প্রণাম করে বসতেই ঠাকুর মশারির বাইরে এলেন। বললেন, 'কে বা ধ্যান করে, কারই না ধ্যান করি! যাই বলো তিনি ধ্যান করালেই তবে হবে। তুমি নিজের ইচ্ছেয় করো তোমার সাধ্য কি।'

'ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।' হরিবাবুর দিকে ইশারা করল মাস্টার : 'এঁর অনেকদিন পত্নীবিয়োগ হয়েছে, প্রায় এগারো বছর।'

'তুমি কি কর গা?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হরিবাবুর হয়ে মাস্টারই বললে, 'একরকম কিছুই করেন না। তবে বাপ-মা ভাই-ভগ্নীর সেবা করেন।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে কি গো, তুমি যে সেই কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর হলে। না সংসারী না হরিভক্ত। এ কেমনতরো কথা?'

বাড়িতে একরকম পুরুষ থাকে জানো, নিষ্কর্মা হয়ে বসে কেবল ভুড়ুর-ভুড়ুর করে তামাক খায় আর মেয়েছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। কাজের মধ্যে মাঝে-মাঝে কুমড়ো কেটে দেওয়া। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই বড়ঠাকুরকে ডেকে আনায়। বলে কুমড়োটাকে দুখান করে দিন। বড়ঠাকুর তাই করে দেয় খুশি হয়ে। তার ঐ পর্যন্ত পৌরুষ। তাই তার নাম হয়েছে কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর।

'আমি বলি তুমি এও কর ওও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ করে যাও।'

শুধু কাজ করলে হবে না, কাজের সামনে একটি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন কাজ করছি, কিসের জন্যে, রাখতে হবে সেই একটি চেতনার উজ্জ্বলতা। ফলের জন্যে লাভের জন্যে জয়ের জন্যে কাজ করছি না, কাজ করছি তিনি কাজে লাগিয়েছেন বলে। আফিসের বড়বাবু তো চাকরি দেননি, চাকরি দিয়েছেন ঈশ্বর। তাই আফিসের বড়বাবুকে ফাঁকি দিয়ে আমার সুখ কই? সেই সর্বতশ্চক্ষু ঈশ্বরকে তো ফাঁকি দিতে পারব না। তাঁর কাজ তিনি বুঝে নেবেন, আমি শুধু করে যাই। যে পার্টে নামিয়েছেন অভিনয় করে যাই নিখুঁত করে। বাহবা পাই না পাই কিছু এসে-যায় না। তাঁর দেওয়া পার্টটি তো করলাম জীবন ভরে—এই আমার সন্তোষ। আমি না হলে তাঁর এই বৃহৎ নাটক যে সম্পূর্ণ হত না, তাই আমার পার্টে তাঁরও তৃপ্তি। কর্ম করতে-করতেই মনের ময়লা কেটে যাবে। আর মনের ময়লা কাটলেই দেহ পরিশুদ্ধ হবে।

ঐ দেখ না, সেদিন শ্রীরাম মল্লিক এসেছিল, তাকে ছুঁতে পারলাম না।

শ্রীরামের সঙ্গে ঠাকুরের খুব ভাব ছিল ছেলেবেলায়। একে-অন্যের অদর্শনে অস্থির হয়ে পড়ত। এত গলায়-গলায় ভাব, লোকে বলত এদের ভিতর একজন মেয়ে হলে এদের বিয়ে হয়ে যেত। তাকে এখন দেখবার জন্যে ঠাকুরের খুব আগ্রহ। কতবার লোক পাঠিয়েছেন তার জন্যে তার ঠিক নেই।

একদিন এসে উপস্থিত শ্রীরাম। ছেলেপিলে হয়নি; একটি ভাইপো মানুষ করেছিল

সেটি মরে গেছে। কেঁদে আকুল হল ভাইপোর জন্যে। কিন্তু শোকাগ্নিতে পুড়েও পবিত্র হয়নি দেহ।
'ছুঁতে পারলাম না।' বললেন ঠাকুর, 'দেখলাম তাতে আর কিছু নেই।'
সংসারে থাকব না তো যাব কোথায়? যেখানে থাকি রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ-সংসারই রামের অযোধ্যা। গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর রাম বললে, আমি সংসার ত্যাগ করব। দশরথ তাকে অনেক বোঝালো, রাম নিবৃত্ত হল না। তখন বশিষ্ঠকে পাঠাল দশরথ। বশিষ্ঠ দেখলে রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বশিষ্ঠ রামকে বললে, আগে আমার সঙ্গে বিচার করো, তোমার জ্ঞানের বহরটা একবার দেখি, তারপর যেথা ইচ্ছা চলে যাও। রাম বললে, বেশ, বলুন, কিসের বিচার? তখন বশিষ্ঠ বললে, আচ্ছা বলো, সংসার কি ঈশ্বরছাড়া? যদি ঈশ্বরছাড়া হয়, তুমি এ দণ্ডে তা ত্যাগ করো। রাম দেখল, ঈশ্বরই জীবজগৎ হয়েছেন। তাঁর সত্তাতেই সমস্ত কিছু সত্য হয়ে রয়েছে। তখন সে নিবৃত্ত হল।
'সংসারে রেখেছেন তা কী করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো।' বললেন ঠাকুর : 'সংসারেই থাকো আর অরণ্যেই থাকো ঈশ্বর শুধু মনটি দেখেন।'
কলঙ্কসাগরে ভাসো কলঙ্ক না লাগে গায়।
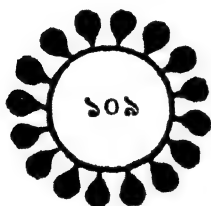
ওরে যোগীন, যা তো, গিরিশের বাড়ি যা। আমার জন্যে একটা বাতি চেয়ে নিয়ে আয়। আমার বাতি ফুরিয়ে গেছে। আর শোন—ঠাকুর পিছু ডাকলেন। আর দেখে আয় সে কেমন আছে।
কে গিরিশ ঘোষ? ওই যে থিয়েটার করে! ওই যে মাতালের সর্দার! বাতি আনতে তার কাছে? কোথায় দক্ষিণেশ্বর, কোথায় বাগবাজার! কাছে-পিঠে কেউ কি রাখে না মোমবাতি?
কিন্তু উপায় নেই, ঠাকুরের হুকুম।
চলো বাগবাজার। বাড়ি নেই গিরিশ, কোথায় গিয়েছে নেমন্তন্ন খেতে। তবে আর কি, বসে থাকো। এই যে, ফিরেছে, কিন্তু এ কি চেহারা? টলছে, নেতিয়ে পড়ছে।
'কে হে তুমি? চাই কি?'
'আমাকে ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'ঠাকুর! আহা, ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন!' ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করল গিরিশ।
'পাঠাবেন না? না পাঠিয়ে কি পারেন? গিরিশের জন্যে যে তাঁর মন পোড়ে।'
'একটা বাতি চেয়েছেন আপনার কাছে—'
'আহা, কি দয়া! একটা বাতির জন্যে এত দূরে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে?' দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে গড় করে প্রণাম করল এবার। 'একটা কেন, এক বাণ্ডিল নিয়ে যাও।'
বলে উঠেই গালাগাল! সে আরেক মূর্তি। তুমি বাতি চাইবার আর জায়গা পাওনি? কেন, তোমার বরানগর-আলমবাজারে বাতি মেলে না! একেবারে আমার বাড়ি ধাওয়া করেছ! তুমি কোথাকার জমিদার, পেয়াদা পাঠিয়েছ সমন দিয়ে! আমি কি তোমার বাস্তুবাড়ির প্রজা, না, তুমি আমার মহাজন? বলেই খেউড় শুরু করল। মাতালের পাঁচফোড়ন।
বাতি একটা ছুঁড়ে দিল যোগেনের দিকে। নিয়ে যাও। অন্ধকারে আছে, একটু আলো জ্বালানো মন্দ নয়। আলোর অভাব বলেই তো এই দুর্দশা!
আবার গালাগাল।
বাতি নিয়ে ছুট দিল যোগেন। কি বদ্ধ মাতাল রে বাবা! লাফিয়ে পড়ে কামড়ায়নি যে বড়, এই ভাগ্যি।
'কি এক ত্রেপণ্ড মাতালের কাছেই পাঠিয়েছিলেন—'
'কেন, কি হল?' প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর।
'খালি গালাগালি, খালি খিস্তি-খেউড়।'
'কাকে?'
'আর কাকে! আপনাকে।'
এতটুকুও লাগল না ঠাকুরকে। বললেন, 'শুধু গালই দিলে, আর কিছু করলে না?'
'আপনার কথা বলতে প্রথমে প্রণাম করেছিল, উত্তর দিকে মুখ করে কি-সব বলছিল বিড়-বিড় করে, আর মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করছিল বার-বার—'
'তবে?' উল্লসিত হলেন ঠাকুর। 'তুই শুধু তার মন্দটা দেখলি, ভালোটা দেখলিনে? গালাগাল শুনলি, শুনলিনে তার ভক্তির মন্ত্র? টলে-পড়া দেখলি, দেখলিনে তার নুয়ে-পড়া?'
তাই তো দেখি সর্বক্ষণ। কার কোথায় ত্রুটি, কার কোথায় ন্যূনতা। আমরা ত্বকসর্বস্ব, অন্তঃসারের খবর নিই না। যেমন আমরা লোক তেমনি আমাদের বিচার। আধ-গ্লাশ জল কাছে থাকলে যে দোষদর্শী সে বলে, দেখলে? জল দিলে তো গ্লাশটা ভরতি করে দিলে না! আর যে গুণগ্রাহী সে বলে, আহা কি ভালো, অন্তত আধ-গ্লাশ তো দিয়েছে!
কুব্জার মধ্যে কী দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ? দেখলেন অনবদ্যাঙ্গী গৃহাঙ্গনা।
রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন, বক্রদেহা এক যুবতীর সঙ্গে দেখা। হাতে অঙ্গ-বিলেপের পাত্র। শ্রীকৃষ্ণ জিগগেস করলেন, তোমার নাম কি? এই বিলেপন কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ?

কুব্জা বললে, আমার নাম ত্রিবক্রা, আমি কংসের প্রধানা অঙ্গলেপন-দাসী।
'এ লেপন আমাকে দাও।' কৃষ্ণ হাত বাড়ালেন : 'আমাকে দিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হবে।'
এক মুহূর্ত দ্বিধা করল কুব্জা। এ লেপন কংসের অতি কামনীয়, কিন্তু এ রসিক-শেখর পথিকের মত যোগ্যতর অধিকারী আর কে আছে? শুধু হাতের পাত্রের নয়, যেন প্রাণপাত্রের সমস্ত চন্দনলেপন দিয়ে দিল পথিককে।
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হল ঐ কুব্জা যুবতীকে সরলাঙ্গী করে দিই। যেহেতু প্রাণের সরলতাটি আমায় দিয়েছে তখন আর তো ওর বাঁকা থাকবার কথা নয়। আমি ওকে ঋজু করে দিই।
কুব্জার দু পায়ের উপর নিজের দু পা রাখলেন শ্রীকৃষ্ণ। দু আঙুল দিয়ে তার চিবুক ধরে তার মুখখানি ঠেলে তুললেন উপরের দিকে। মুকুন্দস্পর্শে গরীয়সী কুব্জা মুহূর্তে উন্নতদর্শনা হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ করে বললে, 'হে বীর, আমার গৃহে চলো। তুমি আমার চিত্ত মথিত করেছ, তোমাকে কিছুক্ষণ আমার অতিথি হতেই হবে।'
শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে সুভ্রূ, আমি লোকদুঃখ মোচন করতে এসেছি। সে ব্রত সাঙ্গ হলে আসব তোমার ঘরে। আমি গৃহশূন্য পথিক, আর তোমার ঘর ঘরছাড়াদের আশ্রয়।'
'মা, তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পারি না।' আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন ঠাকুর।
'আমি নিতান্ত পাষণ্ড।' করজোড়ে বলছে গিরিশ, 'কত গালাগাল দিই আপনাকে।'
'বেশ করো। গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো তুমি—তা হোক, ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভালো।' অভয়ানন্দ ঠাকুর বললেন উদারস্বরে, 'উপাধিনাশের সময়ই শব্দ হয়। পোড়বার সময় চড়চড় শব্দ করে কাঠ। পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।'
'কি উপায় হবে আমার?'
'তুমি দিন-দিন শুদ্ধ হবে, দিন-দিন উন্নত হবে। লোকে দেখে অবাক মানবে।' বলে মা'র দিকে তাকালেন। 'মা, যে ভালো আছে তাকে ভালো করতে যাওয়ায় বাহাদুরি কি! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া আছে তাকে মারতে পারো তবে তো তোমার মহিমা!'
নরেন এসে প্রণাম করে বসল। বসল মেঝের উপর, মাদুরে।
'হ্যাঁ রে, ভালো আছিস? তুই নাকি গিরিশ ঘোষের কাছে প্রায়ই যাস?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, যাই মাঝে-মাঝে। সব সময় আপনার চিন্তায় মাতোয়ারা। মুখে কেবল আপনার কথা।'
'কিন্তু রশুনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। যেন কাকে-ঠোকরানো আম। দেবতাকেও দেওয়া হয় না, নিজেরও সন্দেহ।' বললেন ঠাকুর, 'ওর থাক আলাদা। যোগও আছে ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব। নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, আবার রামকেও লাভ করবে।'

'কিন্তু আগেকার সব সঙ্গ ছেড়েছে গিরিশ।'
কিন্তু সংস্কার যাওয়া কি সোজা কথা? সেই যে একজায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে, একটি স্ত্রীলোক সেখান দিয়ে চলে গেল। সকলেই ঈশ্বরধ্যান করছে, একজন হঠাৎ আড়চোখে দেখে নিলে। কি করবে, তিনটি ছেলে হবার পর সে সন্ন্যাসী হয়েছিল। সংস্কারের অসীম ক্ষমতা। রাজার ছেলে, পূর্বজন্মে জন্মেছিল ধোপার ঘরে। রাজার ছেলে হয়ে যখন খেলা করছে, সমবয়সীদের বলছে, 'ও সব খেলা থাক, আমি উপুড় হয়ে শুই, তোরা আমার পিঠে হুস-হুস করে কাপড় কাচ্।'
'বাবুই গাছে কি আম হয়?' বললেন ঠাকুর। 'কে জানে, হতেও পারে। তেমন সিদ্ধাই থাকলে বাবুই গাছেও আম ধরে।'
কর্মাগ্নিতে অঙ্গার হীরক হয়। কাম প্রেম হয়। শুষ্ক তরুতে ফুল ধরে। তোমার কৃপার বাতাসটুকু যদি গায়ে লাগে, আমি অশত্থ বৃক্ষ, আমিও চন্দনতরু হয়ে যাব।
দৈব না পুরুষকার? কে না জানে, দুইই দরকার। শুধু একচাকায় কি রথ চলে, না এক দাঁড়ে নৌকো? শুধু পাল তুললেই তো হয় না, লাগসই হাওয়াটি চাই। মাঠে বীজ পুঁতলেই কি হবে? চাই সলিলসিঞ্চন।
কিন্তু এ দৈব কি? একটা নির্বুদ্ধির খামখেয়াল? যারা জড়, অবিবেকী ও ভীরু তারাই দৈব মানে। আমরা পুরুষসিংহ, আমরা পৌরুষ মানি, বিশ্বাস করি প্রযত্নে। আমরা মাটি খুঁড়ে ফসল ফলাই। যুদ্ধে জিতে ছিনিয়ে আনি রাজমুকুট।
সাধ্য কি শুষ্ক পৌরুষে সিদ্ধি পাই। কত শক্তিমান কৃতী লোক প্রাণপণ প্রযত্ন করছে, কত দুর্নিবার নিষ্ঠা, তবু কিছুতে কিছু হচ্ছে না। বিন্দুমাত্র কুলোচ্ছে না পৌরুষে। আবার কত অধম লোক কত অক্লেশে সফলকাম হচ্ছে। এ রহস্যের মানে কি? এর মানে হচ্ছে দৈব। প্রাক্তন বা পূর্বজন্মের কর্মের নামই দৈব। তাই দৈব আর কিছুই নয়, পূর্বকৃত পুরুষকার। এক কথায় প্রারব্ধ।
প্রারব্ধ দিয়ে তৈরি হল আমার ইহজন্মের পরিবেশ। ইহজন্মের পুরুষকার দিয়ে খণ্ডন করব সে পরিমণ্ডল। ব্যর্থ করব সে অদৃষ্টের বিধিলিপি।
যেমন বিশ্বামিত্র করেছিল।
চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়ে পৃথিবীভ্রমণে বেরিয়েছিল, উপনীত হল বশিষ্ঠের আশ্রমে। সসৈন্য ক্ষত্রিয়রাজাকে যোগ্য অভ্যর্থনা করতে পারে এমন সামর্থ্য নেই সেই নিঃসম্বল ঋষির—এমনি মনে হল বিশ্বামিত্রের। তবু আতিথ্য নেবার জন্যে বারে-বারে অনুরোধ করতে লাগল বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র রাজী হল, কিন্তু এই বিপুল বাহিনীকে বশিষ্ঠ খাওয়াবে কি? ভাঁড়ে তো মা-ভবানী।
বিচিত্রবর্ণা কামধেনুকে আহ্বান করল বশিষ্ঠ। বললে, শবলা, অতিথি-সৎকারের খাদ্য দাও।
কামদায়িনী শবলা ভূরি-ভূরি খাদ্য-সৃষ্টি করল। দেখে তো বিশ্বামিত্রের চক্ষু স্থির, যে করে হোক লাভ করতে হবে এই কামদুঘাকে। বললে, 'রত্নে রাজারই অধিকার। অতএব এই রত্ন আমাকে দান করুন। বিনিময়ে যা কিছু চান ধেনু বা ধন দিচ্ছি আপনাকে।'

অসম্ভব! এই শবলা থেকেই আমার হব্য কব্য, আমার প্রাণযাত্রা। শত কোটি ধেনু বা রাশীভূত রজত শবলার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কিছুতে রাজী হল না বশিষ্ঠ। তখন বিশ্বামিত্র সবলে টেনে নিয়ে চলল শবলাকে। বশিষ্ঠকে উদ্দেশ করে সরোদনে বললে শবলা, 'আপনি কি আমাকে ত্যাগ করলেন?'

আমি কি করব। এই বলোদ্ধত রাজা তোমাকে স্পর্ধাপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে এর অক্ষৌহিণী সেনা। এর তুলনায় আমি কিছুই নয়। আমি নির্বল, নিস্তেজ।

কে বলে? আপনিই অধিক বলবান। ক্ষত্রবলের চেয়ে ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ। 'অনুমতি করুন,' শবলা বললে দৃপ্তস্বরে, 'আমি সৈন্য সৃষ্টি করি। বিধ্বস্ত করি এই দুর্বৃত্তকে।'

তথাস্তু। মুহূর্তে অগণন সৈন্য-সৃষ্টি করল শবলা। বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য নির্জিত ও বিনষ্ট হল। শুধু তাই নয়, শতপুত্র মারা পড়ল একে-একে।

এ কী বিপর্যয়! নির্বেগ সমুদ্র, রাহুগ্রস্ত সূর্য ও ভগ্নদন্ত সাপের মত নিষ্প্রভ হল বিশ্বামিত্র। তখনো একটিমাত্র পুত্র বেঁচে আছে, তাকে রাজ্য দিয়ে চলে গেল হিমালয়ে। বসল শিবারাধনায়। কি বর চাও, তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব দেখা দিলেন। দিব্যাস্ত্র দাও, ত্রিজগতে যত অস্ত্র আছে, সব আনো আমার অধিকারে।

মহাদেব বর দিলেন।

আর যায় কোথা! মহাবলে ধাবিত হল বিশ্বামিত্র। অস্ত্রানলে বশিষ্ঠের আশ্রম দগ্ধ করতে লাগল। আশ্রমবাসীরা পালাতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে। ভয় পেয়ো না, রৌদ্র যেমন শিশির ধ্বংস করে, তেমনি আমি বিশ্বামিত্রকে শেষ করছি। বলে বশিষ্ঠ তার দণ্ড উত্তোলন করল। তার ব্রহ্মতেজপূর্ণ উদ্দণ্ড দণ্ড। যত অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল বিশ্বামিত্র, ঐন্দ্র আর রৌদ্র, বারুণ আর পাশুপত, সব নিক্ষেপ করল একে-একে। কিছুতেই কিছু হবার নয়। বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ড সমস্ত অস্ত্র নিরাকৃত করল, নির্বাপিত করল সমস্ত কালানল।

ক্ষান্ত হোন, মুনি-ঋষিরা স্তব করতে লাগল বশিষ্ঠকে। বিশ্বামিত্র হতমান হয়েছে, বশীকৃত হয়েছে, স্তব্ধ হয়ে বসেছে অধোমুখে। আপনি আপনার দণ্ড সংবরণ করুন।

বিশ্বামিত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ক্ষাত্রিয়বলকে ধিক, ব্রহ্মতেজই বল। তাই এক ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র পরাজিত হল। এই ক্ষাত্রিয়ত্ব পরিহার করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করব তবে আমার নাম।

দুশ্চর তপস্যায় আরূঢ় হল বিশ্বামিত্র। চিত্তমল বিশোধিত হল। কাম ক্রোধ লোভ অনেক উপকরণ আসতে লাগল সামনে। বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ধীরে-ধীরে উপনীত হল ব্রহ্মর্ষি পদবীতে।

দেবতারা অভিনন্দন করে বললে, তীব্র তপস্যা দ্বারা তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছ। এস দীর্ঘ আয়ু গ্রহণ করো।

একেই বলে পুরুষকার। প্রারব্ধনির্দিষ্ট গতি বদলে দিল পৌরুষপ্রাবল্যে। দুস্ত্যজ প্রকৃতিকেও অতিক্রম করলে তপস্যায়।

'তোমার প্রকৃতিতে তোমার কর্ম করাবে।' বললেন ঠাকুর, 'ভগবান অর্জুনকে বলছেন তুমি ইচ্ছে করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না। তোমায় যুদ্ধ করাবে তোমার প্রকৃতিতে। তা তুমি ইচ্ছে করো আর নাই করো। আমি চিন্তা করছি আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম। আমার দান-যজ্ঞ এও কর্ম। নামগুণকীর্তনও কর্ম। কিন্তু যাই করো, ফল আকাঙ্ক্ষা করে কোরো না।'

মৃগ না মিলুক তবু ফিরব না মৃগয়া থেকে। মৃগয়ায় যে বেরুতে পেরেছি সেই আমার পরম লাভ।
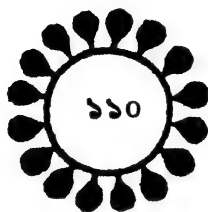
দেবেন মজুমদারও নরেনের মত ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে চায়। ঘর ফাঁকা দেখে কখন ঠাকুরের বিছানার নিচে ছোট্ট একটি রুপোর দু-আনি রেখে দিয়েছে।

বসতে গিয়ে উঠে পড়লেন ঠাকুর। আবার চেষ্টা করলেন বসতে, আবার উঠে পড়লেন।

'এ কি, এমন হচ্ছে কেন?' জিগগেস করলেন ঠিক দেবেন মজুমদারকেই। 'ছুঁতে পাচ্ছি না কেন বিছানা?'

পরীক্ষকই ধরা পড়ে গেল। পাংশুমুখে স্বীকার করলে অপরাধ।

কিন্তু ঠাকুরের কোনো গ্লানি নেই। হাসিমুখে বললেন, 'আমায় বিড়ে দেখছ নাকি? তা বেশ, বেশ।'

তবু আরো এক পরীক্ষা বুঝি বাকি আছে।

ঠাকুর নিজেই পাড়লেন সেই কথা। বললেন, 'ওগো, মন বড় কেমন করছে। অনেক দিন দেখিনি তাকে।'

কাকে? দেবেন তাকাল কৌতূহলী হয়ে।

ঠাকুর তার নাম করলেন। এ কি, এ যে স্ত্রীলোক! একজন স্ত্রীলোকের প্রতি ঠাকুরের টান! দেবেনের মন কালো হয়ে উঠল।

'ওরে রামনেলো, রসগোল্লা নিয়ে আয়। খিদে পেয়েছে।'

অনেকগুলো নিয়ে এল রামলাল। একটি নিজে খেয়ে বাকিগুলো খাওয়ালেন দেবেনকে। বললেন, 'এ সব সে-ই পাঠিয়েছে। এখানকে বড় ভালোবাসে। বড় ভালো লোক।'

মুখের স্বাদে যেন আর মিষ্টতা নেই এমনি মনে হল দেবেনের। এ কেমনধারা আকর্ষণ।
'ওগো, তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।' ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর পাইচারি শুরু করেছেন। সহসা ঝুঁকে পড়ে দেবেনের কানের কাছে মুখ এনে বললেন চুপি-চুপি, 'আমাকে একটি টাকা দেবে?'
টাকা? কেন?
'গাড়ি না হলে যেতেও পারি না, আবার গাড়ি করে গেলে তার ছেলে গাড়িভাড়া দিতে মনে বড় কষ্ট করে। তাই তোমার কাছকে চাইছি। তুমি যদি দাও তবে একবার দেখে আসি।'
তার আর কি! দেব না-হয় যখন চাইছেন।
দেবেনের ভঙ্গি দেখে হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'কিন্তু বলো আবার লিবে। কি, আবার লিবে তো?'
তা বেশ মশাই, শোধ যদি দেন তো নেব। টাকা বের করে রামলালের হাতে দিলে। রামলাল কলকাতা যাবার গাড়ি আনতে গেল।
মাস্টারমশাই ও লাটুর সঙ্গে দেবেনও উঠল গাড়িতে। যাই ব্যাপারটা দেখে আসি স্বচক্ষে।
পথে মন্দির পড়ছে তাকে প্রণাম করছেন ঠাকুর, মসজিদ পড়ছে তাকেও। শুধু তাই নয়, মদের দোকানকেও। কত লোককে এখানেও আনন্দ দিচ্ছেন মহামায়া। মদিরার কথা ভেবে মনে পড়ছে হরিনামের কথা। হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে! যার যাতে নেশা, যার যাতে আনন্দ!
বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। তাদের উদ্দেশেও প্রণাম করছেন ঠাকুর। বলছেন, মা আনন্দময়ী!
দেবেনের গা টিপলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমি কারু ভাব নষ্ট করি না।'
যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে যেন এ কথা বোলো না, আমার ভাবই সত্য আর সব ভুয়ো। যে ভাবই হোক, যদি তা আন্তরিক হয় ঠিক পেয়ে যাবে ঠিকানা।
'বারোয়ারিতে নানা মূর্তি করে, নানান মতের লোকের ভিড়। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম। যারা বৈষ্ণব তারা রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তাদের সামনে সীতারাম। কিন্তু যাদের কোনো ঠাকুরের দিকে মন নেই,' ঠাকুর হাসলেন : 'তাদের কথা আলাদা। বেশ্যা তার উপপতিকে ঝাঁটাপেটা করছে এমন মূর্তিও করে বারোয়ারিতে। ও সব লোক তাই দেখছে হাঁ করে। দেখছে আর চেঁচাচ্ছে। বন্ধুদের ডাকছে, ওসব কি দেখছিস, আয়, এদিকে আয়।'
গাড়ি এসে পেঁছুল বাড়িতে।
ঠাকুর একা অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন।
সন্দেহ বুঝি আরো উগ্র হল দেবেনের। মাস্টারমশাই তখন গান ধরলেন : আমরা

গোরার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে। গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, ভাব বুঝতে নারলুম রে—

কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর আবার ফিরে এলেন। অসমাপ্ত গানের অবশিষ্টটুকু গাইতে লাগলেন। তবু সন্দেহ কি যায়। কালিমা কি ঘোচে!

ভিতর থেকে চাকর এসে আবার ডেকে নিয়ে গেল ঠাকুরকে। কতক্ষণ পরে আবার এল চাকর। এবার আপনারা আসুন।

ভেতরে গিয়ে কী দেখল দেবেন! দেখল আসনের উপর আলুথালু হয়ে ঠাকুর বসে আছেন, যেন পাঁচ বছরের ভোলানাথ ছেলে আর তাঁর সামনে বসে তাঁকে খাওয়াচ্ছেন এক বৃদ্ধা মহিলা, চোখে জল, মুখভাবে বাৎসল্যের লাবণ্য।

'বাবা, চৈতন্যচরিতামৃতে পড়েছিলুম,' বলছে সেই বৃদ্ধা গৃহিণী, 'চৈতন্যদেবের মা চৈতন্যদেবকে খাইয়ে দিতেন নিজের হাতে। আমার মনে হত, আমি যদি শ্রীচৈতন্যের মা হতুম, এমনি করে খাওয়াতুম তাকে। কি আশ্চর্য, আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তুমি এসে উদয় হলে আমার জীবনে!' বলছে আর কাঁদছে অনর্গল।

কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা এসেছিলেন শ্রীমতীর কাছে। ধ্যানস্থা ছিলেন শ্রীমতী। যশোদাকে বললেন, আমি আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে বর নাও। যশোদা বললেন, কি আর বর দেবে! শুধু এইটুকু করো, আমার গোপালকে আমি যেন প্রাণ ভরে সেবা করতে পারি, খাওয়াতে পারি হৃদয়মথিত স্নেহনবনী।

এই তো সেই যশোমতীর মাতৃপ্রতিমা।

কৃষ্ণ বললে, আমাকে অহৈতুকী ভক্তি দাও, অব্যবহিতা ভক্তি। ফলাভিসন্ধিরহিত অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা। কার জন্যে তোমার কাছে তোমার প্রাণ-বুদ্ধি দেহ-মন স্ত্রী-পুত্র এত প্রিয়, কার কৃপায়? যার জন্যে যার কৃপায় এই প্রিয়ত্ববোধ, তার চেয়ে প্রিয়তর আর কে আছে?

এই কি সেই প্রিয়-প্রীণন নয়?

আত্মাধিক্কারে ভরে গেল দেবেন। এ কে নয়নভুলানো দেখা দিলেন চোখের সামনে! চোখে যেন আর পলক পড়তে চায় না। খাবার থালা কে দিয়ে গিয়েছে সুমুখে। কিন্তু, না, দাঁড়াও, এই বাৎসল্য-মাধুর্য আস্বাদন করি।

বাগবাজারের এক বড় ঘরের গৃহিণী—কেমন ইচ্ছে হল, যদি একবার যেতে পারতাম দক্ষিণেশ্বর। এত কথা শুনেছি যাঁর সম্বন্ধে তাঁকে যদি দেখতে পেতাম চোখ ভরে। কেন প্রাণ উতলা হয় কে বলবে। ঈশ্বরপিপাসা তো কোনো হেতুবাদের উপর দাঁড়িয়ে নেই, ক্ষুৎপিপাসার মতই এ বৃত্তি স্বাভাবিকী। ভক্তিতে যত আনন্দ বাড়ে তেমন আর কিছুতে নয়। কেন না ভক্তিতেই আর দেহদুঃখ থাকে না, চিত্ত শান্ত ও অমৎসর হয়, ভোগে অনাসক্তি আসে। যত দুঃখ এই আসক্তি থেকে। আসক্তি চলে গেলেই একটা আশ্চর্য স্থিতিশক্তিতে জীবন দৃঢ় হয়ে ওঠে।

কে একজন আছে চেনা মহিলা, কয়েকবার যাতায়াত করেছে দক্ষিণেশ্বরে, তার শরণাপন্ন হল। বেশ তো, কালই চলো না। নৌকো করে যাব দুজনে।

পরদিন বিকেলে দুজনে এসে উপস্থিত। কিন্তু এ কি ঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ।

উত্তরের দেয়ালে দুটি ফোকর আছে, তারই ভিতর দিয়ে উঁকি মারল দুজনে। দেখল ঠাকুর শুয়ে আছেন, বিশ্রাম করছেন। এখন যাই কোথা? সারদামণিও নেই, গেছেন বাপের বাড়ি। এ-ওর মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এখন করি কি? অপেক্ষা করো। সমীপাগত হয়েছ, এখন যদি ধৈর্য না ধরো, তবে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বয়ে যাবে লগন। ক্লেশ-নদী অতিক্রম করে এসেছ, এখন কৃপাজলনিধিকে দেখে যাও।

নবতের দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসে রইল দুজনে।

কিছু পরেই ঠাকুর উঠলেন। উত্তরের দরজা খুলতেই চোখ পড়ল মহিলাদের উপর। ওগো, তোরা এখানে আয়, ডেকে উঠলেন সানন্দে।

ঘরে এসে বসল পাশাপাশি। যে মহিলাটি পরিচিত, তক্তপোশ থেকে নেমে তার কাছটিতে এসে বসলেন ঠাকুর। বসতেই সে মহিলাটি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। সরে যাবার জন্যে ত্বরিত ভঙ্গি করলে। ঠাকুর বললেন, 'লজ্জা কি গো! লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। শোনো, তোরাও যা আমিও তাই।' নিজের দাড়িতে হাত দিলেন : 'তবে এগুলো আছে বলে বুঝি লজ্জা? তাই না?'

কৃষ্ণান্বেষিণীদের আবার লজ্জা কি! শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি কৃষ্ণকে নিবেদন করো।

অনেক ভগবৎকথা শোনালেন ঠাকুর। সঙ্কোচের আড়ষ্টতা আর থাকল না। হরি-প্রসঙ্গ শেষে সাংসারিক কথাও পাড়লেন। বললেন, 'সপ্তাহে অন্তত একবার করে এসো। প্রথম-প্রথম এখানে আসা-যাওয়াটা বেশি রাখতে হয়। কিন্তু নিত্য অত নৌকো বা গাড়িভাড়া দিতে যাবে কেন? শোনো, আসবার সময় তিন-চারজনে মিলে নৌকো নেবে আর যাবার সময় হেঁটে বরানগর গিয়ে সেখান থেকে শেয়ারে ঘোড়ার গাড়ি।'
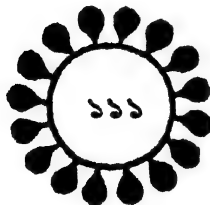
আহিরিটোলার দিগম্বর ময়রার খাবারের খুব নাম-ডাক। ঠাকুরের জন্যে কিছু কিনে নিলে হয়।

মিহিদানা বাঁধা হচ্ছে। কি হে টাটকা না কি?

'হাতে করে দেখুন না। কত গরম!'

এক সের কিনলে দেবেন মজুমদার। ঘাটে এসে দেখে খেয়ার নৌকো ছাড়ো-ছাড়ো। শুধু একজন যাত্রীর অপেক্ষা। উঠে বসলো এক লাফে।
মিষ্টির ঠোঙা কোলে নিয়ে বসলো সন্তর্পণে। এত ভিড়, ছোঁয়া বাঁচানো দুঃসাধ্য। পাশেই এক চাপদাড়িওয়ালা মুসলমান। ভীষণ গোপ্পে, মুখের আর কামাই নেই। ছুঁয়ে তো দিয়েইছে, কে জানে তার মুখামৃতের ছিটে-ফোঁটাও পড়ছে কি না ঠোঙার উপর।
বিশীর্ণ হয়ে গেল দেবেন। আর ঠাকুরকে দেওয়া চলবে না কিছুতেই। সেবার এক ঝুড়ি জিলিপি নিয়ে এসেছিল রাম দত্ত। পথে একটি ভিখিরি ছেলের সঙ্গে দেখা। তাকে কি ভেবে রাম একখানা জিলিপি দিয়ে দিল। ঠাকুর বললেন, 'সব উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেবতার উদ্দিষ্ট বস্তুর আগ-ভাগ তুলে কাউকে দিলে তা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়।'
একখানা জিলিপি নিয়েছিলেন হাতে করে, গুঁড়িয়ে ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন গঙ্গাজলে।
গরুর গাড়িতে গুড়ের নাগরির মতন গায়ে গা ঠেকিয়ে বসা, তার পর এই মৌলবীর বকর-বকরের আর শেষ নেই। দরকার নেই এ মিষ্টি ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে। রামের জিলিপির অবস্থা হবে। তার চেয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে হালকা হয়ে যাই। কিন্তু আহা, মিহিদানাগুলো এখনো গরম!
বাঁচোয়া, ঠাকুর ঘরে নেই। দূরের তাকের এক কোণে দেবেন ঠোঙাটা লুকিয়ে রাখল। সহজে কারু নজর পড়বে না। এ জিনিস ঠাকুরকে দিয়ে কাজ নেই। আরো অনেক আছে এর ভাগীদার।
খাবারের ঠোঙাটা যে ঠাকুরের চোখের আড়াল করতে পেরেছে তাইতেই দেবেন নিশ্চিন্ত।
চটি ফট-ফট করতে-করতে ঠাকুর এসে বসলেন তাঁর ছোট তক্তপোশে। খানিক পরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'এ কি, খিদে পাচ্ছে কেন?'
কি যেন খুঁজতে লাগলেন ঘরের আনাচে-কানাচে। কি, খাবার? যাই বলি গে, নিয়ে আসুক কিছু যোগাড় করে। উঠে গেল একজন ভক্ত-যুবক। একটু ধৈর্য ধরুন।
অন্তরে বসে কাঁদতে লাগল দেবেন। তোমার নাম করে খাবার আনলাম অথচ তোমাকে দিতে পারলাম না। খাদ্যকে করতে পারলাম না নৈবেদ্য। নিজের রূপকে করতে পারলাম না অরূপের রূপ।
তাক-লাগানো ব্যাপার! ঠিক তাকটি খুঁজে পেয়েছেন ঠাকুর। দেবেনের বুক দুর-দুর করে উঠল। কিন্তু, এ কি, ঠাকুর যে আনন্দে তরলতনু হয়ে উঠলেন। আরে, এই যে, মেঠাই! বাঃ, কে আনলে? এখনো যে হাতে-গরম। বলে, বলা-কওয়া নেই, মুঠো-মুঠো খেতে লাগলেন।
অন্তরের যে কান্না সেই তো তোমার সুধা। আমার অশ্রুক্ষরণই তো তোমার মধুক্ষরণ। তাই মিষ্টত্ব মিহিদানায় নয়, মিষ্টত্ব ব্যাকুলতায়। দিতে এসেও তোমাকে যে দিতে পারলুম না সেই ব্যর্থতার বিষাদে।

হে প্রণতপ্রিয়, হে দয়াসারসিন্ধু, তোমাকে কি দেব, কিবা চাইব, কিবা বলব তোমার কাছে। শুধু জীবন ভরে এই জেনে থাকব আমার নিদ্রাহীন হৃদয়ের ব্যথা কিছুই আর তোমার অজানা নেই।

ব্যথা হরণ করলেন, নিবারণ করলেন সমস্ত ভয়ভ্রান্তি। শুধু নিজে খেলেন না, সবাইকে প্রসাদ দিতে লাগলেন। খাদ্যকে শুধু নৈবেদ্যে নিয়ে গেলে চলবে না, নৈবেদ্যকে নিয়ে যেতে হবে প্রসাদে।

ভোলা ময়রার দোকানে চমৎকার সর করেছে। ওরে, ঠাকুরের জন্যে একখানা কিনে নিয়ে যাই চল।

মেয়ের দল চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। নৌকো করে। একখানা বড় দেখে সর কিনে নিয়েছে। বড় ভালোবাসেন সর। দেখে কত খুশি হবেন না-জানি

দক্ষিণেশ্বরে এসে শোনে—কী সর্বনাশ—ঠাকুর কলকাতায় গিয়েছেন। সবাই বসে পড়ল। এত সাধ করে এলুম, দেখা হল না! কোথায় গিয়েছেন কলকাতায়? রামলাল বললে, কম্বুলিটোলায়। মাস্টারমশায়ের বাড়িতে। কখন ফিরবেন কে জানে!

চল সেখানেই ফিরে যাই। আমি চিনি সে বাড়ি। আমার বাপের বাড়ির লাগোয়া।

কিন্তু যাবি কি করে? বললে আরেকজন। নৌকো তো ছেড়ে দিয়েছিস।

পায়ে হেঁটে যাব।

সরখানি রামলালের হাতে দিয়ে বললে, ঠাকুর এলে দিও। পেটরোগা মানুষ, সবটা তো আর খেতে পারবেন না, একটু যেন খান।

আলমবাজার পার হতে না হতেই, ঠাকুরের কৃপা, ফিরতি গাড়ি জুটে গেল একখানা। চলো শ্যামপুকুর।

বাপের বাড়িই চেনে সে মেয়েটি, কম্বুলিটোলায় মাস্টারের বাড়ি আর বের করতে পারে না। একবার এ-গলি ঢোকে, ঘুরে-ফিরে আরেক বারও এ-গলি। শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ির সামনেই দাঁড় করালে। একটা চাকর ডেকে নিলে। বাবা, দেখিয়ে দে কম্বুলিটোলা।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! সামনের ছোট ঘরে তক্তপোশের উপর একলা বসে আছেন। আমরা পর্দার মেয়ে, রাস্তা-ঘাটে বেরোই না কখনো, কিন্তু তোমার জন্যে ছেড়েছি সব লোকলাজ, মানিনি দেয়াল-বেড়া। কার বাড়ি, কে মাস্টার, কিছুই জানি না। শুধু এইটুকু জানি তুমি যেখানে আছ তাই আমাদের ঘর-দোর। আমাদের তীর্থ-মন্দির।

'তোরা এখানে কেমন করে এলি গো?' ঠাকুর উছলে উঠলেন।

প্রণাম করে বললে যা হয়েছে। বসলে মেঝের উপর। দুজন বুড়ি, তিনজন অল্প-বয়সী। আনন্দে কথা কইতে লাগলেন ঠাকুর। এমন সময় আসবি তো আয় ঠাকুর যাকে 'মোটা বামুন' বলতেন সেই প্রাণকৃষ্ণ মুখুজ্জে এসে উপস্থিত। কি সর্বনাশ, পালাবি কোথায়, পালাবি কি করে? বুড়ি দুজন জবুথবু হয়ে বসে রইল কোনো রকমে, কিন্তু অল্পবয়সীদের উপায় কি? উপায় ঠাকুরই যুগিয়ে দিলেন। ঠাকুরেরই তক্তপোশের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলে তিনজন। উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইল। মশার কামড়ে ছিন্নভিন্ন হবার যোগাড় তবু নড়ল না এক তিল।

শ্রীশ্রীসারদামণি

পুরুষ না নারী এই দেহবুদ্ধি নেই ঠাকুরের। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের আছে। তাই ঠাকুরকে তাদের লজ্জা নেই, প্রাণকৃষ্ণকে লজ্জা।

সেই সরোবরতীরে বসন রেখে স্নান করছে সুরাঙ্গনারা। সংসার ত্যাগ করে চলেছে যুবক শুক, সেই সরোবরের তীর দিয়ে। তাকে দেখে সর্ববিনির্মুক্তা অপ্সরীদের এতটুকু সঙ্কোচ নেই, কেন না যুবক হলেও শুক মায়াহীন, ভগবদ্‌ভাববিভোর। কিন্তু ছেলের পিছনে ছুটছেন ব্যাসদেব, তাকে সংসারে ফিরিয়ে আনতে। হলেনই বা বৃদ্ধ, তিনি মায়াধীন, তাকে দেখামাত্রই স্বর্গসুন্দরীরা ত্বরান্বিত হয়ে গায়ের উপর টেনে নিল আচ্ছাদন।

মন্দ পরিহাস নয়। ব্যাসদেব দাঁড়ালেন। জিগগেস করলেন, 'এ তোমাদের কেমন ব্যবহার? আমার যুবক পুত্র শুককে দেখে তোমাদের লজ্জা হল না, আর আমি বুড়ো, আমাকে দেখে তোমাদের লজ্জা?'

কার সঙ্গে কার তুলনা! শুক নিবৃত্তাশয়, উপশান্তাত্মা। দেহবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। তাই তাকে দেখে আমাদের লজ্জা করবে কেন? আর বুড়ো হলেও তুমি রূপ-পিপাসু, সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা রমণীদের কটাক্ষগর্ভ নেত্রপাতের ভিখারী, তোমার কাব্যে-গ্রন্থে কত তুমি বর্ণনা করেছ লাবণ্যবিলাস ও বিভ্রমমণ্ডনের কথা। তোমাকে দেখে লজ্জা হবে না তো কাকে দেখে হবে?

প্রাণকৃষ্ণ কি আর শিগগির যায়! ঠায় এক ঘণ্টা ধরে তার নানা নিবন্ধ। ওরে বাপু, এবার সরে পড়। পারি না আর উবুড় হয়ে পড়ে থাকতে। মশার কামড়ে যে গেলুম!

ঘণ্টাখানেক লাগল মোটা বামুনের হাওয়া হতে। চলে গেলেই বেরিয়ে এল মেয়েরা। তখন ঠাকুরের কি হাসি!

বাড়ির মেয়েরা অচেনা, কি যায় আসে, ঠাকুর যখন সঙ্গে আছেন তখন চরাচরে আর পরাপর নেই। এরাও তাই ঢুকে পড়ল অনায়াসে। ঠাকুরের সঙ্গে-সঙ্গে এরাও খেল-দেল।

রাত ন'টা, ঠাকুর ফিরলেন ঘোড়ার গাড়িতে আর এরা পায়ে হেঁটে।

ঠাকুরের ফিরতে প্রায় সাড়ে-দশটা। খানিক বাদে রামলালকে ডেকে বললেন, 'ওরে রামনেলো, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'সে কি, খেয়ে আসেননি?'

'খেয়ে এলে কি হয়, আবার খিদে পেতে পারে না? শিগগির কিছু দে। নিদারুণ খিদে।'

সেই সরখানি এনে সামনে ধরল রামলাল। দিব্যি খেয়ে ফেললেন একটু-একটু করে।

পরদিন সকালে আবার এসেছে। সেই মেয়ের দল। তাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ওগো রাত্তিরেই তোমার সেই সরখানি সব খেয়ে ফেলেছি। কোনো অসুখ করেনি কিন্তু।'

মেয়েরা সব অবাক। পেটে কিছু সয় না ঠাকুরের, তা ছাড়া রাত্রে দিব্যি খেয়ে এসেছেন মাস্টারের বাড়ি থেকে, তার পরে আবার এই বন্য ক্ষুধা।

বন্য ক্ষুধা নয় অন্য ক্ষুধা। এ ক্ষুধা অন্তরমধুর জন্যে, ভক্তির আস্বাদনের জন্যে। ক্ষুধা কি বস্তুর, ক্ষুধা ভালোবাসার।

কৃষ্ণের সেই গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ-বন্ধুর কথা মনে করো। একসঙ্গে পড়েছিল পাঠশালায়, সান্দীপনি গুরুর ঘরে। কিন্তু ভাগ্যদোষে আজ সে ভিখারি। মলিন জীবন যাপন করছে ভার্যার সঙ্গে। একদিন স্ত্রী বললে, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সখা, তার কাছে গিয়ে কিছু চাও না।

মন্দ কি। কিছু পাই না পাই অন্তত দেখে আসতে তো পারব। মুখে ভাষা না ফোটে, চোখে অন্তত থাকবে তো নীরবতা!

ভিক্ষে করে জুটেছিল কিছু চিঁড়ের খুদ, তাই ব্রাহ্মণী বেঁধে দিল বস্ত্রখণ্ডে। দ্বারকার দিকে যাত্রা করল ব্রাহ্মণ। পুরপ্রবেশ করতে পারবে কিনা তারই বা ঠিক কি। তার পরে অন্তঃপুরে কোন সুগোপন কক্ষে তিনি আছেন তাই বা কে বলবে! আশ্চর্য, কেউ বাধা দিল না। তোরণ পেরিয়ে ক্রমে-ক্রমে তিনটি কক্ষা অতিক্রম করল। এই শ্রীশালী গৃহই শ্রীকৃষ্ণের। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল দীনভাবে।

প্রিয়ার পর্যঙ্কে শুয়েছিল কৃষ্ণ। ছুটে কাছে এল ব্রাহ্মণের, দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল নিবিড় করে বসাল পালঙ্কের উপর। নিজের হাতে ধুয়ে দিল পা দুখানি। সেই পাদোদক মাথায় ধরলে। অর্চনা করল নানা উপকরণে। রুক্মিণী ব্যজন করতে বসল।

এত সব কাণ্ডের পর কৃষ্ণ বললে, ঘর থেকে আমার জন্যে কি এনেছ দাও।

কোথায় আমি চাইব, তা নয়, তুমিই কি না চেয়ে বসলে!

শ্রীকৃষ্ণ বললে, ভাই আমিও ভিখিরি। আমি ভিখিরি ভালোবাসার। ভালোবাসার সঙ্গে যদি অণুমাত্রও কেউ দেয় তাই আমার কাছে অনেক। হোক তা ছোট্ট একটা ফুল নয় তো তুচ্ছ একটা পাতা, কিংবা এক অঞ্জলি জল।

তবু কি এনেছে বলতে সাহস পেল না ব্রাহ্মণ। কি এনেছ দেখি, কৃষ্ণ নিজেই তখন বস্ত্রখণ্ড খুলে ফেললে। এক মুঠো খুদ তুলে নিয়ে মুখে পুরলে। দ্বিতীয় মুষ্টি তুলতে যাচ্ছে, রুক্মিণী হাত চেপে ধরল। বললে, তোমার সন্তোষ দেখাবার জন্যে এক মুষ্টিই যথেষ্ট, আবার দ্বিতীয় মুষ্টি কেন?

সেই রাত হরি-ঘরেই বাস করল ব্রাহ্মণ। কি যে তার অভাব কি যে তার চাইবার কিছুই মনে করতে পারল না। প্রত্যূষে ফিরে চলল।

কোথায় আমি দরিদ্র পাপী আর কোথায় শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! আমি তাঁর বন্ধু, শুধু এটুকু জেনেই তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আমি অধন, ধন পেলে মত্ত হয়ে আর তাঁকে স্মরণ করব না, এই ভেবেই করুণাময় ধন দিলেন না আমাকে।

ঘরের কাছাকাছি এসে ব্রাহ্মণ যেন ইন্দ্রজাল দেখল। এ কি, এ উপবন আর সরোবর এল কোত্থেকে, সেই কুঁড়েঘরের পরিবর্তে এ কি বিচিত্রপুরী! কোথা থেকে এল এত দাসদাসী! আর এই যে চন্দ্রচন্দনভূষাঙ্গী পুরাঙ্গনা এই কি তার সেই মনোরথ-প্রিয়তমা ব্রাহ্মণী?

চাইলাম না, অথচ এত সব হল কি করে? মেঘ তো না চাইতেই জল দেয়। তেমনি

তাঁর যা ইচ্ছে তা নেন যত ইচ্ছে তত দেন। নইলে আমার পুঁটলি খুলে কেন নিলেন সেই তণ্ডুলকণা, আর কেনই বা দিলেন এত ভোগৈশ্বর্য? পাছে পতন ঘটে তাই তো তিনি ধনবৈভব দেন না ভক্তদের। কিন্তু এ তো আমার প্রাপ্তি নয় এ তোমার প্রীতি। এ তোমার ঐশ্বর্য।

ঠাকুর নবতখানায় খবর পাঠালেন ব্যাঘ্রহুঙ্কারে : ভীষণ খিদে পেয়েছে। শিগগির খাবার পাঠাও।

কি বুঝলেন শ্রীমা, এক খাদা সুজির পায়েস করে পাঠালেন। একজনের চেয়ে অনেক বেশি, একাধিক দিনের আহার। ভক্ত-মেয়ে সেই অন্নপাত্র নিয়ে কাছে এসে এ কি দেখল! ঠাকুর অস্থির পায়ে পাইচারি করছেন। যেন ঠাকুর নয় কে এক অতিকায়-মূর্তি। ঠাকুর ইশারা করলেন খাবার রাখতে। আসনের কাছে খাবার রেখে ভক্ত-মেয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোড় করে।

কি পর্বতপ্রমাণ ক্ষুধা! ঠাকুর খেতে লাগলেন ভীমগ্রাসে।

সেই মেয়ের দিকে চেয়ে জিগগেস করলেন, 'এ কে খাচ্ছে? আমি না আর কেউ?'

'আর কেউ।'
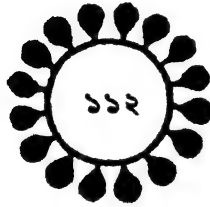
শ্রীমা'র কাছে নবতখানায় বসে জপ করছে গোপালের মা। জপ সাঙ্গ করে প্রণাম করে উঠছে, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। ফিরছেন পঞ্চবটীর ধার থেকে, দেখা হতেই জিগগেস করলেন, 'তুমি এখনো এত জপ করো কেন?'

'জপ করব না?' বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল গোপালের মা। 'আমার কি সব হয়েছে?'

'সব হয়েছে।'

'বলো কি?' যেন ঠাকুর বললেও বিশ্বাস করা যায় না।

'তোমার নিজের জন্যে সব হয়ে গেছে। তবে,' নিজের শরীরের প্রতি ইশারা করলেন : 'তবে যদি এই শরীরটা ভালো থাকবে বলে করতে চাও তো কোরো।'

তবে তাই হোক। আর নিজের জন্যে নয়। যা করব এবার থেকে সব তোমার, তোমার জন্য।

থলে-মালা গঙ্গায় ফেলে দিল গোপালের মা। হাতেই জপ করতে লাগল। তারপর

কি ভেবে আবার একটা মালা নিলে। নিজের জন্যে নয়, গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই।
কিন্তু কই আগের মতন তো গোপাল দর্শন হয় না যখন-তখন। যখন দেখে রামকৃষ্ণ-মূর্তিই দেখে, কোথায় সেই বালকের বেশ! দু জানু আর এক হাত মাটিতে আরেক হাতে নবনীভিক্ষা। কোথায় সেই দুটি আহ্লাদবিহ্বল দৃষ্টি!
একদিন এসে কেঁদে পড়ল ঠাকুরের কাছে। 'গোপাল, তুমি আমার এ কি করলে? আমার কি অপরাধ হল, কেন আমি আর তোমাকে আগের সেই গোপালমূর্তিতে দেখি না?'
'সর্বক্ষণ ও রূপ দর্শন করলে কলিতে শরীর থাকে না।'
'আমার শরীর দিয়ে কি হবে?'
না, তুমি বাৎসল্যরতির উদাহরণ, লোকহিতের জন্যে থাকো তুমি সংসারে। সংসার-বাসিনীরা বুঝুক শিশুসেবার মধ্যেই ঈশ্বরসেবা।
কার মুখখানি মনে পড়ে গা? সংসারে কাকে বেশি ভালোবাসো? একটি ভক্ত-মেয়েকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'ছোট একটি ভাইপোকে।'
'আহা, তবে তাকেই গোপাল ভেবে খাওয়াও-পরাও, সেবা করো। তার মধ্যে গোপাল-রূপী ভগবানকে দেখ। মানুষ ভেবে করবে কেন? ভগবান ভেবে করবে। যেমন ভাব তেমন লাভ।'
বলরাম বোসের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। রথের সময়। বার-বাড়ির দোতলায় চক-মিলান বারান্দায় রথ টানবেন ঠাকুর। কীর্তন করবেন। কিন্তু, কত লোক এসেছে, সে কই?
'ওগো সেই যে কামারহাটির বামুনের মেয়ে। যার কাছে গোপাল হাত পেতে খেতে চায়। সেদিন কি দেখে-শুনে প্রেমে উন্মাদ হয়ে আমার কাছে উপস্থিত। খাওয়াতে-দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হল। কত থাকতে বললুম কিছুতে থাকলো না। যাবার সময়ও তেমনি উন্মাদ। গায়ের কাপড় মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। হুঁশ নেই। ওগো তাকে একবার আনতে পাঠাও না?'
কামারহাটিতে লোক পাঠালো বলরাম।
সন্ধ্যা হয়-হয় ঠাকুরের ভাবাবেশ হল। মরি মরি, বালগোপালের ভাব। হামা দিচ্ছেন দুই জানু আর এক হাতে। অন্য হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে চেয়ে আছেন উর্ধ্বমুখে। মা যশোদা, ননী দে।
স্নেহগলিতা যশোদা শিশুকৃষ্ণকে স্তন্য দিচ্ছেন। হঠাৎ শিশু হাই তুলল। পুত্রের মুখবিবরে যশোদা দেখল স্থাবরজঙ্গম-জ্যোতিষ্ক-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব।
আরেক দিন। বলরাম এসে নালিশ করলে মা'র কাছে। মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। না মা, খাইনি মাটি। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখাচ্ছি তবে হাঁ করে। এ কি স্বপ্ন না দেবমায়া? মুখবিবরে আবার সেই বিশ্বরূপ।
হোক মায়া, তবু সেই আমার একমাত্র আশ্রয়। যশোদা ভাবলেন মনে-মনে, এই আমি,

এই আমার পতি, এই আমার পুত্র, এই গোপ-গোপী-গোধন সকল আমার, এ কুমতি যার মায়াবশে হয়েছে সেই আমার পরমগতি, পরমমতি।

ঠাকুরেরও ভাবাবেশ হয়েছে, গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। কে এল? যার ভক্তির জোরে ঠাকুর এমন মূর্তি ধরলেন, সে—সেই গোপালের মা।

'আমি কিন্তু বাপু ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালোবাসি না।' গোপালের মা যেন অনুযোগ দিল। 'আমার গোপাল হাসবে খেলবে বেড়াবে দৌড়ুবে—ও মা, এ যেন একেবারে কাঠ! আমার অমন গোপালে কাজ নেই।' ঠাকুরের গা ঠেলতে লাগল গোপালের মা : 'ও বাবা তুমি অমন হলে কেন।'

এই মাতৃভাব বা সন্তানভাব—সাধনের শেষ কথা বা সহজ কথা। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে।

আমি তোমার শরণাগত সন্তান। জীবত্ব বুঝি না, ঈশ্বরত্ব বুঝি না, কাকে বা বলে বন্ধন কাকে বা বলে মুক্তি। জ্ঞান-ভক্তিও বুদ্ধির বাইরে। বুঝি একমাত্র তোমাকে, মাকে। তুমি পূর্ণানন্দস্বরূপ মা আর আমি তোমার কোলে সদ্যজাত নগ্ন শিশু। তোমার কোলে যদি উঠতে পারি, তবে ঈশ্বরত্বও তৃণীকৃত।

তিনদিন পরে ঠাকুর ফিরছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের নৌকোতে গোলাপ-মা, গোপালের মা আর একটি-দুটি ভক্ত-বালক। আশ্চর্য, গোপালের মা'র হাতে একটি পুঁটলি! কি করবে, বলরামের বাড়ির মেয়েরা বেঁধে দিয়েছে। থান দুই কাপড়, রাঁধবার জন্যে কিছু হাতা-খুন্তি।

পুঁটলি দেখে ঠাকুর মহাবিরক্ত। গোপালের মাকে সরাসরি কিছু বললেন না। বললেন গোলাপ মাকে কিন্তু গোপালের মাকে ঠেস দিয়ে। 'যে ত্যাগী সেই ভগবানকে পায়। যে লোকের বাড়িতে খেয়ে-দেয়ে শুধু-হাতে চলে আসে, সেই ভগবানের গায়ে বসতে পারে ঠেস দিয়ে।' বলছেন আর বারে-বারে সেই পুঁটলির দিকে কটাক্ষ করছেন।

গোপালের মা'র মনে হল পুঁটলিটা ফেলে দি গঙ্গাজলে। কিন্তু তাই বা কেন, দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে কাউকে বিলিয়ে দেব না হয়।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছেই সোজা চলে গেল নবতে। শ্রীমাকে বললে, 'ও বৌমা, গোপাল এ সব জিনিসের পুঁটলি দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়? এ সব ভাবছি আর নিয়ে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দি কাউকে।'

সান্ত্বনার প্রলেপ বুলোলেন শ্রীমা। বললেন, 'বলুন গে উনি। তুমি শুনো না। তোমায় দেবার তো কেউ নেই! তা তুমি কি করবে মা, দরকার বলেই তো এনেছ।'

বুক জুড়িয়ে গেল কথা শুনে। তবু মনে যখন উঠেছে, একখানা কাপড় দান করল। আরো কটি এটা-ওটা। ঠাকুরের জন্যে রাঁধল স্বহস্তে। কি জানি, নেবেন কি না। নেবেন বই কি, হাসিমুখে নেবেন। শ্রীমা ইঙ্গিত করেছেন নবত থেকে। না নিয়ে উপায় কি! গরিব মানুষ, চেয়ে ভিক্ষে করে আনেনি তো! আর যা পেয়েছে তার থেকে দান করে দিয়েছে অপরকে।

নরেনকে ডাকিয়ে এনেছেন ঠাকুর। আর সেই দিনই গোপালের মা'র আবির্ভাব। এবার রগড় হবে মন্দ নয়। একজনের হাতে জ্ঞান-অসি আরেকজনের হাতে বিশ্বাসের

পাহাড়—কেমন যুদ্ধ হবে না জানি! দুষ্টুমি করে একটা কোঁদল বাধিয়ে দিই দুজনের মধ্যে।
'কেমন তুমি গোপাল দেখ নরেনকে একটু বলো তো বুঝিয়ে।'
দর্শনের কথা কাউকে বলতে নেই এমনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর। তাই ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করল গোপালের মা, 'তাতে কিছু দোষ হবে না তো গোপাল?'
'না, তুমি বলো।'
তুমি বিশ্বাস করো না করো আমি বলি এবার নির্ভয়ে। আমার ভাবের কথা বলব ভালোবাসার কথা বলব, তাতে আমার লজ্জা কি। চাঁদের আলো যে ছড়িয়ে পড়ছে জলে-স্থলে পাহাড়ে-কাননে সে কি চাঁদের লজ্জা?
গোপাল আমার কোলে উঠে কাঁধে মাথা রেখে এসেছিল সারা পথ। কামারহাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর। তার রাঙা টুকটুকে পা ঝুলছিল বুকের কাছটিতে। এসেই ঢুকে গেল ঠাকুরের শরীরে। আবার বেরিয়ে এল যাবার সময়। শুতে বালিশ না পেয়ে খুঁতখুঁত করেছে সারা রাত। কাঠ কুড়িয়ে আনল রাঁধবার সময় আর খেতে বসে কি দস্যিপনা!
ভাবে বিভোর হয়ে বলতে লাগল অঘোরমণি। তুমি যদি না মানো তো আমি কি করব! আমি যে দেখছি চোখের সামনে।
এ কি, নরেন কাঁদছে!
'বাবা, তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, আমি দুঃখী কাঙালী, কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না।' আকুল স্বরে বললে গোপালের মা, 'তোমরা বলো, আমার এ সব তো মিথ্যে নয়?'
'না মা,' নরেন বললে ভক্তবিশ্বাসীর মতো, 'তুমি যা দেখেছ সব সত্যি।'
ঝগড়াটা তাহলে লাগল না। ঠাকুর হাসতে লাগলেন।
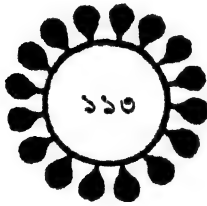
অধর সেনের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে বঙ্কিমের দেখা।
'তুমি ডিপুটি।' কথায়-কথায় বললেন একদিন অধরকে। তার শোভাবাজার বেনে-টোলার বাড়ির উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। 'কিন্তু জেনো এ পদও ঈশ্বরের দয়ায় হয়েছে। তাঁকে ভুলো না।' আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে, শিবের সিঁড়িতে বসে। 'দেখ, তুমি এত বিদ্বান আবার ডিপুটি। তবু তুমি খাঁদিফাঁদির বশ। আমার কথা

শোনো। এগিয়ে পড়ো। চন্দনকাঠের পরেও আরো ভালো জিনিস আছে। রূপোর খনি, সোনার খনি—তার পর হীরে-মানিক! শুধু এগিয়ে পড়ো—'
বয়স আটাশ-উনত্রিশ। বৃত্তি পেয়েছে এনট্রান্সে অষ্টম হয়ে। এফ-এতে চতুর্থ। কবিতার বই লিখেছে দুখানা, 'মেনকা' আর 'ললিতাসুন্দরী।' চব্বিশ বছর বয়সে প্রথম ডেপুটি হয়েই চট্টগ্রাম। সেখান থেকে বদলি হয়ে যশোর। যশোর থেকে সম্প্রতি কলকাতা। আর কলকাতায় পৌঁছেই সটান দক্ষিণেশ্বর।
তিনশো টাকা মাইনে। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে। বড়-বড় লোকদের করছে অনেক ধরাধরি। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এবার তুমি যদি বলো একটু তোমার কালীকে।
অধরকে মনে করেন পরমাত্মীয়। মুখে বলেনও তাই অকপটে। তাই একটু সাধলেন কালীকে। বললেন, 'মা, অনেক তোমার কাছে আনাগোনা করছে। যদি হয় তো হোক না।' বলেই ছি-ছি করে উঠলেন : 'মা, কি হীনবুদ্ধি! জ্ঞান-ভক্তি না চেয়ে চাচ্ছে কিনা টাকা-পয়সা!'
ধিক্কার দিয়ে উঠলেন অধরকে, 'কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে? কী হল? সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্যে! আর বোলো না ঐ মল্লিকের কথা। আমার মাহেশ যাবার কথায় চলতি নৌকো বন্দোবস্ত করেছিল, আর বাড়িতে গেলেই হৃদুকে বলত, হৃদু, গাড়ি রেখেছ?'
অধর হাসল। বললে, 'সংসার করতে গেলে এ সব না করলে চলে কই? আপনি তো বারণ করেননি!'
কি অবস্থাই গেছে! 'এই অবস্থার পর,' ঠাকুর বললেন, 'আমাকে মাইনে সই করাতে ডেকেছিল খাজাঞ্চি। যেমন ডাকে সবাইকে, অন্যান্য কর্মচারীকে। আমি বললাম, তা আমি পারবোনি। তোমার ইচ্ছে হয় আর কারুকে দিয়ে দাও।'
সংসারে থাকো কিন্তু ঈশ্বর-রস-সরসীতে স্নান করো। কিন্তু যদি একবার যাও তলিয়ে আর উঠো না।
'এই অবস্থা যেই হল, রকম-সকম দেখে মাকে বললাম, মা, এইখানেই মোড় ফিরিয়ে দে। সুধামুখীর রান্না, আর না আর না—খেয়ে পায় কান্না!'
সবাই হেসে উঠল। সংসারসুধামুখীকে সবাই চেনে। বচনে অমৃত, ব্যঞ্জনে বিষ। আপাতরম্য কিন্তু পর্যন্তপরিতাপী। যাকে বলে দেখসিঁদুরে। রূপসুন্দর কিন্তু অসার।
'যার কর্ম করছ তারই করো।' বললেন আবার অধর সেনকে : 'লোকে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা মাইনে পায় না, তুমি তিনশো টাকা পাচ্ছ। ডিপুটি কি কম গা? ওদেশে দেখেছিলাম আমি ডিপুটি। নাম ঈশ্বর ঘোষাল। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। মাথায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে। বাঘে-গরুতে জল খায় এক ঘাটে। শোনো। যার কর্ম করছ তারই করো। একজনের চাকরি করলেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচজনের!'
আমিও একজনের চাকরি করছি। একজনের দাসত্ব। সে মুনিব সে উপরওয়ালার নাম ঈশ্বর।

'শোনো!' আবার বলছেন ঠাকুর : 'আলো জ্বাললে বাদ্‌লে পোকার অভাব হয় না। তাঁকে লাভ করতে চাইলে তিনিই সব যোগাড় করে দেন, কোনো অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেবা করবার অনেক লোক এসে জোটে। তবে আপনি হাকিম, কি বলব! যা ভালো বোঝ তাই কোরো। আমি মূর্খ—'
আর সবাইকে লক্ষ্য করে হাসিমুখে বললে অধর, 'উনি আমাকে একজামিন করছেন।'
যেমন দেশে বাড়ি, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে, তেমনি সংসারকর্মভূমিতে কাজ করে যাও। আর ঈশ্বরের নাম করো। ঈশ্বরই কীর্তনীয় কথনীয় গণনীয় মননীয়। বর্ণনীয়, বন্দনীয়। ঈশ্বরই সর্বার্থনামচিন্তামণি। শুধু তাঁর নামসাধন করে যাও। পরমামৃতায়মান নামকীর্তন। 'বিদ্যাবধূজীবনং।' চিদ্‌বৃত্তি বিদ্যারূপ যে বধূ তার জীবনই শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন। নামসাধনে নিশ্চলা স্থিতিই নিষ্ঠা।
'তাঁর নামবীজের খুব শক্তি।' বললেন আবার অধরকে। 'নাশ করে অবিদ্যা। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।'
কণ্ঠপীঠে মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণনাম প্রতিষ্ঠিত করো। 'স্ফুটং রট।' শব্দ করে উচ্চারণ করো। সঙ্কেতে অর্থাৎ পুত্রাদির নামকরণে, পরিহাসে, স্তোভে বা নিরর্থক বাক্যে বা নৃত্যগীতে, বা অবহেলাক্রমে যে ভাবেই হোক নাম করলেই হল। ভুলেও যদি অগ্নিকণা গায়ে এসে পড়ে দগ্ধ করবেই। তেমনি হরিনাম যদি একবার উড়ে এসে মনে পড়ে পুড়ে যাবে সর্বপাপ। আসলে হরিনামও বহ্নিময়। দাহ আছে, আবার এমন মজা, মধুও আছে। যাকে বলে 'তপ্ত ইক্ষু চর্বণ।' রাখাও যায় না ফেলাও যায় না।

'এই প্রেমের আস্বাদন
তপ্ত ইক্ষু চর্বণ—
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন॥'

কিন্তু শুধু নাম করলে কি হবে? অনুরাগ চাই। নামের মধ্যে চাই সেই হৃদয়ের সুর। সেই স্পর্শ-আতুর পথিক হাওয়ার ব্যাকুলতা।
শুধু নাম করে যাচ্ছি অথচ বিলাস-লালসে মন রয়েছে অলস হয়ে, তাতে কী হবে?
'হাতিকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধুলোকাদা মেখে যে-কে-সেই। তবে হাতি-শালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ ধুলো ঝেড়ে স্নান করিয়ে দেয়, তাহলে আর ভয় নেই, গা তখন থাকবে ঠিক পরিষ্কার।'
'সেই যে এক পাপী গিয়েছিল গঙ্গাস্নানে। গঙ্গাস্নানে পাপ যায় শুনেছে, ব্যস, মনের সুখে ডুব দিচ্ছে জলে নেমে। কিন্তু জানে না পাপগুলো নদীর পাড়ে গাছের উপর গিয়ে বসেছে। যেই স্নান সেরে ফিরছে অমনি পুরোনো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ের উপর। স্নান করে দু পা আসতে-না-আসতেই

একটু-আধটু হালকা হতে-না-হতেই আবার সেই গুরুভার। সেই জগদ্দল পাষাণের শ্বাসরোধ।

'তাই বলি নাম করো। আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, তোমার উপর যেন ভালোবাসা আসে। আর কিছু না। টাকা নয় মান নয় দেহের সুখ নয়, শুধু ভালোবাসা। এমন কখনো হতে পারে আমি তোমাকে ভালোবাসি আর তুমি আমাকে বাসো না?'

চণ্ডীর গান হয়ে গেল অধরের বাড়িতে। বলরামকে নেমন্তন্ন করতে ভুল হয়ে গিয়েছে। বলরামের বড় অভিমান, যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্ছে। নালিশের মধ্যে রাগ তত নয় যত দুঃখ। চণ্ডীর গান দিল অধর, আমাদের বললে না। তা বলবে কেন, আমরা হলুম আজে-বাজে, হেঁজি-পেঁজি—

কথা কানে উঠল অধরের। ছুটে তক্ষুনি বলরামের বাড়ি গেল। যুক্ত করে অপরাধ স্বীকার করলে। মাপ করুন। ভুল হয়ে গিয়েছিল—

সেই কথাই হচ্ছিল ঠাকুরের সঙ্গে।

বলরাম বললে, 'আমি জানতে পেরেছি যে অধরের দোষ নয়। দোষ রাখালের। রাখালের উপর ভার ছিল।'

'রাখালের দোষ ধোরো না।' মমতামাখানো মুখে বললেন ঠাকুর, 'গলা টিপলে ওর দুধ বেরোয়—'

'বলেন কি মশাই!' ঝাঁজিয়ে উঠল বলরাম : 'চণ্ডীর গান হল, আর ও নেমন্তন্ন করতে বেরিয়ে—'

'আসলে অধরই জানত না। অধরেরই খেয়াল ছিল না।' ঠাকুর শান্তিজল ঢেলে দিলেন। 'দেখ না সেদিন যদু মল্লিকের বাড়ি গিয়েছিল আমার সঙ্গে। দেখল সিংহবাহিনী। চলে আসবার সময় জিগগেস করলুম, সিংহবাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে না? ও, দিতে হয় নাকি—সঙ্কুচিত হয়ে গেল—তা মশাই আমি তো জানি না, আমার তো খেয়াল নেই!' ঠাকুর থামলেন। বলরামকে বিশেষ উদ্দেশ করে বললেন, 'তা তোমাকে যদি না বলেই থাকে, তাতে দোষ কি? যেখানে হরিনাম সেখানে না বললেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণের দরকার হয় না।'

নিমন্ত্রণ করি কাকে? অভিমানীকে। স্পর্ধিতবর্ধিতকে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলেও ত্রুটি ধরে। কিন্তু বিশ্বময় এত যে পত্র লিখে রেখেছেন ঈশ্বর, এ কি নিমন্ত্রণ? এ সরোদন আহ্বান। আয় আয়।

তুমি যাবে না ভেবেছ? যেতে পারো না সে আলাদা কথা। তোমার দেহের প্রতিটি রক্তকণা যাই-যাই করে উঠেছে।

গাছ কি নিমন্ত্রণ করে? তবু গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি, পত্রমর্মরে হরিনাম শুনি। নদী কি নিমন্ত্রণ করে? তবু তার তীরে গিয়ে বসি, জলগুঞ্জনে হরিনাম শুনি। আকাশ কি নিমন্ত্রণ করে? তবু তার অন্ধকারের নিচে গিয়ে দাঁড়াই। তারায়-তারায় শুনি দীপ্ত হরিনাম।

গৃহস্থের ঘরে হরিনাম হচ্ছে। পথচারী পথিক এসে দাঁড়াল বাড়ির আঙিনায়। কে

আপনি? আমি রবাহূত। আমাকে গৃহস্বামী ডাকেনি, আমাকে হরিনাম ডেকে এনেছে।
যেখানেই হরিকথা সেখানেই আত্মীয়তা। যেখানেই হরিনাম সেখানেই সুখধাম।
নামসদৃশ জ্ঞান নেই, নামসদৃশ ব্রত নেই, নামসদৃশ ফল নেই, নামসদৃশ শান্তি নেই, নামসদৃশ আশ্রয় নেই। হে রসসারজ্ঞা রসনা, মধুপ্রিয়া, যদি মধুস্বাদই করতে চাও নিরন্তর, নামপীযূষ পান করো।
'প্রথমে একটু খাটনি!' বললেন আবার অধরকে। 'তার পরেই পেনসান।'
প্রথমে অভ্যাস তারপরেই অনুরাগ। প্রথমে দাগা বুলোনো পরে টেনে লেখা। প্রথমে দাঁড় টানা পরে তামাক খাওয়া। প্রথমে ছুটোছুটি পরে মা'র কোলে ঘুম।
অনেক দিন পর এসেছেন অধরের বাড়িতে। কোনো ঠিক ছিল না হঠাৎ এসে পড়েছেন। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসল এসে অধর। বললে, 'কত দিন আসেননি। আমি আজ খুব ডেকেছিলাম আপনাকে। চোখ দিয়ে জল পড়েছিল—'
'বলো কি গো—' মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠল।
তাই তো এসেছি। ব্যাকুল হয়ে কাঁদলেই তো চলে আসি পথ চিনে। বিনা-রেখার পথ ধরে যেমন বাতাস চলে আসে ফুলগন্ধের সংবাদ পেয়ে।
শুধু তুমি আমার জন্যে নয় আমিও তোমার জন্যে ব্যাকুল হই। কাঁদি। ঘুরে বেড়াই।
অনেক দিন পর অধর এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। 'কি গো এত দিন আসোনি কেন?' ঠাকুরের কণ্ঠে যেন বেদনার কুয়াশা।
'অনেক কাজে পড়ে গিয়েছিলাম। নানান মিটিং, ইস্কুল, অফিস—'
'কচ্ছপের মতন থাকো। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায় কিন্তু মন রয়েছে আড়াতে। যেখানে তার ডিম রয়েছে সেখানে।'
'অনেক দিন আমাদের বাড়িতে আসেননি।' করজোড় করল অধর। বললে, 'সেই যে গিয়েছিলেন বৈঠকখানা ঘর সুগন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন—এখন সব অন্ধকার।'
ভাবসাগর উথলে উঠল ঠাকুরের। ভাবসাগর মানে প্রেমসাগর। দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাত দিয়ে অধর আর মাস্টারের মাথা ছুঁলেন, ছুঁলেন বক্ষদেশ। বললেন, 'আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি। তোমরাই আমার আপনার লোক।'
শুধু তাই নয়, সেদিন অধরের জিভ ছুঁলেন ঠাকুর। জিভে কি লিখে দিলেন। সেই কি দীক্ষা হয়ে গেল অজানতে? মুখে বললেন, 'তুমি যে নাম করেছিলে তাই ধ্যান কোরো।'
নামসদৃশ ধ্যান নেই।
সেই অধর সেনের বাড়িতে বঙ্কিম এসেছে। এসেছে ঠাকুরকে দেখতে। ঠাকুরের মতই যার মন্ত্র বন্দে মাতরম্।
"এই কি মা? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ দশ দিক—দশ দিকে প্রসারিত। তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন—কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি

এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা—"
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
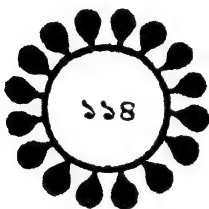
'মশায়, ইনিই বঙ্কিমবাবু।' অধর সেন পরিচয় করিয়ে দিল। 'ভারি পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। দেখতে এসেছেন আপনাকে।'
ঠাকুরের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট বঙ্কিম। তাকালেন একবার চোখ তুলে। সহাস্যে বললেন, 'বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!'
'আর মশায়, জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।'
তা কেন? আমি তোমাকে চিনেছি। ও কথা বোলো না। তুমি কৃষ্ণপ্রেমে বঙ্কিম। তুমি কৃষ্ণের ভক্ত। কৃষ্ণের ব্যাখ্যাতা। কৃষ্ণরসবিবেত্তা।
'না গো, প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন।' বলে পুরুষ-প্রকৃতির অভেদতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন মধুর করে : 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ শ্রীমতী শক্তি। যুগলমূর্তির মানে কি? মানে হচ্ছে, পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। একটি বললেই আরেকটি। যেমন অগ্নি আর দাহিকা। অগ্নি ছাড়া দাহিকা নেই দাহিকা ছাড়া অগ্নি নেই। তাই যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। বিদ্যুতের মত গৌরবর্ণ শ্রীমতীর, তাই নীলাম্বর পরেছেন, আর অঙ্গ সাজিয়েছেন নীলকান্ত মণি দিয়ে। আর শ্রীমতীর পায়ে নূপুর দেখে নূপুর পরেছেন শ্রীকৃষ্ণ।'
তন্মোহিতের মত শুনছে দুই ডেপুটি। বঙ্কিম আর অধর। নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কি বলাবলি করছে!
'কি গো, আপনারা ইংরিজিতে কি কথাবার্তা করছ?'
'এই কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা আলোচনা করছিলাম!' বললে অধর।
'সেই যে নাপিতের গল্প করলে! শোনো তবে। এক নাপিত কামাচ্ছে এক ভদ্রলোককে। কামাতে-কামাতে কোথায় লাগিয়ে দিয়েছে, আর ভদ্রলোকটি অমনি বলে উঠেছে

ড্যাম্। ড্যাম-এর মানে জানে না নাপিত। ক্ষুর-টুর ফেলে রেখে, শীতকাল, তবু জামার আস্তিন গুটোলো নাপিত, বললে, ড্যাম-এর মানে কি বলো। ভদ্রলোক বললে, আরে, তুই কামা না। ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে লক্ষ্মী বাবা, একটু সাবধানে কামাস! নাপিত সে ছাড়বার নয়। বললে চোখ পাকিয়ে, ড্যাম মানে যদি ভালো হয় তবে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয় তবে তুমি ড্যাম, তোমার বাপ ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। শুধু ড্যাম নয়, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।'

কি মহানন্দ শিশুর মত বললেন সরল গল্পটা। আর বলবার এমন অপূর্ব কৌশল, দুই সহকর্মী হেসে উঠল উচ্চরোলে।

'আচ্ছা মশাই, এমন সুন্দর আপনার কথা, আপনি প্রচার করেন না কেন?' প্রশ্ন করল বঙ্কিম।

প্রচার! মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতা করব? না, খোল ঝুলিয়ে বেরুব শোভা-যাত্রায়? না কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখব আত্মজীবনী?

'প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। যিনি চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন, তাঁর প্রচার তিনিই করবেন। মানুষ ক্ষুদ্র জীব, তার মধ্যে কি সে প্রচার করে!'

'তবে তিনি যদি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ দেন তাহলেই প্রচার সম্ভব। সে আদেশ সে চাপরাশ কজন পেয়েছে? নইলে, আদেশ হয়নি, তুমি বকে যাচ্ছ। যতক্ষণ বলছ লোকে বলবে আহা ইনি বেশ বলছেন। তুমিও থামলে, তারপর ভেঙে যাবে সভা, কোথাও কিছু নেই। আর বলবেই বা কদিন? ঐ দুদিন। দুদিনই লোক শুনবে তারপর ভুলে যাবে। ঐ একটা হুজুক আর কি।'

ঈশ্বরের প্রচার ঈশ্বর করবেন, তুমি নিজে প্রকাশিত হও। দেখ না তিনি নিজে কেমন প্রকাশিত হয়েছেন চতুর্দিকে, সূর্যে চন্দ্রে তৃণাঞ্চিত ধরিত্রীতে, তারাঞ্চিত নিশীথিনীতে। তুমিও তেমনি প্রকাশিত হও। সমস্ত কিশলয়ে যে প্রার্থনা সেই প্রার্থনা তোমারও মধ্যে বিকশিত করো। তুমি যে মহৎ তুমি যে বৃহৎ তার প্রমাণ দাও জীবনে। অপরিমাণ রূপে বাঁচো। নিখিলের প্রতি প্রেমে নিখিলের প্রতি করুণায় প্রসারিত হও।

কার শক্তিতে তুমি প্রচার করবে? তিনি যদি না দুধের নিচে আগুনের জ্বাল দেন তবে তা কি করে ফুলবে?

'যতক্ষণ দুধের নিচে আগুনের জ্বাল রয়েছে ততক্ষণ দুধটা ফোঁস করে ফুলে ওঠে। জ্বাল টেনে নাও, দুধও যেমন তেমনি। আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, কত বই লিখেছ,' বঙ্কিমকে সবিশেষ লক্ষ্য করলেন ঠাকুর। 'আপনি কি বলো, কিছু কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?'

কথাটা উড়িয়ে দিল বঙ্কিম। 'পরকাল? সে আবার কি?'

'যতক্ষণ না জ্ঞান হয় ঈশ্বরলাভ হয় ততক্ষণ ফিরে আসতেই হবে সংসারে, নিস্তার নেই। জ্ঞানলাভ হলে ঈশ্বরদর্শন হলে তবে মুক্তি। সিদ্ধ ধান পুঁতলে আর গাছ

হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে কেউ যদি সিদ্ধ হয় তাকে নিয়ে আর খেলা হয় না সৃষ্টির।'
বঙ্কিম বললে, 'তা মশাই আগাছাতেও তো গাছের কোনো কাজ হয় না।'
'জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বরদর্শন করেছে, সে অমৃত-ফল লাভ করেছে, আপনার লাউ-কুমড়ো ফল নয়। তার আর পুনর্জন্ম হয় না। কেশব সেনকেও বলেছিলাম ঐ কথা। কেশব জিগগেস করলে, মশাই, পরকাল কি আছে? আমি না-এদিক না-ওদিক বললাম। বললাম, কুমোররা হাঁড়ি শুকোতে দেয়, তার ভেতর পাকা হাঁড়িও আছে কাঁচা হাঁড়িও আছে। কখনো গরুটরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর সেগুলো ফেলে দেয়, কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে সেগুলো ঘরে আনে, ঘরে এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নতুন হাঁড়ি করে, ছাড়ে না। তাই কেশবকে বললুম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে ছাড়বে না কুমোর। যতক্ষণ পাকা না হবে, জ্ঞান লাভ না হবে, ঈশ্বরদর্শন না হবে, আবার চাকে দেবে। পাক দিয়ে ঘুরিয়ে মারবে।'
একাগ্রগামিনী নদীর মত চলেছি। বক্রতায়-ঋজুতায়, উচ্চাবচ পথ ভেঙে-ভেঙে, নানা দেশের বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমি শরবৎ তন্ময়। আমার লক্ষ্য হচ্ছে সেই জলনিধি, সেই অপার-অগাধ সেই সদুর-সুন্দর। আমি তো নিশ্চিন্ত হতে চাই না, উদ্বিগ্ন হতে চাই। আমি তো বিশ্রামের নই আমি প্রাণবেগ-প্রাবল্যের। আমি তো সুখী হতে আসিনি বড় হতে এসেছি, বেগবিস্তীর্ণ হতে এসেছি। তাই আমি চলব, আমি থামব না। আমি যে অনন্তের সন্ধানী, সেই তো আমার অন্তহীন আনন্দ।
'আচ্ছা, আপনি কি বলো, মানুষের কর্তব্য কি?'
'আজ্ঞে তা যদি বলেন,' বঙ্কিম বললে পরিহাস করে, 'আহার নিদ্রা আর মৈথুন।'
'এঃ। তুমি বড় ছ্যাঁচড়া।' ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ল। 'যা রাতদিন করো তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায় তার ঢেঁকুর ওঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর ওঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেঁকুর ওঠে। কামকাঞ্চনের মধ্যে রয়েছ তাই ঐ কথাই বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, কপট হয় মানুষ। আর ঈশ্বরচিন্তা করলে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হলে ও কথা কেউ বলবে না।'
এক সাধুর কাছে এক রাজা এসেছে। সাধুকে প্রণাম করে রাজা বললে, আপনি পরম ত্যাগী। কে বললে? সাধু হাসতে-হাসতে বললে, রাজা আপনিই যথার্থ ত্যাগী। আমি? রাজা তো বাক্যহীন। তা ছাড়া আবার কি! যে সব চেয়ে দামী জিনিস প্রিয় জিনিস ত্যাগ করে সেই তো বড় ত্যাগী। বললে সাধু, আমি তো কতগুলো তুচ্ছ জিনিস ত্যাগ করেছি, কামকাঞ্চন ভোগৈশ্বর্য। কিন্তু সব চেয়ে যা প্রিয় সব চেয়ে যা মূল্যবান সেই পরমাত্মাকে আপনি ত্যাগ করেছেন, আর তা কত অনায়াসে। তাই, সন্দেহ কি, আপনিই বড় ত্যাগী। বলুন, তাই নয়?
'শুধু পাণ্ডিত্য হলে কি হবে? যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে? চিল-শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে। অনেক শাস্ত্র-

পুঁথি পড়েছে পণ্ডিত। শোলোক ঝাড়তে পারে অফুরন্ত কিন্তু মেয়েমানুষে আসক্ত, টাকা মান সারবস্তু মনে করছে, সে আবার পণ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকলে আবার পণ্ডিত কি?'

পাণ্ডিত্যে আছে কি? শুধু শুষ্কতা, শুধু দাহ। যেখানে রাজত্ব করার কথা সেখানে এসে দাসত্ব করা। শুধু প্রেমহীন প্রাণহীন মাংসপিণ্ড। ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে এসেছেন আমার কাছে সেখানে কিসের আমার স্পর্ধা, কিসের ঔদ্ধত্য? পরম প্রাপ্তিটিই তো প্রণতিতে।

'কেউ-কেউ মনে করে এরা পাগল, এরা বেহেড, কেবল ঈশ্বর-ঈশ্বর করে। আর আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করছি। কাকও মনে করে আমি বড় স্যায়না, কিন্তু আসলে কি খায়, কেবল উড়ুর-পুড়ুর করে। আবার দেখ এই হাঁস, দুধে-জলে মিশিয়ে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে।'

সুখভোগ? যা বিষ হয়, তাই তো সংক্ষেপে বিষয়। তার মধ্যে আছে সুখের প্রতি-শ্রুতি? সুখ যখন সত্যিই চাও বড়ো সুখটাই নাও না কেন, সেই আরো-র সুখ, সুখের চেয়ে অধিকতর যে সুখ। যা পেয়েছি কুড়িয়েছি ও জমিয়েছি তার চেয়েও যা আরো, যা পাইনি হারিয়েছি ও ফেলে দিয়েছি তার চেয়েও। সুখের বাজি জিতিয়ে দেবে বলে কত ঘোড়াই ধরলাম জীবনের ঘোড়দৌড়ের মাঠে। বিদ্যা আর যশ, পুত্র আর বিত্ত। কেউই পারল না বাজি মারতে, প্রত্যেকেই মার খেল! এবার ধরব এক কালো ঘোড়া, ডার্ক-হর্স। মনের গোপনে গভীর গুঞ্জনে এসে গেছে নতুন খবর! এবার নির্ঘাৎ বাজি মাৎ।

সে তীরবেগ তুরঙ্গমের নামই ঈশ্বর।

'আরো দেখ এই হাঁসের গতি।' বললেন আবার ঠাকুর : 'এক দিকে সোজা চলে যাবে। তেমনি শুদ্ধভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। তার কাছে বিষয়রস তেতো মনে হয়, হরিপাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভালো লাগে না।' বিশেষ করে তাকালেন আবার বঙ্কিমের দিকে, কোমল স্বরে বললেন, 'আপনি যেন কিছু মনে কোরো না।'

সরল সপ্রতিভের মত বঙ্কিম বললে, 'আজ্ঞে মিষ্টি শুনতে আসিনি।'

কিন্তু বঙ্কিম জানে তার অন্তরের মধ্যে এর চেয়ে আর মিষ্টি নেই। শক্তিশালী ওষুধের নাম জানি না, খেতে খুব ঝাঁজালো, কিন্তু মধুরের মত কাজ করে আত্মগুণে, আরোগ্য এনে দেয়। তেমনি অর্থ জানি না মন্ত্রের উচ্চারণও হয়তো ঠিক হয় না, কিন্তু আত্মগুণে কাজ করে, এনে দেয় নৈরুজ্য। তেমনি তিরস্কারের মধ্য দিয়েই আসুক সেই নামের পুরস্কার।

ভক্ত ঈশ্বরের কাছে বিষয় চাইলেও ঈশ্বর তাকে তাঁর পাদপল্লবই উপহার দেন।

হে প্রভু, তোমাকে ত্যাগ করে স্বর্গ চাই না। ধ্রুবলোক চাই না! সার্বভৌম রসাধি-পত্যও চাই না। চাই না যোগসিদ্ধি। চাই না অপুনর্ভব। ক্ষুধার্ত শিশু বা অজাত-পক্ষ বিহঙ্গ যেমন তার মা'র জন্যে উৎকণ্ঠিত, বিরহিণী স্ত্রী যেমন প্রবাসগত পতির জন্যে উৎকণ্ঠিত, হে মনোহর-অরবিন্দনেত্র, তোমাকে দেখবার জন্যে আমিও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়েছি।
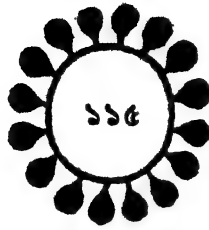
‘কামিনী-কাঞ্চনই সংসার।’ বঙ্কিমকে লক্ষ্য করে বললেন আবার ঠাকুর : ‘এরই নাম মায়া। দেখতে দেয় না ঈশ্বরকে।’

মাথার উপরে ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু-একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চনই ছাদ। ছাদ তুলে না ফেললে সূর্যকে দেখবে কি করে? সংসারী লোক যেন ঘরের মধ্যে বন্দী। আবছায়ার বাসিন্দে।

কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ। সেও দেখতে দেয় না সূর্যকে। যতক্ষণ মায়ার ঘরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে জ্ঞান-সূর্য কাজ করে না। মায়া-ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াও। জ্ঞান-সূর্যে নাশ হবে অবিদ্যা। বন্ধ ঘরের অন্ধকার। বন্ধ ঘরের অন্ধকারও যা অহঙ্কারও তাই। হয়ে যাবে শুকনো তৃণের মত।

‘ঘরের মধ্যে আনলে আতস কাঁচে কাগজ পোড়ে না।’ বললেন ঠাকুর, ‘ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি ঠিক কাঁচে পড়ে, তখন পুড়ে যায় কাগজ। আবার মেঘ চলে এলে কাজ হয় না আতস কাঁচে। মেঘটি সরে গেলে তবে হয়।’

সেই একজন এক কুকুর পুষেছে। দিন-রাত থাকে তাকে নিয়ে। কখনো কোলে করে কখনো বা মুখের পরে মুখ দিয়ে বসে থাকে। অত আদর করতে নেই, একজন এসে শাসিয়ে গেল, পশুর জাত, কোনদিন আদর ভুলে ফট করে কামড়ে দেবে তার ঠিক কি। সত্যিই তো। জোর করে নামিয়ে দিলে কোল থেকে। আর কক্‌খনো কোলে নেব না। কুকুর তা শুনবে কেন? দৌড়ে এসে উঠতে চায় ব্যাকুল হয়ে। নামিয়ে দাও তো আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছুটে পালাও তো সেও ছোটে। তখন উপায় কি? প্রহার করো। কুকুরের মার আড়াই প্রহর। মার ভুলে গিয়ে আবার কোলের জন্যে হা-পিত্যেশ করে। অনেক কাল আদর করে কোলে তুলে নিয়েছ এখন তুমি নিরস্ত হলেও সে ছাড়বে কেন? আসতে চায় আসুক, আবার প্রহার করো। জর্জর করো। নির্জিত করো। আর সে আসবে না। পালিয়ে যাবে।

কামকেও অনেক প্রশ্রয় দিয়েছ। এবার তাকে উচ্ছিন্ন করো।

কি জানিস, তোদের এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই পাচ্ছিস না বাঁধ দিতে। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে? বাঁধ ভেঙে জল ছুটতে থাকে উত্তাল হয়ে। ধান-খেতের উপর এক বাঁশ-সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চন যদি মন থেকে গেল তবে আর বাকি কি রইল? তখন কেবল ব্রহ্মানন্দ।

কিন্তু তুমি কি কামিনী?

তুমি জননী, তুমি জায়া, তুমি তনয়া, তুমি সহোদরা। তোমাকে ত্যাগ করব কি করে? কামিনীকে ত্যাগ করো দামিনীকে নয়; ভোগিনীকে ত্যাগ করো, যোগিনীকে নয়। অবিদ্যাকে ত্যাগ করো, বিদ্যা-বিনোদিনীকে নয়।

'দু-একটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই-ভগ্নীর মত থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে কইতে হয় শুধু ঈশ্বরের কথা।' বঙ্কিমকে বললেন আবার ঠাকুর : 'তা হলেই দুজনের মন তাঁর দিকে যাবে আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে।'

জগতের মা, সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন। সেই সৃজনী পালনী সংহরণী শক্তিই নেমে এসেছে সংসারে। প্রভাতে গায়ত্রী, অরুণরঞ্জিত আকাশে হংসারূঢ়া কুমারী, সৃষ্টি-উন্মুখী কোরক-আকারা। মধ্যাহ্নে শুক্লবর্ণা স্থিতিরূপিণী যুবতী, পদন্যাসবিলাসলক্ষ্মী। সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণা প্রলয়শংসিনী বৃদ্ধা, ঘোরকুটিল-আননা। এই তো সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ক্ষণা ব্রহ্মশক্তি! সমস্ত জগতের আধারশক্তি। এই ব্রহ্মময়ী মহাশক্তিকেই তো বসিয়েছি সংসারে।

শক্তিযুক্ত না হতে পারলে শিব করবে কি? শিব তো সামর্থ্যহীন স্পন্দনহীন। শক্তি-যুক্ত হলেই সে পুরুষার্থসম্পন্ন।

ঋক কখনো সাম ছাড়া আর সাম কখনো ঋকবিরহিত হয়ে থাকতে পারে না। ঋক স্ত্রী, সাম পুরুষ। ঋক ভূলোক, সাম স্বর্লোক।

বিবাহের মন্ত্রে বর বলছে বধূকে : 'আমি অম, লক্ষ্মীশূন্য, তুমি লক্ষ্মী। আমি সামবেদ তুমি ঋকবেদ। আমি স্বর্গ তুমি ধরিত্রী।'

আসল কথা, সংযম করো। সত্তার কনকপদ্মটিকে উন্মোচিত করো। সংসারের ঊর্ধ্বেও যে সংসার আছে তার খোঁজ নাও। দেহমঞ্চে ফোটাও এবার ঈশ্বররোমাঞ্চের ফুল। আনন্দ পেতে এসেছ সংসারে নাও এই নিত্য-নতুনের আনন্দ। বিন্দু-বিন্দু নয়, থেকে-থেকে থেমে-থেমে নয়—চাই অপরিচ্ছিন্ন সুখ। একটানা বন্যা। সেই একটানা বন্যার নামই ঈশ্বর।

'আর কাঞ্চন?' বললেন আবার ঠাকুর : 'পঞ্চবটীর তলায় গঙ্গার ধারে বসে টাকা মাটি, মাটি টাকা, বলে ফেলে দিয়েছিলুম জলে।'

'বলেন কি! টাকা মাটি?' বঙ্কিম চমকে উঠল : 'মশায়, চারটে পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তা হলে দয়া-পরোপকার হবে না?'

'দয়া! পরোপকার!' স্মিতহাস্যে বললেন ঠাকুর : 'তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কী দয়া করবে! দয়ালুর ভিতর যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া। বাবা-মা'র মধ্যে যে স্নেহ দেখ সব তাঁর স্নেহ।'

পরকে দয়া করবার আগে নিজেকে দয়া করো। ভান্ডারে বৈভব থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। উড়িয়ে দিচ্ছ ফুরিয়ে ফেলছ নিজেকে। ক্ষয়ে যেতে বয়ে যেতে দিচ্ছ। সর্বাধিকারী হয়েও আছ সর্বহারার মত। নিজেকে কৃপা করো। আত্মকৃপার মত কৃপা নেই। নিজেই নিজের দিকে চেয়ে রয়েছ করুণনেত্রে। নিজের দিকে তাকাও। নিজেকে বাঁচাও। নিজেকে তুলে ধরো।

'ঈশ্বরকে ডাকবার আমার কী দরকার?' অভিমান করে একদিন বলেছিল বিদ্যাসাগর।

'দেখ না চেঙ্গিস খাঁকে। বিস্তর লুটপাট করে রাজ্যের লোককে বন্দী করলে। প্রায় এক লাখ। সেনাপতিরা প্রমাদ গুণল। বললে, মশাই, এদের এখন খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলেও বিপদ, ছেড়ে দিলেও বিপদ। এই হত্যাকাণ্ডটা তো ঈশ্বর স্বচক্ষে দেখলেন। কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন আমার তাতে দরকার কি। আমার তো কোনো উপকার নেই।'

ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বরের কার্য কে বোঝে! কেনই বা সৃষ্টি করছেন, কেনই বা সংহার! আমি বলি আমার ও বোঝবার দরকার নেই। বাগানে আম খেতে এসেছি আম খেয়ে যাই। কত গাছ কত ডাল কত পাতা তার হিসেবে আমার কাজ কি। আমি চাই ভক্তি, আমি চাই ভালোবাসা। আমি চাই সুস্বাদুকে আস্বাদ করতে।'

গঙ্গাধর গাঙুলিকে—পরে যিনি অখণ্ডানন্দ—আসন শেখাচ্ছেন ঠাকুর। একেবারে ঝুঁকে বসতে নেই, আবার খুব টান হয়েও বসতে নেই। শেখাতে-শেখাতে এক সময় বলে উঠলেন, 'শোন, তোকে বলে রাখি কানে-কানে, খিদের মুখে বাড়া ভাত পেলে খেয়ে ফেলবি। খিদের মুখে যেমন করেই খা, পেট ভরবে।'

তাই আসলে হচ্ছে আস্বাদ। আসলে হচ্ছে ভালোবাসা।

বঙ্কিমকে আবার বলছেন ঠাকুর, 'সংসারী লোকের টাকার দরকার। সঞ্চয় দরকার। কেন না তার মাগ-ছেলে আছে, খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না কে? কেবল পঞ্ছী অউর দরবেশ। পাখি আর সন্ন্যাসী। তেমনি কামিনীও সন্ন্যাসীর ত্যাজ্য। তার কামিনী গ্রহণ করা মানে থুতু ফেলে সেই থুতু খাওয়া।'

আর তুমি সংসারী? কামিনী সম্বন্ধে তোমার সংযম, কাঞ্চন সম্বন্ধে তোমার অনাসক্তি। তোমার ত্যাগ নয়, পরিহার নয়, নিষেধ নয়, আরোপ নয়। তোমার শুধু একটু বেঁকিয়ে দেওয়া। কামের থেকে প্রেমে চলে আসা। আত্ম থেকে আত্মায়। বন্ধ দেয়ালের দেশ থেকে উন্মুক্ত সমুদ্রে।

'আচ্ছা, তুমি কি বলো?' প্রশ্ন করলেন বঙ্কিমকে। 'আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?'

'বা, আগে পাঁচটা জানতে হবে বৈকি। এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানব কেমন করে?'

'তোমাদের ঐ এক কথা। আগে ঈশ্বর তারপর সৃষ্টি। আগে যদু মল্লিক তারপর তার ধন-দৌলত। ১-এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। ১-কে মুছে ফেল সব শূন্য। এককে নিয়েই অনেক। এক আগে তারপর অনেক। আগে ঈশ্বর তারপর জীবজগৎ।' অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে দেখলেন বঙ্কিমকে: 'আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও।'

বঙ্কিম হাসল। 'আম পাই কই?'

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়তো অন্তত সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন—'

'কে, গুরু? তাঁর কথা বলবেন না। ভালো আমটি নিজে খেয়ে খারাপ আমটি আমায় দেবেন।'

'তা কেন? যার যা পেটে সয়। সকলে কি পলুয়া-কালিয়া হজম করতে পারে?

যে দুর্বল যার পেটের অসুখ তার পথ্য মাছের ঝোল।'
ত্রৈলোক্য সান্যাল গান ধরল। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। সবাই ঘিরে ধরল। ভিড় ঠেলে বঙ্কিমও এল এগিয়ে। একদৃষ্টে দেখতে লাগল ঠাকুরকে। অচ্যুতচিন্তায় কখনো কাঁদছেন, কখনো হাসছেন, কখনো নাচছেন, গান করছেন, অলৌকিক কথা বলছেন, কখনো বা শ্রীহরির লীলাভিনয় করছেন, কখনো বা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত তূষ্ণী হয়ে আছেন। কৃতকৃতার্থ ভক্তের কথা সেই যে পড়েছিল বঙ্কিম, এ যে তারই প্রতিমূর্তি।
কে এই পুরুষ? নাম টাকা মান বৈভব কিছু চায় না, শুধু প্রেমানন্দ চায়, যে প্রেম ঈশ্বর থেকে উৎসারিত। প্রেমানন্দই ভূমানন্দ। কিছু চাই না অথচ ভালোবাসি—এর নামই ভূমা। উদ্দেশ্য যা উপায়ও তাই। উদ্দেশ্য ভালোবাসা উপায়ও ভালোবাসা। ভালোবেসেই বিশ্বকে আপন করা। সেই বিশ্বানন্দই ব্রহ্মানন্দ।
অনিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে বঙ্কিম। দেখছে ঠাকুরের নৃত্য। কীর্তনকদম্ব-স্ফূর্তি।
কীর্তনান্তে সকলকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর। বললেন, 'ভাগবৎ-ভক্ত-ভগবান জ্ঞানী-যোগী সকলের চরণে প্রণাম।'
বিগলিত হল বঙ্কিম। সন্ন্যাসের আসল কি অর্থ তা যেন বুঝল নতুন করে। শুধু স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নয়, এই বিশ্বজগৎ আমার আত্মার বিস্তৃতি, সুতরাং আমারই আপনার লোক। তাই যদি হয় তবে এই অনন্ত আত্মীয়ের রাজ্যে শুধু পরিমিত পরিজন নিয়ে সুখী আছি কি করে? অঙ্গনকে পরিমুক্ত করো, প্রসারিত করো। এই প্রসারণই সন্ন্যাস। সন্ন্যাস সংসারের সঙ্কোচন নয়, সংসারের বিস্তৃতিই সন্ন্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বসংসারী, তাই আসল সন্ন্যাসী। সর্বত্যাগী হয়েও তাই সর্বগ্রাহী।
'ভক্তি কেমন করে হয়?' জিগগেস করল বঙ্কিম।
'ব্যাকুলতায়। ছেলে যেমন মা'র জন্যে দিশেহারা হয়ে কাঁদে সেই ব্যাকুলতায়। উপরে ভাসলে কী হবে? ডুব দাও কান্নাসাগরে, তবেই পান্না উঠবে। গভীর জলের নিচে রত্ন, জলের উপর হাত-পা ছুঁড়লেই তো রত্ন ভেসে উঠবে না। রত্ন যে ভারি, জলে ভাসে না, তলিয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে ঠেকেছে। তাই ডোবো। তলিয়ে যাও।'
'কি করি! পেছনে যে শোলা বাঁধা।'
'কাল-পাশ কেটে যাবে, এ তো মাত্র শোলা! তাঁকে মনন করো, তাঁকে ডাকো, তাঁতে নিমজ্জিত হও! ডুব না দিলে কিছু হবে না। একটা গান শোনো।' বলে গান ধরলেন :

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন,
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্নধন।

ঘর ছেড়ে মাঠে এসো। ঘরের মধ্যে এক চিল্‌তে আলো ছাদের ফাঁক দিয়ে আসছে। যে ঘরের মধ্যে আছে তার আলো-জ্ঞান ঐটুকু। যার ঘরের বেড়ায় অনেক ছ্যাঁদা, সে

বেশি আলো দেখতে পায়। যে দরজা-জানলা খুলে দিয়েছে সে পায় আরো দেখতে। কিন্তু যে চলে আসতে পেরেছে মাঠে তার আলোয় আলো। আত্মবোধ থেকে চলে এসো বিশ্ববোধে।
'কেউ-কেউ ডুব দিতে চায় না। বলে ঈশ্বর-ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব?' নিবিড় স্নেহে তাকালেন বঙ্কিমের দিকে। 'ঈশ্বর এমন রস যাতে লোকে সুস্থ হয় স্নিগ্ধ হয় সুন্দর হয়। সে অমৃতের সাগরে ডুবলে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে—'
ঠাকুরকে প্রণাম করল বঙ্কিম। বিদায় নিল। বললে, 'আমাকে যত আহাম্মক ঠাওরে-ছেন আমি হয়তো তত নই।'
ঠাকুর হাসলেন। ঠাকুরের কি বুঝতে বাকি আছে কোন উপাদান দিয়ে বঙ্কিম তৈরি! অন্তরগহনে রয়েছে তার ভক্তির উৎস, অন্তঃসলিলা ভক্তির প্রবাহিনী।
আঠারো বছর বেদান্ত রগড়াচ্ছি, তবু, বন্ধু—বলছিল এক সাধু—দূরে মলের শব্দ শুনতে পেলে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সংসার থেকে মন উচ্ছিন্ন করা কি সহজ কথা?
'একটি প্রার্থনা আছে।' বঙ্কিম বললে স্নিগ্ধমুখে, 'অনুগ্রহ করে যদি কুটিরে একবার পায়ের ধুলো দেন—'
'তা বেশ তো। ঈশ্বরের ইচ্ছা।'
কি ভাবছিল বঙ্কিম, ভাবতে-ভাবতে বেরিয়ে পড়েছে অন্যমনে। যাকে কেউ টানতে পারে না অথচ যে সকলকে টানে তারই আশ্চর্য শক্তির কথাই ভাবছিল হয়তো। গায়ের চাদর ফেলে এসেছে ভুলে। কে একজন কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে তাকে পৌঁছে দিল চাদর। তবু সম্পূর্ণ খেয়াল নেই। দৃষ্টি নেই বেশবাসে।
কদিন পরে গিরিশ আর মাস্টারকে ডাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'সেই যে বঙ্কিম বলে গেল তার বাড়িতে নিয়ে যাবে একদিন, কই, এল না তো! যাও খোঁজ নিয়ে এস দেখি।'
গিরিশ আর মাস্টার তখুনি রওনা হল। বঙ্কিম কত কথা বললে ঠাকুরের সম্বন্ধে, দিব্য আনন্দের কথা। যাকে না পেয়ে ও যেখান থেকে ব্যাহত হয়ে বাক্য ও মন যুগপৎ নিবর্তন করে তাই তো আনন্দ-পারাবার। বহু মেধা বা শাস্ত্র দ্বারা লভ্য নন, যাকে বরণ করেন একমাত্র তার দ্বারাই লভ্য। সেই অনির্বচনীয় কথা।
বললে, 'যাব আরেকদিন। ডেকে নিয়ে আসব।'
আর যাওয়া হয়নি বঙ্কিমের। যেতে হয় না, তিনিই আসেন নিজের থেকে। ডাকলে তো আসেনই, না ডাকলেও আসেন।
যেমন এসেছেন অধরের মৃত্যুশয্যার পাশে।
মানিকতলায় ডিস্টিলারি পরিদর্শন করতে গিয়েছিল অধর। গিয়েছিল ঘোড়ায় চড়ে। ফিরতি-পথে শোভাবাজার স্ট্রিটে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। ভেঙে গেল বাঁ হাতের কব্জি। শুধু তাই নয়, ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেল। ঠাকুর যখন এলেন, কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে অধরের। তবু চিনতে দেরি হল না। সমস্ত যন্ত্রণা আনন্দাশ্রুতে বিধৌত

হতে লাগল। ঠাকুর কাছে বসে গায়ে হাত বুলুতে লাগলেন। মুখখানি ম্লান, চোখ দুটি করুণকোমল।
অধর চলে গেল অধরায়। মাত্র তখন তিরিশ বছর বয়স। একটা যেন তারা খসে পড়ল। ভবতারিণীর দুয়ার ধরে কাঁদতে বসলেন ঠাকুর। 'মাগো, আমার কেন এত যন্ত্রণা? আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো আমাকে এত সইতে হচ্ছে।'
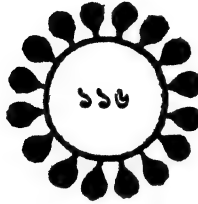
প্রভু, কোন মুখে আমি সুখ চাইব তোমার কাছে, কোন লজ্জায়? যতবার দেহধারণ করে এসেছ একবারও সুখ পাওনি। রামরূপে এলে রাজপুত্র হয়ে, চীরবল্কল ধরে চলে গেলে বনবাসে। চন্দ্রের সঙ্গে চিত্রা-নক্ষত্রের মত সীতাও তোমার অনুগামিনী হল। বনে গিয়ে তোমার কত যন্ত্রণা, কত যুদ্ধ। তারপর সীতাকে যদি-বা উদ্ধার করলে, বসাতে পারলে না সংসারের সিংহাসনে। তাকে পাঠাতে হল নির্বাসনে প্রজানুরঞ্জনের তাগিদে। দগ্ধ হলে দুঃসহ মর্মজ্বালায়। সুখ পেলে না। কৃষ্ণরূপে জন্ম নিলে কারাগৃহে। নিজের মায়ের স্তন্য থেকে বঞ্চিত রইলে। রাজার ছেলে হয়ে মানুষ হলে গোপের ঘরে। সারাজীবন ধরেই যুদ্ধ আর দুষ্টদলন করতে হল, সুখ কাকে বলে শান্তি কাকে বলে জানতে পেলে না। শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করলে আপ্রাণ, তবু দায়ী হলে কুরুক্ষেত্রের অশান্তির জন্যে। মাথা পেতে নিলে কত অভিশাপ। চোখের সামনে মরতে দেখলে আত্মীয়বৃন্দকে, শেষে অতর্কিত ব্যাধশরে প্রাণ দিলে। আর এখন রামকৃষ্ণরূপে ভুগছ দুরারোগ্য ব্যাধিতে। কোন লজ্জায় বলব, আমি সুখ চাই, আমাকে সুখ দাও!
ঠাকুরের গা ঘেঁষে বসেছে দুর্গাচরণ। ওগো বসো বসো আমার গা ঘেঁষে। তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার দগ্ধ শরীর শীতল হবে। দুর্গাচরণকে জড়িয়ে ধরলেন, ঠাকুর। বললেন, 'ডাক্তার-কবরেজরা সব হার মেনেছে। তুমি জানো কিছু ঝাড়ফুঁক? কিছু করতে পারো উপকার?'
মুহূর্তে একটা উদ্দাম চিন্তা খেলে গেল মনের মধ্যে। বিদ্যুৎঝলকের মত। মুহূর্তেই সঙ্কল্পে দৃঢ়ীভূত হল। বললে, 'পারি। আপনার কৃপায় সব পারি। আপনার কৃপায় রোগ সারাতে পারি আপনার।'
পারো?

অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন ঠাকুর। দুর্গাচরণ নিজের শরীরে ঠাকুরের ব্যাধি টেনে নিতে চাইছে। সহসা তাকে দুই হাতে ঠেলে দিলেন জোর করে। বললেন, 'তা তুমি পারো, জানি, তুমি পারো রোগ সারাতে। কিন্তু সারিয়ে দরকার নেই। সরে যাও, সরে যাও এখান থেকে।'

প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসে, আসে সুরেশ দত্তর সঙ্গে। শুধু নাম শুনেছে আর বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় দক্ষিণেশ্বর? তাও জানে না। উত্তরে যাও। উত্তরে গেলেই উত্তরং মিলবে। দেখবে সেখানেই বসে আছেন সুদক্ষিণ।

চলেছে পায়ে হেঁটে। চলেছে তো চলেইছে। শেষে একজনকে জিগগেস করলে। দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারেন? সে কি মশাই? দক্ষিণেশ্বর যে ছাড়িয়ে এসেছেন।

দুপুর দুটোর সময় মন্দিরে এসে পৌঁছুলেন দুজন। কাউকে চিনি না, কোথায় থাকেন সেই ত্রিদশকুলেশ, কাকে জিগগেস করি? একজন দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ। ইনিই বলতে পারবেন হয়তো।

'হ্যাঁ মশাই, এখানে একজন সাধু থাকেন?'

দাড়িওলা লোক আর কেউ নয়, প্রতাপ হাজরা। বললে, 'হ্যাঁ, একজন আছেন বটে, কিন্তু আজ তো এখানে নেই।'

নেই? বসে পড়ল দুজনে। কোথায় গিয়েছেন?

'চন্দননগরে গিয়েছেন। কবে ফিরবেন কে জানে। তোমরা আরেকদিন এস।'

অবসন্ন পায়ে আবার ফিরে চলো কলকাতা। হৃতসর্বস্বের মতো ফিরে চলো। কিন্তু, ওমা, ঐ দেখ ঘরের মধ্য থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে হাতছানি দিয়ে কে ডাকছে। আর কে! ঐ সেই অনন্তাত্মা মহোদধি। অমানীমানদ লোকস্বামী। প্রতাপ হাজরাকে উপেক্ষা করে সটান ঢুকল ঠাকুরের ঘরে। ছোট তক্তপোশটির উপর পা ছড়িয়ে বসে আছেন ঠাকুর।

বারো বছর ধরে ঠাকুরের ছায়ায় বাস করছে হাজরা, তবু চিনতে পারল না ঠাকুরকে। শুধু সাধারণ সত্য কথাটুকুও বলতে শিখল না। কি করে শিখবে, কি করে চিনবে তিনি যদি না কৃপা করেন! তাঁর হাতেই ফুট-কম্পাস, চেন-দড়ি, তিনি না ছেড়ে দিলে মাপবে কি দিয়ে?

হৃদয়ের সঙ্গে সেই একবার কালীঘাটে গিয়েছিলেন ঠাকুর। দেখলেন পুবের পুকুর-পাড়ে কচুবনের মধ্যে কালী কুমারীবেশে আর কতগুলো কুমারীর সঙ্গে ফড়িং-ধরার খেলা করছেন। দেখেই ঠাকুর মা-মা বলে ডেকে উঠলেন আর সমাধিস্থ হলেন। সমাধি-ভঙ্গের পর মন্দিরে এসে দেখলেন যে শাড়ি পরে কুমারীবেশে খেলা করছিলেন কালী ঠিক সেই শাড়ীখানিই মূর্তির গায়ে জড়ানো। ওরে হৃদে, একেই যে তখন দেখলুম ছুটোছুটি করছে—

সব শুনে হৃদয় ক্ষেপে উঠল। বললে, 'তখন বলোনি কেন? ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতুম মাকে।'

'তা কি হয় রে!' ঠাকুর বললেন, 'তিনি যদি কৃপা করে না ধরা দেন কে তাঁকে ধরে!

কে তাঁর দর্শন পায়!'

সুরেশ দত্ত প্রণাম করল করজোড়ে। কিন্তু দুর্গাচরণ আরো বেশি যায়। তার উর্জী ভক্তি। প্রসাদের সঙ্গে সে শালপাতার ঠোঙা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে সে গেল ঠাকুরের পদধূলি নিতে। তুমি হলে জ্বলন্ত আগুন, তোমাকে কি পা ছুঁতে দিতে পারি? ঠাকুর পা সরিয়ে নিলেন।

বললেন দুর্গাচরণকে, 'সংসারই তোমার পীঠস্থান। সংসারেই থাকবে। থাকবে পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকের মধ্যে ডুবে আছে কিন্তু গায়ে পাঁকের স্পর্শলেশ নেই। তেমনি গৃহে থাকো কিন্তু তার ময়লা যেন না লাগে। থাকো জনকের মত। তোমাকে দেখে লোকে শিখুক কাকে বলে গৃহাশ্রমী।'

যে বিষয়ে যযাতি ভোগী সেই বিষয়েই জনক রাজর্ষি। যে অভিমানে দুর্যোধনের সর্বনাশ সেই অভিমানেই ধ্রুবের সত্যলোকে অধিষ্ঠান।

উপদেশ তো শুনলুম, মানব তা অক্ষরে-অক্ষরে, কিন্তু দুটি হাত ভরে যে পদস্পর্শ নিতে দিলে না এ দুঃখ আমি রাখব কোথায়? অন্তরের নির্জনে বসে কাঁদতে লাগল দুর্গাচরণ। শুনেছি তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, তুমি শুনবে না আমার এই বেদনার নিবেদন? আমি আগুন নই, আমি জল, আমি গলিত-স্খলিত অমল প্রেমাশ্রু। একবারটি স্পর্শ করতে দাও তোমাকে। শীতাংশু সুধা-সমুদ্রের দুটি ঢেউ, তোমার দুটি পাদপদ্ম।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করত দুর্গাচরণ। একদিন দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছে একা-একা। তাকে দেখে ঠাকুর মহা খুশি। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি ডাক্তারি করো, দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে?'

দুর্গাচরণ বসে পড়ল পায়ের কাছে। তীক্ষ্ম চোখে দেখতে লাগল পা দুখানি। স্পর্শ করা বারণ, চোখ দিয়েই পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বললে কুণ্ঠিতের মত, 'কই, কোথাও তো দেখছি না কিছুই।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'ভালো করে দেখ না কি হয়েছে।'

এতক্ষণে বুঝল দুর্গাচরণ। পা দুখানি চেপে ধরল দুহাতে। মাথা লুটিয়ে দিল পায়ের উপর। অন্তর্যামী শুনেছেন অন্তরের ঈপ্সা। আগুনকে অশ্রু করেছেন।

কিন্তু, প্রভু, আরো প্রার্থনা আছে। ইচ্ছে করে তোমার সেবা করি। বেশ তো, ঠাকুর তাকে নানা ফরমাশ খাটাতে লাগলেন। ওরে তামাক সেজে দে, গামছা আর বটুয়া নিয়ে আয়, গাড়ুতে জল ভর, নিয়ে চল ঝাউতলায়। দুর্গাচরণ এক পায়ে খাড়া। ডাকলেই হল বললেই হল, যেখান থেকে পারি যেমন করে পারি সম্পন্ন করে দেব। তুমি যদি বলো নিয়ে আসব অকালের আমলকী।

একদিন বললেন হাওয়া করতে। পাখাখানি তুলে দিলেন দুর্গাচরণের হাতে। বললেন, আমি একটু ঘুমুই।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ফুটি-ফাটা মাঠে কাঠ-ফাটা রোদ। সমানে হাওয়া করছে দুর্গাচরণ। হাত ব্যথা করছে তবু ক্ষান্ত হচ্ছে না। পাখা বন্ধ করলেই যদি জেগে ওঠেন। আমার অসামর্থ্যের জন্যে প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে? কখনো না। হাত ভেরে উঠল, তবু

ছাড়ছে না পাখা। হাত ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়, তবু না। ওকি, ঠাকুর যে নিজেই হাত ধরে পাখা বন্ধ করে দিলেন। তবে কি ঠাকুর ঘুমুননি?

দুর্গাচরণ বলে, 'ঠাকুরের ঘুম সাধারণ নিদ্রাবস্থা নয়। তিনি সর্বদাই জেগে রয়েছেন। আর সকলে ঘুমোয় কিন্তু ভগবানের চোখে ঘুম নেই।'

একদিন বললেন তাকে ঠাকুর, 'ডাক্তার উকিল মোক্তার দালাল—এদের ঠিক-ঠিক ধর্মলাভ হওয়া কঠিন। এতটুকু ওষুধে যদি মন পড়ে থাকে তবে আর কি করে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হবে?'

এখন তবে উপায়?

উপায় সহজ। দুর্গাচরণ ওষুধের বাক্স আর চিকিৎসার বই ফেলে দিল গঙ্গায়। দ্বিধার কুশাঙ্কুরটিও বিন্ধ করল না।

দেশে ফিরেছে দুর্গাচরণ। উন্মনা, উদাসীন। বাপ দীনদয়াল অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। বললেন, 'ডাক্তারি যে ছেড়ে দিলি এখন করবি কি?'

'আমি কে করবার? যা হয় ভগবান করবেন।'

'তোর মুণ্ডু করবেন। বুঝতে আর আমার বাকি নেই।' দীনদয়াল বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন। 'এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি আর ব্যাঙ ধরে খাবি।'

বাবার যখন তাই ইচ্ছে, তবে তাই হোক। পলকে পরনের কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল দুর্গাচরণ। উঠোনের কোণে পড়ে ছিল একটা মরা ব্যাঙ, তাই তুলে এনে মুখে পুরলে। চিবোতে-চিবোতে বললে, 'আপনার দু আদেশই পালন করলাম। এখন কৃপা করে আমার একটি অনুরোধ রাখুন। সংসারের কথা আর ভাববেন না। এখন জপ করুন ইষ্টনাম।'

বাড়ির লাউগাছটির কাছে গরু বাঁধা। দড়িটা ছোট, তাই আকণ্ঠ চেষ্টা করেও গাছের নাগাল পাচ্ছে না গরু। ক্ষুধার্ত দুই চোখে লোলুপ কাতরতা। ও মা, খাবি, খেতে সাধ গিয়েছে? নে, খা, তৃপ্তি করে খা। দড়িটা খুলে দিল দুর্গাচরণ। মুহূর্তে গাছটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

'জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে।' এই বলে নিজে মিষ্টি বা নুন খায় না দুর্গাচরণ। কিন্তু পরকে খাওয়ায় সাধ্যমত। সে গরুই হোক আর পাখিই হোক। অতিথিই হোক বা ভিখিরিই হোক। তুমি প্রীত হও, তৃপ্ত হও। ইষ্ট ছাড়া আমার আর কিছু মিষ্ট নেই। অশ্রু ছাড়া আমার আর নেই কিছু লবণাক্ত।

কলকাতার বাসার আদ্ধেকটায় কীর্তিবাস থাকে। চালের ব্যবসা করে। কুঁড়ো জমে থাকে তার আড়তে। তাই দুর্গাচরণ কুড়িয়ে নিয়ে এসে গঙ্গাজল মাখিয়ে খায়। বলে, 'যা হোক কিছু খেয়ে জীবনধারণ করলেই হল, ভালো-মন্দ বিচারের প্রয়োজন কি? শুধু আহার আর তার আস্বাদ নিয়েই থাকব, তবে কখনই বা ডাকব ভগবানকে, আর কখনই বা তাঁর মনন করব? কুঁড়ো খেয়ে দিব্যি হালকা আছি।'

কাউকে হঠাৎ নিন্দা করে ফেলেছে বা কারু উপর রাগ দেখিয়েছে অমনি আত্মপীড়ন শুরু হয়ে গেল। আর নিন্দে করবি? রোষভাষ করবি? রাস্তা থেকে এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে এনে ঘা মারতে লাগল কপালে। বল আর অবাধ্য হবি? মানবিনে

শৃঙ্খলা? কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সে ঘা শুকোতে এক মাস। হবে না? একশোবার হবে। যে যেমন পাজি তার তেমনি শাস্তি হওয়া দরকার।
'অহং-শালাকে ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে তার মাথা ভেঙে দিয়েছেন নাগমশাই।' বলছে গিরিশ ঘোষ। বলছে, 'নরেনকে আর নাগমশাইকে বাঁধতে গিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছেন মহামায়া। নরেনকে যত বাঁধেন সে ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। শেষে নরেন এত বড় হল যে মায়া হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলেন। নাগমশাইকে যত বাঁধেন সে ততই সরু হয়। ক্রমে এত সরু হলেন যে মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন পালিয়ে। ধরতে পেলেন না মহামায়া।'
আমি ক্ষুদ্র, আমি শুদ্র—এই বুলিই নাগমশায়ের মুখে। তোমাদের মুখে ও কিসের কথা? বিষয়প্রসঙ্গ রাখো। রামকৃষ্ণের কথা কও। আর সব কথার ইতি আছে। ঈশ্বরকথার ইতি নেই।
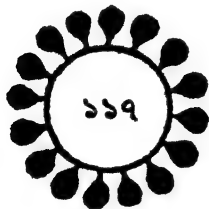
ঢ্যামনা সাপে ধরলে মরে না কিন্তু জাত-সাপে কামড়ালে এক ডাক, দু ডাক, তার পরেই মরণ। বললেন গিরিশ ঘোষকে।
তোর যা খুশি তাই কর। আমি যখন তোর ভার নিয়েছি তোর জন্মমরণের মরণ হয়ে গিয়েছে।
আমি দেখেছি মা-কালীর গা থেকে এক কৃষ্ণবর্ণ শিশুর উদ্ভব হল, হাতে সুধাভাণ্ড ও পানপাত্র। দেখেছি পান করতে-করতে দিব্যানন্দে বিভোর সেই শিশু। সেই শিশুই এই গিরিশ। ভৈরবের অংশে জন্ম তাই মদ্যপানে অনুরাগ।
কি দয়া! আমার এই অপরাধকে অপরাধ বলেই ধরলেন না। গিরিশ ভাবছে তদ্‌গত হয়ে। যে অপরাধে বাপ পর্যন্ত ত্যাজ্যপুত্তর করে তাও তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎ।
মঙ্গলমুলমুদ্রা শ্রীসুন্দরীর পূজারী আমি। তাঁর এক হাতে ভোগ আর এক হাতে মোক্ষ। তেমনি আবার বামে বামা দক্ষিণে মদপাত্র, মুখে জপসাধন মস্তকে শ্রীনাথ। আর হৃদয়ে? আনন্দ হৃদয়াম্বুজে।
ঠাকুরের অসুখ। বসে আছেন বিছানার উপর। মেঝের উপর মাদুর পাতা। ভক্তেরা রাত জাগে পালা করে। ঠাকুরের প্রায় ঘুম নেই। পাহারাদার ভক্তেরাও বিনিদ্র। লাটু আর মাস্টারের সঙ্গে গিরিশও চলে এল উপরে। মাদুরের উপর বসল।

ঘরের কোণের আলোটি গেল আড়াল হয়ে।
ওগো আলোটি কাছে আনো। আমি গিরিশকে একটু দেখি।
মাস্টার আলোটি কাছে এনে ধরল।
'ভালো আছ?' গিরিশকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।
ভালো আছি কিনা জানি না কিন্তু তোমার এই দয়াভরা প্রশ্নটিতেই ভালো হয়ে গেলাম সর্বাঙ্গে। তোমার করুণা সর্বসাধিনী।
'ওরে এঁকে তামাক খাওয়া। পান এনে দে।' লাটুর প্রতি হুকুমজারি করলেন।
লাটু পান-তামাক নিয়ে এল।
তাতে কি তৃপ্তি আছে?
কিছুক্ষণ পরে আবার উঠলেন চঞ্চল হয়ে, 'ওরে কিছু জলখাবার এনে দে।'
'পান-টান দিয়েছি।' লাটু বললে, 'দোকান থেকে আনতে গেছে জলখাবার।'
কে এক ভক্ত ক'গাছা ফুলের মালা নিয়ে এসেছে। গলায় পরলেন সেগুলো একে-একে। পরলেন, না, আর কাউকে পরালেন? আর কাউকে পরালুম। হৃদয়মধ্যে যে হরি আছেন তাঁকে পরালুম।
দুগাছি মালা তুলে নিলেন গলা থেকে। গিরিশকে বললেন, 'এগিয়ে এস।' গিরিশ এগিয়ে আসতেই তার গলায় উপহার দিলেন।
'ওরে জলখাবার কি এল?' আবার উঠলেন অস্থির হয়ে।
অসুখ, ঘুম নেই, এত যন্ত্রণার মধ্যেও এত মমতা! এত করুণা! মানুষ ভগবান নয় তো কে ভগবান!
সেইদিন তাই কথা হচ্ছিল বলরাম-মন্দিরে। ঠাকুর বললেন গিরিশকে, 'তুমি একবার নরেনের সঙ্গে বিচার করে দেখ, সে কি বলে।'
'দেখেছি। সে মানতে চায় না। বলে ঈশ্বর অনন্ত। যে অনন্ত তার আবার অংশ কি! তার অংশ হয় না।'
'হয়।' বললেন ঠাকুর, 'ঈশ্বর ইচ্ছে করলে তাঁর সারবস্তু পাঠাতে পারেন মানুষের মধ্য দিয়ে। শুধু পারেন না পাঠান। এ তোমাদের উপমা দিয়ে কি বোঝাব? গরুর মধ্যে গরুর শিংটা যদি ছোঁও, গরুকেও ছোঁয়া হল। পা বা লেজ ছুঁলেও তাই। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর সারবস্তু হচ্ছে দুধ। বাঁট দিয়ে সেই দুধ আসে। অবতার হচ্ছে গাভীর বাঁট।' থামলেন ঠাকুর। আবার বললেন, 'তেমনি প্রেমভক্তি শেখাবার জন্যে মানুষের দেহ ধারণ করে মাঝে-মাঝে আসেন ঈশ্বর।'
পরশরতন শুনেছ এবার শোনো মানুষরতন। অবতারই হচ্ছে সেই মানুষরতন।
'নরেন বলে,' গিরিশ বললে, 'ঈশ্বরের ধারণা কে করতে পারে? তিনি অন্তহীন।'
'হোন। তাঁকে ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে একবার দেখতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখা মানেই তাঁকে দেখা। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে আসে, সে বলে গঙ্গা দর্শনস্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। তোমার পা-টা যদি ছুঁই তোমাকেই ছোঁয়া হল। তাই নয়? আগুন সব জায়গায় আছে তবে কাঠে বেশি।'

'তাই যেখানে আগুন পাবো সেখানে আগুন পোয়াবো।' গিরিশ বললে তৃপ্ত মুখে।
'তেমনি ঈশ্বর যদি খোঁজো, মানুষে খুঁজবে—'
রূপে-রূপে রূপ মিশায়ে আপনি নিরাকার।
'মানুষেই তেমনি তাঁর বেশি প্রকাশ, বিশেষ প্রকাশ। যে মানুষে দেখবে প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে, ঈশ্বরের জন্যে যে পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চয় জেনো তিনি অবতীর্ণ। যিনি তারণ করেন তিনিই অবতার।'
'কিন্তু নরেন্দ্র বলে তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর—'
'মনের গোচর নয় বটে কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর। বুদ্ধির গোচর নয় বটে শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।' বললেন ঠাকুর, 'ঋষিমুনিরা কি তাঁকে দেখেননি? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।'
'কিন্তু যাই বলুন, নরেন আমার কাছে তর্কে হেরে গেছে।'
হেরে গেছে? ঠাকুর চমকে উঠলেন। অবতার-তত্ত্ব মানে না, নরেনের হেরে যাওয়াই তো উচিত একশো বার তবু তাঁর নরেন হারবে এ যেন সহ্যের বাইরে।
বললেন, 'না, হারেনি। আমায় এসে বললে গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে এত বিশ্বাস, তার আমি কি বলব! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে নেই। তাই ছেড়ে দিল তর্ক।'
নরেন মানে না, তবু নরেনকে ভালোবাসেন। নরেন তর্কে হেরে যাবে এ অসহনীয় লাগে। আর, এ কেমনধারা তর্ক? যে তর্কে স্বয়ং ঠাকুরকে বাতিল করে দিচ্ছে। আমি নস্যাৎ হই তো হব তবু নরেন জিতুক। আমাকে হারিয়ে ওর যে জিত সে তো আমারও জিত।
একদিন ও ঠিক বুঝবে। এমন অগাধ যার হৃদয় সে বুঝবে না? বুঝবে আমার অবতারতত্ত্বের মানে কি।
মানে হচ্ছে এই, সকলেই তাঁর অবতার, সকলেই তাঁর প্রতিচ্ছায়া। 'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবই যে তাঁর অবতার। তুই নতুন লীলা কি দেখাবি তাঁর নিত্যলীলা চমৎকার।' আমি নিয়ে এসেছি এই মহতী প্রতিশ্রুতি এই বৃহতী সম্ভাবনা। মানুষকে প্রমাণিত হতে হবে প্রকাশিত হয়ে। প্রকাশিত হবে সে কখন? যখন সে তার অন্তরের অমৃতময় অমিততেজ পুরুষকে উদ্ঘাটিত করতে পারবে, উন্মোচিত করতে পারবে। সেখানেই সে অবতার, ঈশ্বর সমান।
ঠিক বুঝবে একদিন নরেন। জীবকে শুধু জীবজ্ঞানে সেবা করবে না, জীবকে শিব-জ্ঞানে পূজা করবে। সে পূজা ভালোবাসা! সে পূজা দুঃখমোচন, কলঙ্কমোচন। অপমানের অবহেলার উচ্ছেদ। সত্তাসীমার সম্প্রসার।
রাষ্ট্র হবে নতুন জীবনবেদ, নবতর সাম্যবাদ। শুধু পঙক্তি সমান নয় পাত্র সমান। শুধু ভোগের বস্তু সমান নয়, ভোগ করার ক্ষমতাও সমান। শুধু—পরিবেশনে সমান নয় আস্বাদনেও সমান।
'ওরে এল জলখাবার?' আবার চঞ্চল হলেন ঠাকুর।
মাস্টার পাখা করছিলেন, বললেন, 'আনতে গেছে। এই এল বলে।'

কে না কে গিরিশ তাকে খাওয়াবার জন্যে ঠাকুরের এত ব্যাকুলতা—গিরিশ যেন এ করুণার-পারাপার দেখছে না! বাঁধা-বরাদ্দ অনেক পেয়েছে সে, এ যে উপরি-পাওনা! উপরি-পাওনার শেষ নেই।

এসেছে খাবার। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি আর মিষ্টি। সেই বরানগরে ফাগুর দোকান।

ঠাকুর আগে প্রসাদ করে দিলেন। তারপর খাবারের থালা ধরে দিলেন গিরিশের হাতে। বললেন, 'বেশ কচুরি। খাও।'

ভুখা কি দুহাতে খায়? তবু গিরিশের ইচ্ছে হল ঠাকুরকে খুশি করার জন্যে খায় সে গোগ্রাসে।

খাবার দিয়েছি, এবার জল দিতে হয়। ঐ তো আমার কুঁজো, ওখান থেকে গড়িয়ে দিলেই হবে। উঠে পড়লেন ঠাকুর। রুগ্ন, দুর্বল, পা টলছে, তবু এগিয়ে চললেন কুঁজোর দিকে। রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে রইল ভক্তেরা। গিরিশও স্তম্ভিত। বাধা দেবার কথা ওঠে না, সবাই দিব্যানন্দে বিনিশ্চল।

ঠিক জল গড়ালেন কুঁজো থেকে। বোশেখ মাস, গ্লাশ থেকে খানিকটা জল হাতে নিয়ে অনুভব করলেন যথেষ্ট ঠাণ্ডা কিনা। যতটা ভেবেছিলেন ততটা নয়। কিন্তু কি আর করা যায়! এর চেয়ে ঠাণ্ডা আর পাবেন কোথায়! অগত্যা তাই দিলেন এগিয়ে।

খাদ্য খেয়ে পেট ভরে, রসনার তৃপ্তি হয়। জল খেয়ে গলা ভেজে, বুক জুড়োয়। কিন্তু এ যে খাচ্ছে গিরিশ এ কি খাদ্যপানীয়? কোন ক্ষুধা কোন তৃষ্ণার নিবারণ হচ্ছে কে জানে?

খেতে-খেতে বললে গিরিশ, 'দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবেন।'

ঠাকুর যেন খুশি হলেন না। কথা বলতে কষ্ট হয়, তাই আঙুল দিয়ে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে ইশারায় জিগগেস করলেন, 'তার পরিবার-পরিজনের খাওয়া-দাওয়া হবে কি করে? চলবে কি করে সংসার?'

'তা জানি না।'

এ সেই দেবেন মজুমদার। বলে দিয়েছিলেন ঠাকুর, তোমার বাড়ি যাব একদিন। এই ধরো সামনের রবিবার। দেখো, তোমার আয় কম, বেশি লোকজন ডেকো না। আর, বাড়িও তোমার সেই কোথায়! গাড়িভাড়াও দুর্মূল্য।

দেবেন্দ্র হাসল। বললে, 'হলই বা আয় কম, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—'

কথা শুনে ঠাকুরের কি হাসি! যে করেই হোক আমার ঘি খাওয়া চাই। অন্যে ঠকুক আমি ঠকতে পারব না। খবর যখন পেয়েছি চেয়ে-চিন্তে চুরি করে আদায়-আস্বাদ করতেই হবে।

নিমু গোস্বামীর লেনে দেবেনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বাড়ি পৌঁছেই বললেন, 'আমার জন্যে খাবার কিছু কোরো না, অতি সামান্য, শরীর তত ভালো নয়।'

কুল্‌পি-বরফ তৈরি করেছে দেবেন। তাই খেয়ে ঠাকুরের মহানন্দ। গান ধরেছেন ভাবোল্লাসে :

এসেছেন এক ভাবের ফকির—
ও সে হিন্দুর ঠাকুর, মুসলমানের পীর॥

সকলের সকল। একলার একলা। কারুর ভাব আমি নষ্ট করিনে। যে নষ্ট-ভ্রষ্ট তারও না। শুধু একটু বেঁকিয়ে দিই। শুধু যে পাপী তাকে বলি মায়ের সন্তান বলে নিজেকে ভাবতে। যেথা খুশি সেথা যাও যাহা খুশি তাহা করো, শুধু মাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, মাকে সঙ্গে নিয়ে করো। যে মুহূর্তে মা তোমার সঙ্গে সে মুহূর্তে তুমি শুদ্ধ তোমার কর্ম শুদ্ধ তোমার চিন্তা শুদ্ধ। মা তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যা মঙ্গলের ক্ষেত্র, এমন কাজে প্রেরিত করবে যা সৌন্দর্যের কর্ম। পৃথিবীতে সর্বত্র মা-তে ওতপ্রোত হও। ভূ-তে থেকে মা-তে প্রসারণ, তারই নাম ভূমা।

'রামবাবু আপনার কথা লিখেছেন বইয়ে।' কে একজন বললে ঠাকুরকে।

'সে আবার কি!'

'পরমহংসের ভক্তি—এই নিয়ে।'

'তবে আর কি।' ঠাকুর বললেন সহাস্যে, 'এবার রামের খুব নাম হবে।'

গিরিশ টিপ্পনি কাটল। 'সে বলে সে আপনার চেলা।'

'আমার চেলাটেলা কেউ নেই।' ঠাকুর বললেন বিগলিত হয়ে, 'আমি রামের দাসানুদাস।'

আমি অণুর অণু, রেণুর রেণু। আমি তৃণের তৃণ, ধূলির ধূলি। 'আমি' খুঁজতে-খুঁজতে 'তুমি' এসে পড়ে। তুমি তুমি তুমি।

'খুব কুলপি খেয়েছি।' গাড়িতে উঠে বলছেন মাস্টারকে : 'তুমি নিয়ে যেও আরো গোটা চার-পাঁচ—' বালকের মত আনন্দ করছেন।

ঠাকুরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরল দেবেন। দেখল উঠোনে তক্তপোশের উপর কে একটা লোক ঘুমিয়ে আছে। কাছে গিয়ে ঠাহর করে দেখল পাড়ারই বাসিন্দে। ওঠো, ওঠো, ডাকল তাকে দেবেন। লোকটি উঠে বসে চোখ মুছতে-মুছতে বললে, 'পরমহংসদেব কি এসেছেন?' সবাই হেসে উঠল। এসেছেন কি মশাই, এসে চলে গেছেন। সর্বস্বান্তের মত তাকিয়ে রইল লোকটি। সেই কখন থেকে বসে আছে ঠাকুর দর্শনের আশায়। তখনো আসেননি, বসে থেকে-থেকে তাই একটু শুয়ে পড়েছিল, চৈত্র মাস, হাওয়া দিয়েছিল ঝির-ঝির করে। এখন জেগে উঠে দেখে চলে গেছে সেই রাজকুমার।

মোহনিদ্রায় অস্ত গিয়েছে সে স্বর্ণলগ্ন। এখন কাঁদতে বসল অন্ধকারে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু তোমার চোখে তো ঘুম নেই! তুমি আমাকে জাগালে না কেন? এবার তবে জাগাও, স্নিগ্ধ আলোকে না হোক, রুদ্র আলোকে। আনন্দে না হোক, হাহাকারে। আঁধার রাতের রাজা হয়েই তবে দেখা দাও। আমার ছিন্ন শয়ন ধূলায় টেনে তোমার জন্যে আঙিনা সাজাবো।

ঠাকুরের কেবল নরেন-নরেন। তাই নিয়ে অভিমান হয়েছে দেবেনের। সেবার স্টার

থিয়েটারে বৃষকেতু নাটক দেখবার শেষে জমায়েত হয়েছে সকলে। নরেন, গিরিশ, আরো অনেকে। কিন্তু দেবেন আসেনি।
'দেবেন আসেনি কেন?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'অভিমান করে আসেনি।' বললে গিরিশ। 'বলে, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নেই, কলায়ের পোর। আমরা এসে কি করব?'
জলখাবার দিয়েছে ঠাকুরকে, তাই থেকে আবার নরেনকে দিচ্ছেন।
যতীন্দ্র দেব কাছে ছিল, ঠাট্টা করে উঠল। 'আমরা শালারা সব ভেসে এসেছি। শুধু নরেন খাও, নরেন খাও। আর কেউ জানে না খেতে।'
যতীনের থুতনি ধরে আদর করলেন ঠাকুর। বললেন, 'সেখানে, দক্ষিণেশ্বরে যাস। সেখানে গিয়ে খাস।'
অবস্থা প্রায় অচল দেবেনের। জমিদারি সেরেস্তায় দিনে যা কাজ করে তাতে কুলোয় না, তাই মিনার্ভা থিয়েটারে ক্যাশিয়ারির চাকরি নিলে। শুধু ক্যাশিয়ারি নয়, থিয়েটারের এটা-ওটা ফরমাশ খাটো। সময়ে-অসময়ে নটীদের ডেকে আনো তাদের বাড়ি থেকে। ক্রমে-ক্রমে, কাজলের ঘরে কাজ করতে গিয়ে গায়ে দাগ লেগে গেল। অনুতাপে পুড়তে লাগল দেবেন।
নাগমশাই হুঙ্কার দিয়ে উঠল : 'ভয় কি, গুরু আছেন সঙ্গে, ধুয়ে দেবেন।'
সেই কথাই বলছে দেবেন কৃতাঞ্জলি হয়ে। 'জীবনে হীন কাজ করলে ভগবানের পথ থেকে যে জন্মের মত বিচ্যুত হবে এমন কোনো বিধি নেই। কত জঘন্য কাজ যে করেছি তবু করুণাময় ঠাকুর আমাকে ত্যাগ করেননি।'
তাই তো বললেন বিবেকানন্দ, একটানা উন্নতি প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। প্রত্যুত প্রতি পদস্খলনের পরে যে পুনরভ্যুত্থান তাই প্রকৃত মহত্ত্ব।
পুরোনো কথায় ফিরে এল গিরিশ। ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বললে, 'আচ্ছা মশাই, কোনটা ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া, না, সংসারের কষ্টে তাকে ডাকা?'
'যারা কষ্টের জন্যে সংসার ছাড়ে তারা হীন থাকের লোক। আমি তো সংসার ছাড়বার দলে নই। আমি লোকেদের বলি এ-ও করো ও-ও করো। সংসারও করো, ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বলি না। কেমন খাচ্ছ কচুরি?'
'ফাগুর দোকানের কচুরি। চমৎকার!' খেতে-খেতে একমুখ হাসল গিরিশ।
'হ্যাঁ, লুচি থাক, কচুরিই খাও। কচুরি রজোগুণের। কচুরিই খাও।'
খেতে-খেতে গিরিশ বললে, 'আচ্ছা মশাই, মনটা এই বেশ উঁচু আছে, আবার নিচু হয় কেন?'
'সংসারে থাকতে গেলেই ওরকম হয়। কখনো উঁচু, কখনো নিচু। কখনো ঈশ্বরচিন্তা হরিনাম করে, কখনো বা কামিনীকাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি, কখনো সন্দেশে বসছে কখনো বা পচা ঘায়ে। কিন্তু মৌমাছি করে কি! মৌমাছি কেবল ফুলে বসে। ফুল ছাড়া আর কিছু তার খাবার নেই।'
দক্ষিণের ছোট ছাদটিতে হাত ধুতে গেল গিরিশ।
মনে পড়ল কতদিন বারাঙ্গনারা কাছে বসে খাইয়েছে। আজ ঠাকুর খাওয়ালেন।

'ওগো অনেকগুলি কচুরি খেয়েছে গিরিশ।' ব্যস্ত হয়ে মাস্টারকে বললেন, 'বলে দাও বাড়িতে আজ আর কিছু না খায়।'
শুধু সুখ দেখেন না কল্যাণ দেখেন। দয়াসারসিন্ধু। কারুণ্যকল্পদ্রুম। শুধু খাওয়ান না, হজমের খবর নেন।
হাত-মুখ ধুয়ে পান চিবুতে-চিবুতে গিরিশ আবার বসল ঠাকুরের কাছটিতে।
'ঐ যে বলেছি পাঁকাল মাছের মত থাকো—'
'রাখুন মশায়, অতশত বুঝি না। মনে করলে সব্বাইকে আপনি ভালো করে দিতে পারেন—কেন করবেন না?' গিরিশ রোক করে উঠল। 'মলয়ের হাওয়া বইলে সব কাঠ চন্দন হয়।'
'কে বললে হয়? সার না থাকলে হয় না চন্দন।'
'অত-শত বুঝি না মশাই—' আবার তম্বি করে উঠল গিরিশ।
'আইনেই ও রকম আছে।'
'আপনার সব বে-আইনি।'
'তবে হ্যাঁ, তেমন ভক্তি যদি হয় আইন নাকচ হয়ে যায়। ভক্তি-নদী ওথলালে ডাঙায় এক-বাঁশ জল।' বললেন ঠাকুর, 'ভক্তি যদি উন্মাদ হয়, বেদবিধি মানে না। দুর্বা তোলে তো বাছে না। যা হাতে আসে তাই নেয়। তুলসী ছেঁড়ে না পড়-পড় করে ডাল ভাঙে।'
আল-বাঁধ, দরজা-চৌকাঠ উঠে যায়। গণ্ডি-চৌহদ্দির চিহ্ন থাকে না!
সেই মধুরভাবিনী পাগলির কথা উঠল। ঠাকুরকে মধুরভাবে ভজনা করে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কাঁদছে অঝোরে। কি হল, কাঁদছিস কেন? জিগগেস করলেন ঠাকুর। পাগলি বললে, মাথা ব্যথা করছে—
'সে পাগলি ধন্য।' গিরিশ হুঙ্কার দিয়ে উঠল : 'যে ভাবেই হোক আপনাকে অষ্ট-প্রহর সে চিন্তা করছে। আর, মশায়, আমি? আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম কি হয়েছি—'
কী ছিলাম? অহঙ্কারী ছিলাম। দক্ষযজ্ঞে দক্ষের অভিনয় দেখে ঠাকুরই বলেছিলেন, দেখেছ, শালা যেন অংখারে মট-মট করছে। গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে উঠতে গিয়েছি, পা পিছলে মরি আর কি। প্রাণভয়ে বলে ফেললাম, ভগবান রক্ষা করো। পরক্ষণেই বলে উঠলাম, থু থু! যদি কখনো প্রেমে ডাকতে পারি ভগবানকে, তবেই ডাকবো, ভয়ে নয়। তাই তো প্রেমের ঠাকুর নেমে এলে। ডাকবার আগে নিজেই ডেকে নিলে।
অলস ছিলাম। এখন সে আলস্য সমর্পণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরূপ প্রেমনির্ভর।
পাপী ছিলাম। এখন কৃষ্ণ লোহা কান্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। যা ছিল সুরা তাই হয়েছে সুধা।
তুচ্ছকে আদর করিনি কোনোদিন। এখন অমানীমানদ হয়েছি। চারদিকে দেখতে পাচ্ছি এক মহারসের প্রকাশ। যা ছিল দণ্ডপলের, তাই এখন অখণ্ড কালের। দেখিনি এতদিন। আজ দেখতে পাচ্ছি। এই দেখতে পাওয়াটাই মুক্তি। সৃষ্টির মুক্তি নয়, দৃষ্টির মুক্তি। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।'
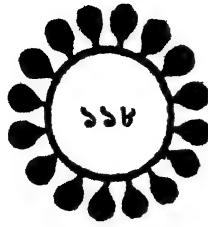
কিন্তু হাজরা একেবারে শুকনো কাঠ। অথচ দালালি জ্ঞান টনটনে!

ঠাকুরের দেশের লোক, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে, চলে এসেছে সংসার ছেড়ে। আমি ছাড়ব বললেই তো সে ছাড়ে না! তাই ঠাকুরের ঘরের পূবের বারান্দায় বসে মালা ফেরায় বটে কিন্তু মন পড়ে থাকে বাড়িঘরে। হাজার টাকা দেনা, শোধ হবে কি করে? বাড়িতে সামান্য যে জমি তা দিয়ে স্ত্রী-পুত্রের পেট চলতে পারে কিন্তু নগদ টাকা জুটবে কোথায়? তাই মালা জপে আর মিটির-মিটির করে তাকায় যদি মিলে যায় কোনো শিষ্যচেলা। যদি ভক্তিভরে মুক্ত করে ঋণভার।

এক নম্বরের তার্কিক। ঠাকুর যত বলেন তর্জনগর্জনে হবে না, হাজরা তত তেড়ে-ফুঁড়ে ওঠে। বলে, 'আমাকে বলছ কি, তুমিও তো ধনীর ছেলে দেখে সুন্দর ছেলে দেখে ভাব করো, ভালোবাসো।'

নরেনের কথা বলছে বুঝি! নরেন আবার হাজরার 'ফেরেণ্ড'। ওরে নরেনের নুন দিয়ে ভাত খাবার পয়সা জোটে না। ওকে দেখলে জগৎ ভুল হয়ে যায়।

সবাইকে কেবল পাটোয়ারি বুদ্ধির মন্ত্র দেবে। সাধন করো তো সকাম সাধন। সব মেহনতের মজুরি আছে, আর সব চেয়ে যে কষ্টের কাজ—এই সব জপ-তপ আসন-শাসন—এর বেলায় ফক্কিকার! চলবে না এ ফাঁকিবাজি। রোদে পুড়তে-পুড়তে যেতে পারব না ফাঁকায়-ফাঁকায়।

সুখ ধনে নয় মনে। সে কথা কে শোনে!

কেবল অহঙ্কার! এত জপ করলাম! ঠায় বসে এত ডাকলাম রুদ্ধনিশ্বাসে। আমার হবে না তো হবে কার!

হবার মধ্যে, বেরিয়ে যেতে হল দক্ষিণেশ্বর থেকে। কথায়ই আছে, বড় বাড়লে ঝড়ে ভাঙে। কিন্তু বেরিয়ে যাবে কোথায়? আবার এদিকেই উসখুস।

'হাজরা এখন মানছে।' বললে নরেন। 'তার অহঙ্কার হয়েছিল—'

'ও কথা বিশ্বাস করো না। দক্ষিণেশ্বরে ফের আসবার জন্যে বলছে অমনি।'

'কি করে বুঝলেন?'

'সে আমি বেশ বুঝেছি।' হাসলেন ঠাকুর। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নরেনের মতে হাজরা খুব ভালো লোক।'

'একশোবার।' নরেন জোর দিয়ে বললে।

'কেন? এই যে এত সব শুনলি। দেখলি—'
'তা হোক গে। দোষ কি একেবারে নেই? আছে, তবে অল্প। গুণই বেশি।'
ঠাকুরকে সায় দিতে হল। 'হ্যাঁ, নিষ্ঠা আছে বটে।'
তবে আর কি। যদি একটা কিছু থাকে, টেনে নাও। যদি অভিমুখী হয়, সাধ্য কি তুমি মুখ ফেরাও! আর কিছু না থাক নিয়তস্থিতি তো আছে। স্থিতি থেকেই প্রীতি আসবে একদিন।
আর কি করা! নরেন যখন বলেছে, হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে হল হাজরাকে।
'হাজরা একটি কম নয়।' প্রাণকৃষ্ণকে বলছেন ঠাকুর। 'যদি এখানে বড় দরগা হয় তবে হাজরা ছোট দরগা।'
কিন্তু দোষের মধ্যে, পরনিন্দায় পঞ্চমুখ। আর বড্ড আচারী। তা ছাড়া একটু পেটুক।
নবতের কাছে দেখা। বললেন তাকে ঠাকুর, 'শোনো। বেশি নেয়ো না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। আচার যতটুকু করবার ততটুকু করবে। বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়!'
'আর?'
'কারু নিন্দা করো না, পোকাটিরও না।' অগাধ স্নেহস্বরে বললেন ঠাকুর, 'যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি এও বলবে, যেন কারু নিন্দা না করি।'
নিন্দা করে আনন্দ, নিন্দা না করে আনন্দ। কোন আনন্দ বেশি? কোন আনন্দ অম্লান?
'কিন্তু প্রার্থনা করলে তিনি কি শুনবেন?'
'নির্ঘাত শুনবেন। যদি ডাকটি ঠিক হয়, আন্তরিক হয়। ও দেশে একজনের স্ত্রীর খুব অসুখ হয়েছিল। কে বললে, সারবে না। তাই শুনে লোকটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। অজ্ঞান হয় আর কি! এমন কে হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যে?'
কি আশ্চর্য, হাজরা হঠাৎ ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল।
'এ আবার কি!' অত্যন্ত কুণ্ঠিত হলেন ঠাকুর।
'যাঁর ছায়ায় আছি তাঁর পায়ের ধুলো নেব না?'
না, না, তুমি নেবে কেন? আমি নেব। তুমি শুধু ঈশ্বরকে তুষ্ট কর। শাখা-প্রশাখায় জল দিতে হয় না, মূলে জল দিলেই বৃক্ষ তুষ্ট হয়। তেমনি মূলে জল দাও। দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে কৃষ্ণ যেই বললেন তৃপ্ত হয়েছি তখন আর সকলেও তৃপ্ত হল। হেউ-ঢেউ উঠল চারদিকে। তার আগে নয়। সুতরাং তাঁকে খুশি করো। তাঁর আনন্দেই আর-সকলে আনন্দিত। তাঁর সমর্থনেই আর-সকলের সমর্থন।
'তাই সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'মশাই, জ্ঞান হলে তো?' মহিমাচরণ টিপ্পনী কাটল।
ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'হাজরার সবই হয়েছে, তবে একটু সংসারে মন আছে, এই যা। তা কি আর করা, ছেলেরা রয়েছে, জমি-টমি রয়েছে, ধার রয়েছে—উপায় কি!'
'তাহলে আর জ্ঞান হল কোথায়?' মহিমাচরণ আবার ফোড়ন দিল।

'না গো, তুমি জানো না।' সস্মিতমুখে ঠাকুর বললেন, 'সব্বাই হাজরার নাম করে। বলে রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে হাজরা বলে যে আছে, সেই হচ্ছে একটা লোক। লোকের মত লোক।'

হাজরা মুখ খুলল। বললে, 'তা কেন? আপনি হচ্ছেন নিরুপম, আপনার উপমা নেই, তাই কেউ বুঝতে পারে না আপনাকে।'

'তবেই বুঝতে পারছ নিরুপমকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না।'

'সে কি মশাই?' মহিমাচরণ গর্জে উঠল : 'হাজরা কি জানে? আপনি যেমনি বলবেন তেমনি শুনবে ও।'

'তা কেন? ওকে জিগগেস করে দেখ না! ও আমায় স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনাদেনা নেই।'

'তাই নাকি? ভারি তার্কিক তো!'

'শুধু তাই নয়, আমায় আবার শিক্ষা দেয় মাঝে-মাঝে।'

সবাই হেসে উঠল। চুপ করে হাজরা বসে আছে এক কোণে।

'কেন দেব না? আমার কি কিছুই বক্তব্য নেই? থাকতে পারে না? বেশ তো, এস, তর্ক করি।'

কিন্তু তর্ক ঠাকুরের পোষায় না। তর্ক করতে গিয়ে গালাগাল দিয়ে বসলেন হাজরাকে। তারপর শুতে গেলেন মশারির মধ্যে। শুয়ে কি শান্তি আছে? তর্কের ঝোঁকে কি কটু কথা বলেছেন, হয়তো মনে ব্যথা পেয়েছে হাজরা, সেই ভেবে অস্বস্তি।

তারপর আবার চলে এসেছেন মশারির বাইরে। বাইরে এসে হঠাৎ প্রণাম করে বসলেন হাজরাকে।

তোমাকে না মানি কিন্তু তোমার নিষ্ঠাকে প্রণাম। প্রণাম তোমার বাক্‌শক্তিকে। গালাগালিতেও যে তুমি অবিচলিত থাকো, প্রণাম তোমার সেই আঘাতবিজয়ী প্রতিজ্ঞাকে।

'শুয়েছি, আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম করে যাই—তবে হয়।'

কিন্তু এততেও হাজরার হল না। ছাড়তে পারল না দালালি। বৈধীভক্তির দেশাচার। কামনাকণ্টকিত ফলাকাঙ্ক্ষা। মায়ের কাছে বসেও মালা জপ করবে। এ কী হীনবুদ্ধি! যে এখানে আসবে তারই চৈতন্য হবে, একেবারে চৈতন্য হবে। তার আবার কিসের মালাজপ! তার শুধু রাগভক্তি। তার শুধু রঞ্জন-অঞ্জন।

গোলোকধাম খেলা হচ্ছে। মাস্টার, কিশোরী, লাটু আর হাজরা। চারজন খেলোয়াড়। হঠাৎ ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন এক পাশে। কী ব্যাপার? কত দূর?

মাস্টার আর কিশোরীর ঘুঁটি উঠে গেল।

'ধন্য তোমরা দু ভাই।' উল্লাস করে উঠলেন ঠাকুর। শুধু তাই? নমস্কার করলেন দু ভাইকে।

কেন করব না? ওরা জয়ী হয়েছে। ওদের জয়ের মধ্যে যে ঈশ্বরের করুণা।

কাকে না নমস্কার করেছেন।
পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছে। যেন মূর্তিমান দুর্বাসা। যাকে-তাকে গাল দেয়, শাপ দেয়, মারতে আসে। যখন-তখন, কারণে-অকারণে। ক্রোধে একেবারে নগ্ন-অগ্নি।
'হিঁয়া আগ মিলেগা?' হুঙ্কার দিয়ে উঠল সাধু।
হাত জোড় করে সাধুকে ঠাকুর নমস্কার করলেন। একবার নয় বহুবার। যতক্ষণ সাধু ছিল ততক্ষণই রইলেন করজোড়ে। নীরব বিনতিতে।
আগুন নিয়ে প্রসন্নমনে চলে গেল সাধু। কাউকে শাপমন্যি করলে না। তেড়ে এল না পায়ের খড়ম নিয়ে।
সাধু চলে গেলে ভবনাথ বললে হাসতে-হাসতে : 'আপনার সাধুর উপর কী ভক্তি!'
'ওরে তমোমুখ নারায়ণ। যাদের তমোগুণ তাদের এই রকম করে প্রসন্ন করতে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'আর এ তো সাধু।'
খেলা দেখছেন ঠাকুর। ওরে, হাজরার কি হল আবার!
কী হল!
চেয়ে দ্যাখ, হাজরার ঘুঁটি আবার নরকে পড়েছে।
সকলে হেসে উঠল হো-হো করে।
লাটুর কী অবস্থা! সাত-চিৎ চেলেছে লাটু। এক চালে মুক্তি। এক লাফে উল্লঙ্ঘন। সংসারঘর থেকে একেবারে ব্রহ্মলোক।
ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল লাটু।
'এর একটা মানে আছে।' বললেন ঠাকুর, 'অহঙ্কারের উত্থান নেই, আর ঠিক লোকের সর্বত্র জয়। হাজরার বড় অহঙ্কার হয়েছিল তাই তার পতন আর লেটো হচ্ছে ঠিক লোক, তাই তার উর্ধ্বগতি। ঈশ্বরের এমনও আছে যে ঠিক লোকের কখনো কোথাও তিনি অপমান করেন না। সর্বত্র জিতিয়ে দেন।'
তবে কি হাজরা ঠিক লোক নয়?
নইলে তাকে রাখা গেল না কেন?
এমনিতে থাকত নিজের খেয়ালে কিছু এসে যেত না। উলটে ঠাকুরের বিরুদ্ধতা করতে লাগল।
ঠাকুর তখন ভবতারিণীকে বললেন, 'মা, হাজরা যদি মেকি হয়, ওকে সরিয়ে দে এখান থেকে।'
কদিন পরে সরে গেল হাজরা। কিন্তু নরেন তাকে ছেড়ে দেবে না সহজে। বললে, 'কিন্তু, এক কথা। বলো, মৃত্যুকালে ওর ইষ্ট দর্শন হবে।'
ঠাকুর চোখ তুলে তাকালেন নরেনের দিকে।
বন্ধুর জন্যে আবার অনুনয় করল নরেন। 'ও চলে যাচ্ছে যাক, কিন্তু এটুকু অভয় ওকে দিতে হবে। নইলে কি নিয়ে থাকবে ও? ও তাপে-লজ্জায় বিমর্ষ। ও কিছু বলতে পারছে না, আমি ওর হয়ে বলছি। বলো ইষ্টদর্শন হবে ওর মৃত্যুকালে। আর কিছু না থাক, নিষ্ঠা ছিল ওর, ও আর কিছু না পাক তোমারও প্রণাম পেয়েছে। বলো, সত্যি নয়? আর, তোমার প্রণাম যে পেয়েছে—বলো, হবে?'

ঠাকুর বললেন, 'হবে।'
প্রতাপ হাজরাকে আর পায় কে। অনুরক্ত করে না পাক, বিরক্ত করে আদায় করে নিয়েছে। এই তার অসীম প্রতাপ।
হৃদয়ের মত সেও ছেড়ে গেল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু তার তো তবু হবে শেষ সময়। হৃদয়ের কি হবে না? তার পক্ষে নরেনের মত মুমুক্ষু নেই বলেই কি এই দীন দশা? এত বলবান সেবা, এত সহিষ্ণু সান্নিধ্য, এত অকাতর শুশ্রূষা—এ কি ব্যর্থ হবে? কিছুই কি ব্যর্থ হয়?
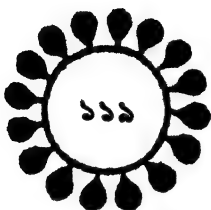
'মশাই, আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছেন।' কে একজন লোক বললে এসে ঠাকুরকে।
'আমার সঙ্গে?' ঠাকুর তো অবাক।
'হ্যাঁ, আপনারই নাম করলে।'
'কোথায় সে লোক?'
'যদু মল্লিকের বাগানে এসেছেন। দাঁড়িয়ে আছেন ফটকের সামনে।'
এখানে নিয়ে এস, এ কথা বললেন না ঠাকুর। এতদূর যখন এসেছে তখন ফটক ডিঙিয়ে ভিতরে চলে আসতে দোষ কি, তাও বললেন না। যখন ফটকের সামনে এসেই থেমে পড়েছে তখন নিশ্চয়ই ভিতরে ঢুকতে কোনো বাধা আছে। নইলে এটুকু পথ আর আসবে না কেন? যাই দেখি গে কে এল। হয়তো হৃদে এসেছে। ও বলেই ঢুকছে না এখানে।
পা চালিয়ে পুবমুখো চলে গেলেন ঠাকুর। যা ভেবেছিলেন। হৃদয়ই দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে করজোড়ে। রামসমীপে মহাবীরের মত।
ঠাকুরকে দেখেই পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল অঝোরে। পরিত্যক্ত শিশুর মত।
ঠাকুর বললেন, 'ওঠ্। কাঁদিসনি। কান্নার কী হয়েছে!' বলছেন আর নিজে কাঁদছেন। যেন কান্নার কিছুই নেই এমনিভাবে নিজের চোখ মুছছেন গোপনে।
যে যন্ত্রণা দিয়েছে, তারও জন্যে করুণা। যে বিরক্ত করেছে, তারও জন্যে অনুরাগ! শুধু ভক্তের ডাকেই সাড়া দেন না, যে পরিত্যক্ত তারও ডাকে সাড়া দেন। ছুটে

আসেন নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে। ধুলোর থেকে তুলে নেন হাত বাড়িয়ে।
'কিরে, এখন যে এলি?'
'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'
তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব তার কি সময়-অসময় আছে? হৃদয় কাঁদছে তো কাঁদছেই। বললে, 'আমার দুঃখ আর কার কাছে বলব?'
আমার আর কে আছে? শত ফটক বন্ধ হয়ে গেলেও তুমি আছ আমার ফটিকজল। মেয়াদহীন কয়েদখানার বাইরে মুক্ত প্রান্তরের ডাক। তোমাকে কে আটকাবে? আর সবাই ঠেলুক তুমি ঠেলতে পারবে না।
'তোর আবার কিসের দুঃখ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'তোমার সঙ্গছাড়া হয়ে আছি। সে দুঃখের কি আর শেষ আছে?'
'বা, তখন যে বলে গেলি,' ঠাকুর মনে করিয়ে দিলেন, 'তোমার ভাব নিয়ে তুমি থাকো, আমাকে থাকতে দাও আমার নিজের ভাবে।'
কান্নার একটা প্রবল ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিল হৃদয়কে। বললে, 'হ্যাঁ, তখন তো তা বলেছিলাম, কিন্তু আমি তার কি জানি! আমি তার কি বুঝি।'
'তাতে কি হয়েছে! এমনিতর দুঃখকষ্ট আছেই সংসারে।' ঠাকুর সান্ত্বনা দিলেন: 'সংসার করতে গেলেই আছে এমন সুখদুঃখ, এমন ওঠা-নামা। তাতে কি! এমনিতে কেমন আছিস? ধান-টান কেমন হয়েছে এবার?'
'মন্দ নয়।' একটা নিশ্বাস ছাড়ল হৃদয়।
'আজ এখন তবে আয়। আজ রোববার, অনেক লোকজন এসেছে, তারা বসে আছে সকলে।'
আমিও কি সকলের মধ্যে একলা নই? আমিও কি বসে নেই এক পাশে?
'শোন, আরেকদিন আসিস। তখন বসে কথা কইব তোর সঙ্গে।'
সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করল হৃদয়। চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল সমুখ দিয়ে।
দুর্দান্ত সেবাও যেমন করেছে, তেমনি যন্ত্রণাও দিয়েছে অফুরন্ত। ছেলেকে যেমন মানুষ করে তেমনি করে নেড়েছে-চেড়েছে ঘষেছে-মেজেছে ঠাকুরকে। রাত-দিন বেহুঁস হয়ে থাকতেন, নিষ্পলক চোখে পাহারা দিয়েছে। আজ সবাই তোমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছ, হৃদয় থাকলে পায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি? অসুখে দুখানা হাড় হয়ে গেছি, কিছু খেতে পারি না, আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে খাচ্ছে হৃদয়, যদি খেতে আমার রুচি আসে। বলছে, এই দেখ না আমি কেমন খাই। তুমি শুধু তোমার মনের গুণে খেতে পাচ্ছ না। কাটিয়ে ফেল মনের গুণ। কত করেছে আমার জন্যে। গঙ্গায় নেমে তুলে এনেছে এই ডুবন্ত দেহকে। ফুলুই শ্যামবাজারে কীর্তনের সময় ভিড়ে আমার সর্দি-গর্মি হয়, সেই ভয়ে খোলা মাঠে টেনে নিয়ে গেছে। বেলঘরে নিয়ে গেছে কেশবের কাছে। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লাটসাহেবের বাড়ি দেখিয়েছে। তেমনি যন্ত্রণা দিতেও কসুর করেনি। ভেবেছিল ওর 'আণ্ডারে' আছি, যা করাবে তাই করব। বললে, মা'র কাছে ক্ষমতা চাও, ব্যামোর ওষুধ চাও। নইলে আবার মা কি। ওর পরামর্শ শুনতে গিয়ে ঘা খেলুম। শম্ভু মল্লিকের কাছে টাকা চায়, যদি

পারে হাতিয়ে নেয় লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর সেই থলেটা। দশ হাজারের থলে। কেবল বিত্তবেসাত জমি-গরুর দিকে লালসা। সিম্ধাই-সিম্ধাই করে আস্ফালন। জ্বালিয়ে মেরেছে। এমন জ্বলুনি, পোস্তার উপর থেকে জোয়ারের জলে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলুম।

তারই জন্যে, সেই হৃদয়ের জন্যেই, কাঁদছেন ঠাকুর। যে কাঁদায়, কি আশ্চর্য, তারই জন্যে আবার কাঁদেন। যে বিতাড়িত, তারই জন্যে আবার ছুটে আসেন ব্যগ্র হয়ে। যে অযোগ্য, অকর্মণ্য, তারও জন্যে রেখে দেন আশ্বাসের আতপত্র।

এ'টে ধরে থাক, কিছুতেই ছাড়িসনে, সাধ্য কি তোকে ফেলে রাখে জলের পাশে। পালিয়ে সে কোথায় যাবে, তুই যে তার পা নিয়ে বসে আছিস। ঐ দ্যাখ সে হেসে উঠেছে অন্ধকারে, নিবিড় বনের অন্তরালে ঐ দ্যাখ জেগে উঠেছে শুকতারা।

সামান্য যাত্রাদলের ছোকরা, তার সঙ্গেও ঈশ্বরকথা।

দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে যাত্রা হচ্ছে। পালা বিদ্যাসুন্দর। শেষরাত্রি থেকে শুরু হয়েছে, সকালেও শেষ হয়নি। মন্দিরে মাকে দেখতে এসে ঠাকুর একটু শুনেছেন কান পেতে। যাত্রাশেষে ঠাকুরের ঘরে এসেছে অভিনেতারা।

যে ছোকরা বিদ্যা সেজেছিল তার অভিনয়ে ঠাকুর খুব খুশি। বললেন, 'বেশ করেছ তুমি। শোনো, যদি কেউ গাইতে বাজাতে নাচতে পটু হয়, যে কোনো একটা বিদ্যাতে যদি তার দক্ষতা থাকে, তাহলে চেষ্টা করলে সহজেই সে ঈশ্বর লাভ করতে পারে।'

আমিও তো ভালো য়্যাকটিং করতে পারি। চমকে উঠল ছোকরা। আমার পক্ষেও সম্ভব ঈশ্বর লাভ?

তা ছাড়া আবার কি। কত অভ্যাস করেই না তবে গাইতে-বাজাতে শিখেছ। কত লাফঝাঁপ করেই না রপ্ত করেছ নাচ। সেই অভ্যাসযোগেই লাভ হবে ঈশ্বর।

'আজ্ঞে, কাম আর কামনায় তফাত কি?' জিগগেস করল ছোকরা।

তুচ্ছ লোকের আবার তত্ত্বজিজ্ঞাসা, এই বলে উড়িয়ে দিলেন না ঠাকুর। বললেন, 'কাম যেন গাছের মূল আর কামনা তার ডালপালা। যদি কামনা করতেই হয়, ঈশ্বরে ভক্তি-কামনা করো। যদি মত্ততা করতেই হয় আমি ঈশ্বরের সন্তান এইভাবে মত্ত হও।'

তাকালেন ছোকরার দিকে। শুধোলেন, 'তোমার বিয়ে হয়েছে?'

ছোকরা ঘাড় কাত করল।

'ছেলেপুলে?'

'আজ্ঞে একটি কন্যা গত। আরেকটি হয়েছে।'

'এর মধ্যে হলো-গেলো? এই তোমার কম বয়স! বলে, সাঁজসকালে ভাতার মলো, কাঁদব কত রাত!'

সবাই হেসে উঠল।

'সংসারে সুখ তো দেখলে।' ঠাকুর আবার তাকালেন ছোকরার দিকে। 'যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।'

'কিন্তু সংসার ছাড়ব কি করে?'

'না, না, ছাড়বে কেন? সংসার করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরের দিকে। সেই যে ছুতোরের মেয়ে চাল এলে দেয় অথচ সর্বক্ষণ হুঁস রাখে ঢেঁকির মুষল যেন হাতে না পড়ে—তেমনি। ছেলেকে মাই দিচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছে, এক ফাঁকে এক হাতে খোলায় ভেজে নিচ্ছে ভিজে ধান—'

'মনে রাখব আপনার কথাগুলো।'

'মাঝে-মাঝে এখানে এসো। রবিবার কিংবা অন্য ছুটিতে—'

'আজ্ঞে আমাদের তিন মাস রবিবার। শ্রাবণ, ভাদ্র আর পৌষ। বর্ষা আর ধান কাটবার সময়। আপনার কাছে আসব সে আমাদের ভাগ্য।'

'হ্যাঁ, সবাই মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে-শুনতে ভালো। চারজন গান গাইছে, কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন সুর ধরে যাত্রা ভেঙে যায়।'

সবাই মিলে এক সুর ধরো। এক তরীতে ভাসো। একাকার হয়ে যাও।

যাত্রা থেকেই যাত্রা করো।

বললেন ঠাকুর, 'তোমাদের মধ্যে যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের মেয়েলি ভাব হয়ে যায়। তাই না? তেমনি যারা রাতদিন ঈশ্বরচিন্তা করে তাদের মধ্যে ঈশ্বরসত্তার রঙ ধরে। মন ধোপাঘরের কাপড়, তাকে যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।'

আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? এর মানে কি? দেখলাম, তাল মান গান নিখুঁত। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন, নারায়ণই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধরে যাত্রা করছেন।

এই ঠাকুরের অবতারবাদ। সকলেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। ঈশ্বরের প্রতিধ্বনি।

এই ঠাকুরের আত্মদর্শন। সমস্ত মন ঈশ্বরকে না দিলে ঈশ্বরের দর্শন হয় না। তেমনি সমস্ত জনে তাঁকে না দেখলেও হয় না দর্শন। মনে-জনে দেখাই ঠিক দেখা।
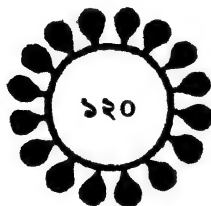
যে মা-মন্ত্র দেবে তাকে মায়ের জন্যে কাঁদতে হবে। শুধু বিশ্বের মায়ের জন্যে নয়, ঘরের মায়ের জন্যে। শুধু ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর জন্যে নয়, সামান্য গর্ভধারিণীর জন্যে। জগৎ ছাড়লেও যাকে ছাড়া যাবে না। সন্ন্যাসী হয়েও যাকে আঁকড়ে থাকতে হবে জপমালার মত। পঞ্চবায়ু, পঞ্চকোষের মত। শুধু তাই নয় নিজেকেও মা হয়ে দেখাতে হবে মাঝে-মাঝে। আরো কঠিন কথা, মা-মন্ত্রের দিতে হবে একটি পর্যাপ্ত মূর্তি, একটি শরীরী তর্জমা, একটি শাশ্বতী প্রতিলিপি।

সব পুরোপুরি করে গিয়েছেন ঠাকুর। তাইতো তাঁর মন্ত্র এত প্রাণময়। তার শক্তি এত উজ্জীবনী। তার অর্থ এত গভীরগ।

ঈশ্বরের চেয়েও মায়ের, চন্দ্রমণির মুখখানি বেশি সুন্দর দেখেছেন। মায়ের মুখখানি মনে পড়তেই ছুঁড়ে দিলেন গঙ্গামায়ীর হাত, ছেড়ে এলেন বৃন্দাবন। কিসের শ্রীমতীর সাধন শ্রীমতী মাতার কাছে! 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান—' একেবারে নাড়ী ধরে টান মারে। মা মরে যাবার পর এমন কান্না কাঁদলেন, নির্বিকল্প সন্ন্যাসেও কুলোলি না। এমন মা। এমনই মহীয়সী জীবিতাশা! তারপর নিজে রূপ ধরে দেখালেন মা কেমন। চুল এলিয়ে বুকভরা স্নেহক্ষীর নিয়ে কোল পেতে বসলেন মাটির উপর। রাখাল দেখল মা বসে আছে। সোজাসুজি কোলের উপর গিয়ে বসল, দুধের ছেলের মত পান করতে লাগল মা'র স্তন্যসুধা। এই তো না-হয় হল যারা স্বগণ-স্বজন তাদের জন্যে, কিন্তু আর সকলের কী হবে, তাদের মা কোথায়? শুধু মন্ত্রে, মুখের কথায় কি সাধ মেটে, না, বুক ভরে? আমাদের একটি মূর্তি চাই, প্রতিমা চাই। প্রমিতা, প্রস্ফুটা প্রতিমা। মন্ত্রের উজ্জ্বল উচ্চারণ। ঘনীভূতা নিয়তস্থিতি।

ঠিক কথা। এই দেখ সেই মন্ত্রের মূর্তি, সান্দ্রীভূতা স্মিতজ্যোৎস্না। বলে প্রতিষ্ঠা করলেন সারদামণিকে। চেয়ে দেখ এই মূর্তির দিকে, একে মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে কিনা এবং ডাকবার সঙ্গে-সঙ্গে মনে এই আশ্বাস আসে কিনা যে সাড়া পাব! দুর্গাদুর্গতিহরা জন্মজলধিতারিণী মা। শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলা সুশুভ্রা। ভবভয়-দ্রাবিণী দীনবৎসলা।

রাখালের মত তারকও এসে দেখল ঠাকুর নয়, মা বসে আছেন। কোথায় পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করবে তা নয়, লাজুক শিশুর মত ঠাকুরের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল। কি রে, আমি কে? অমন করলি কেন?

তুমি? তুমি আমার মা। তোমার চাহনিতে সেই নিমন্ত্রণ।

'হ্যাঁ রে, তোকে আগে কোথাও দেখেছি?'

আমি দেখেছিলাম একদিন রামবাবুর বাড়িতে। সিমলেতে তাঁর বাড়ির কাছেই আমার বাসা। গিয়ে দেখি একঘর লোক, বাইরেও উদ্বেল জনতা। কি যেন দেখতে কি যেন শুনতে সবাই উন্মুখ-উৎসুক। ভিড় ঠেলে গেলাম এগিয়ে। গিয়ে দেখলাম আপনাকে। আহা কি মনোহর দর্শন। অমৃতমহোদধি বসে আছেন শান্ত হয়ে। ভাবারূঢ় অবস্থায়। কন্দর্পকোটিসৌন্দর্য। জগৎগুরুর্জগন্নাথ। আড়ষ্ট ভাবজড়িত স্বরে বলছেন, আমি কোথায়? কে একজন বললে, রামের বাড়িতে। কোন রাম? ডাক্তার রাম। তখন ফিরে পেলেন সম্বিৎ।

বলতে লাগলেন সমাধির কথা। কাকে বলে সমাধি? সমাধি কয় রকম? কিসে কেমন অনুভূতি।

সে এক অপূর্ব বর্ণনা।

সমাধি পাঁচ রকম। পিপীলিকা, মৎস্য, কপি, পক্ষী আর তির্যক। কখনো বায়ু ওঠে পিঁপড়ের মত শিরশির করে। কখনো ভাবসমুদ্রে আত্মা মাছের মতো খেলা করে।

আনন্দে সাঁতার কাটে। কখনো বা পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু পাশ থেকে ঠেলতে থাকে, আমোদ করতে চায়। আমি চুপ করে থাকি, টুঁ শব্দও করি না। কিন্তু নিঃসাড় হয়ে কাঁহাতক থাকা যায়? বানরের মত লম্বা লাফ দিয়ে মহাবায়ু উঠে যায় সহস্রারে। তাই তো, দেখ না, মাঝে-মাঝে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। তারপর আবার পাখি হয় মহাবায়ু। এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডালে উড়তে থাকে। যেখানটায় বসে সেখানে যেন আগুন জ্বলে। মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয় এমনি উড়ে-উড়ে বেড়ায়। শেষে এসে মাথায় আশ্রয় নেয়। তির্যকও* প্রায় তাই। লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে না, এঁকে-বেঁকে চলে। তারও শেষ লক্ষ্য ঐ মাথা। ঐ কুলকুণ্ডলিনী। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। ঐ কুলকুণ্ডলিনী জাগলেই শেষ সমাধি।

আমরা কি অত সব পারব? মহাবায়ুর সঙ্গে কি আমাদের মহাসাক্ষাৎকার হবে? নিয়ে যাবে সেই প্রস্ফুটিত শতদলের মর্মকোষে?

কেন হবে না? শুধু পুঁথি পড়লেই হবে না। শুধু শুকনো চর্বিতচর্বণে হবে না। তাঁকে ডাকলে হবে। তাঁর জন্যে কাঁদলে হবে। তাঁকে ভালোবেসে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হলে হবে।

কান্না কখনো পুরোনো হয় না। এর কান্নার সঙ্গে মেলে না ওর কান্না। প্রত্যেকটি কান্না মৌলিক। নিত্যনতুন।

বিষয়চিন্তাই মনকে দেয় না সমাধিস্থ হতে। আবার বলতে লাগলেন ঠাকুর, সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে। কিন্তু মেঘে যদি সূর্য ঢাকা পড়ে তা হলে আর পদ্ম তার দল মেলে না। তেমনি বিষয়মেঘে জ্ঞানসূর্য ঢাকা পড়লে ফোটে না আর ভক্তিকমল।

আরেকরকম সমাধি আছে। যাকে বলে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা।

এ কি যে-সে কথা? মানুষের মন সরষের পুঁটলি। পুঁটলি খুলে সরষে ছড়িয়ে পড়লে ওদের কুড়িয়ে এনে ফের পুঁটলি বাঁধা কি সোজা কথা? একটু মন হয়তো গুটিয়ে এনেছে অমনি কোত্থেকে বিষয়চিন্তা এসে উদয় হল, দিল সব ছত্রখান করে। সেই নেউলের গল্প জানো না? ন্যাজে ইঁট-বাঁধা নেউল? দেয়ালের গর্তে, তার নিভৃত সমাধির কোটরে আছে দিব্যি আরামে, ঐ ইঁটের টানে বারে-বারে বেরিয়ে পড়ে গর্ত থেকে। যতবারই গর্তের মধ্যে স্বস্থানে বসতে যায় আরামে, ইঁটের জোরে ততবারই এসে পড়ে বাইরে। বিষয়চিন্তাও অমনি। যতই মন ঈশ্বরের পাশটিতে এসে বসতে চায় ততই বিষয়চিন্তা টেনে বের করে দেয়। ঘটায় যোগভ্রংশ।

উন্মনা-সমাধি কেমন জানো? সেই থিয়েটারের ড্রপ উঠে যাওয়া। দর্শকেরা পরস্পরের সঙ্গে গল্প করছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, অমনি থিয়েটারের পর্দা উঠে গেল। তখন সকলের মন সহসা অভিনিবিষ্ট হল অভিনয়ে। আর নেই তখন বাহ্যদৃষ্টি, বাহ্যচেতনা। যেন উঠে পড়ল মায়ার পর্দা। জেগে উঠল যোগচক্ষু। আবার খানিকক্ষণ পর যখন নেমে এল মায়ার পর্দা, মন আবার বহির্মুখ হয়ে গেল। আবার শুরু হল গালগল্প, বিষয়কথা। যে-কে-সে।

তাই বা মন্দ কি। সংসারী লোকের পক্ষে যত বেশি উন্মনা হওয়া যায়! যত বেশি ঘরে থেকে নিজেকে অনুভব করা যায় বনবাসীর মত!

উন্মনা হতে-হতেই স্থিত-সমাধি হয়ে যাবে। একেবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলেই স্থিত-সমাধি। সর্বক্ষণই বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

রাম-লক্ষ্মণ পম্পাসরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখলেন, জলের ধারে বসে আছে একটা কাক। পিপাসার্ত তবু খাচ্ছে না জল। কেন, কি হল? রামকে জিগগেস করলেন লক্ষ্মণ। রাম বললেন, ভাই, এ কাক পরমভক্ত। অহর্নিশ রামনাম করছে। ভাবছে জল খেতে গেলে পাছে রামনাম জপ ফাঁক হয়ে যায় তাই ঠোঁট দিয়ে জল-স্পর্শ করছে না।

নামসুধাই হরণ করেছে তার দেহপিপাসা।

সংসারীলোকের সেই একমাত্র উপায়—নামজীবিকা। হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপ-নাশিনী।

শুধু তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। তাঁর নাম করো। তাতেই জাগবে কুলকুণ্ডলিনী। জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিনী, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী। ঐ কুণ্ডলায়িত সাপ ফণা না তুললে কিছুই হবে না। ও জাগলেই চৈতন্য, ও জাগলেই ঈশ্বরদর্শন।

ন্যাংটা বলতো গভীর রাত্রে অনাহত শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ আবার শোনবার জন্যে তপস্যা। ওই প্রণবের ধ্বনি। ঐ ধ্বনি উঠছে ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে, প্রতিধ্বনি জাগছে নাভি মূলে। অনাহত শব্দ ধরে এগুলেই পৌঁছানো যায় ব্রহ্মের কাছে, যেমন কল্লোল শুনে পৌঁছুনো যায় সমুদ্রে। কিন্তু যতক্ষণ দেহের মধ্যে আমি-আমি রব উঠছে ততক্ষণ শোনা যাবে না সেই শব্দ, দেখা যাবে না সেই শেষ-

মুগ্ধের মত শুনছিল সব তারক আর ভাবছিল এমন ভাগ্য কি হবে যে এই মহা-সমাধিস্থ মহাপুরুষের কৃপা আমি পাব?

শুধু কৃপা নয়, কোল দেব তোকে।

রামবাবু বললেন কাঁধে হাত রেখে, 'এখানে খেয়ে যাবেন চারটি।'

'বাড়িতে বলে আসিনি।'

'তাতে কি?' উড়িয়ে দিলেন রামবাবু।

একটা অতি তুচ্ছ কথা কিছু নয়। সত্যের ছোট-বড় নেই, তুচ্ছ-উচ্চ নেই, সত্য সব সময়েই সত্য, সর্বাবস্থায় জগৎপ্রদীপ সূর্যের মতো বৃহত্তেজা।

খুঁজতে-খুঁজতে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে তারকের এক বন্ধুর বাড়ি, সেই তাকে নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে। বড়বাজার থেকে চলতি নৌকোয় চলে এসেছে শনিবার, আফিসের ছুটির পর। বন্ধুর বাড়ি হয়ে ঠাকুরের কাছে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যে।

প্রথমেই টেনে নিলেন কোলে। দুঃখদারিদ্র্যনাশিনী সর্ববান্ধবরূপিণী মায়ের মত। আরতির কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠল।

ঠাকুর জিগগেস করলেন তারককে, 'তুমি সাকার মানো না নিরাকার?'
'নিরাকারই আমার ভালো লাগে।'
'না রে, শক্তিও মানতে হয়।' বলে ঠাকুর উঠলেন। টলতে-টলতে এগুতে লাগলেন কালীমন্দিরের দিকে। কেন কে বলবে তারকও তাঁর পিছু-পিছু চলতে লাগল। প্রতিমা প্রস্তর ছাড়া কিছু নয়, ব্রাহ্মসমাজে ঘুরে-ঘুরে এই শিক্ষাই পেয়েছিল তারক। অথচ, কি আশ্চর্য, এই পাষাণাকারা প্রতিমার কাছে ভাববিভোর হয়ে প্রণাম করছেন ঠাকুর। শুধু শুকনো মাথা নোয়ানো নয়, হৃদয়কে জল করে প্রতিমার পায়ের উপর নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া।
স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল তারক।
সহসা কে যেন বলে উঠল তার মর্মের কানে-কানে : 'অত গোঁড়ামি কেন? এত সঙ্কীর্ণতা কিসের? ব্রহ্ম তো ভূমা, সর্বব্যাপী। তাই যদি হয় এই প্রতিমার মধ্যেও তিনি আছেন। সেই বিভুকে প্রস্তরমূর্তিতে প্রণাম করতে দোষ কি?'
মাথা নত হয়ে এল তারকের।
নীলঘনশ্যামা ভবতারিণীর সামনে সে রাখল তার প্রণিপাত।
ঠাকুর বললেন, 'আজ রাত্রে এখানেই থেকে যাও না।'
কত বড় প্রলোভনের কথা। কিন্তু তারক বললে সহজ সুরে, 'বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। উঠেছি তার ওখানে। কথা দিয়ে এসেছি ওখানেই থাকব রাত্রে।'
'কথা দিয়ে এসেছ?' ঠাকুর উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'এর উপরে আর কথা নেই। ঐ সামান্য একটু কথা রাখাই হচ্ছে তপস্যা। সত্য কথার মত বড় তপস্যা আর নেই কলিতে।'
সব মাকে দিয়েছিলুম কিন্তু সত্য দিতে পারলুম না।
মাড়োয়ারী ভক্তরা আসে ঠাকুরের কাছে। খালি হাতে নয়, নানারকম ফল-মিষ্টান্ন নিয়ে। থালা সাজিয়ে। গোলাপজলের গন্ধ ছিটিয়ে। আমি ওসব কিছু নিতে পারি না। বলছেন ঠাকুর। ওদের অনেক মিথ্যা কথা কয়ে টাকা রোজগার করতে হয়। গোলাপজলের গন্ধে কি সেই অপলাপের গন্ধ ঢাকা পড়বে?
সরলভাবেই বলছেন সব মাড়োয়ারীদের, বোঝাচ্ছেন। 'দেখ ব্যবসা করতে গেলে সত্যকথার আঁট থাকে না। ব্যবসায়ে তেজী-মন্দি আছে, তখন মিথ্যে চালাতে হয়। মিথ্যে উপায়ে রোজগার করা জিনিস সাধুদের দিতে নেই। শুদ্ধ জিনিস সত্য জিনিস সাধুদের দেবে। সত্যপথেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার।'
তুমি কী করেছ তপস্যা? কিছু করিনি। শুধু মৌনাবলম্বন করেছি।
তাতেই তোমার সিদ্ধি হয়েছে।
তাতেই?
হ্যাঁ, তার মানে মৌনাবলম্বন করে ছিলে, ফলে তুমি মিথ্যে বলোনি। মিথ্যা না বলাটাও এক হিসেবে সত্য বলা।
সকলসুন্দরসন্নিবেশ ঠাকুর তাকালেন তারকের দিকে। বললেন, 'বেশ কাল এসো।'
সত্যমেব জয়তে, নানৃতম।
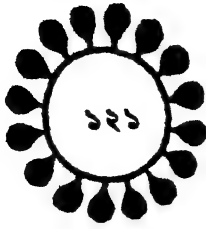
কিন্তু কাল কি আর আসবে ইহকালে?

ঠিক আসবে যদি তিনি কৃপা করেন। যিনি কোল দিয়েছেন তিনি কি করেননি কৃপা?

পরদিন সন্ধ্যের আগে ঠিক এসে হাজির।

ওরে এসেছিস? তোর জন্যে মা-কালীর প্রসাদী লুচি-তরকারি রেখে দিয়েছি। কি রে, আজ রাত্রে থাকবি তো এখানে? সামনের ঐ দক্ষিণের বারান্দায় শুবি, কেমন? আজ রাতে কেউ এখানে থাকবে না। শুধু তুই আর আমি।

যেন কতকালের চেনা। কত দেশ ঘুরেছেন ওকে সঙ্গে করে। তোর নাম কি, তোর বাপের নাম কি, কোথায় তোর বাড়ি, কিছুর খোঁজখবরে দরকার নেই। শুধু তুই এলি আর আমি নিলুম। তুই আর আমি এ দুয়ের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডলীলা। শুধু শিলা নয় রে, লীলা। শুধু কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নয়, রাধাকৃষ্ণ।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক সাধু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। এরা কৃষ্ণ মানে, কিন্তু রাধাবিহীন কৃষ্ণ। এদের মতে রাধা বলে কিছু নেই। খাজাঞ্চির ঘরের কাছে আছে কিন্তু কোনো দেবমন্দিরেই প্রণাম করতে আসে না। মায়ের মন্দিরে শিবের মন্দিরে তো নয়ই, রাধাগোবিন্দের মন্দিরেও নয়।

সাধুর ইচ্ছে ঠাকুরের ভক্তেরা ওর কাছে এসে সমবেত হয়, শোনে ওর কথাবার্তা। এমনিতে বেশ খাঁটি সাধু, কিন্তু দোষের মধ্যে, শুকনো।

সকলে তাকায় ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর বললেন, 'হতে পারে ওর ভালো মত, কিন্তু আমার প্রাণের মতো নয়। ভগবানের লীলা চাই।'

লীলা ভুবনপাবনী। মা আর ছেলে। বর আর বধূ। প্রভু আর দাস। বন্ধু আর সখা।

নারদ দ্বারকায় এসে হাজির। ষোলো হাজার স্ত্রী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে বাস করছেন তা একবার দেখে যেতে হবে স্বচক্ষে। বিশ্বকর্মার নির্মাণকৌশলের পরাকাষ্ঠা, কী সুন্দর-সুমহান রাজপুর! নির্ভয়ে প্রবেশ করল নারদ, একেবারে নিভৃত অন্তঃপুরে। গিয়ে দেখল রুক্মিণী রত্নখচিত চামর দিয়ে ব্যজন করছে শ্রীকৃষ্ণকে। নারদকে দেখে উঠে পড়লেন শ্রীকৃষ্ণ, বসবার জন্যে মহার্ঘ আসন দিলেন, নিজের হাতে ধুয়ে দিলেন তাঁর পদযুগল। শুধু তাই নয়, সেই পা-ধোয়া জল রাখলেন নিজের মাথার উপর। বললেন, 'প্রভু, আপনার কোন কাজ সাধন করব বলুন।'

নারদ বললে, 'আর কিছু নয়, যেন আপনার চরণদ্বয়ের ধ্যানে আমার স্মৃতি সতত স্থির থাকে।'

নারদ নিষ্ক্রান্ত হয়ে আরেক মহিষীর ঘরে প্রবেশ করল। গিয়ে দেখল সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। নারদকে দেখে তেমনি পদবন্দনা করে জিগগেস করলেন শ্রীকৃষ্ণ, 'প্রভু, আপনার কী প্রিয় সাধন করব?'

তেমনি এক-এক ঘরে যাচ্ছে নারদ, এক-এক অভিনব দৃশ্য দেখছে। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালন করছেন, কোথাও হোম বা সান্ধ্যবন্দনা করছেন, কোথাও অস্ত্রবিদ্যা শিখছেন, কোথাও অশ্ব হস্তী বা রথপৃষ্ঠে বিচরণ করছেন। কোথাও বা শুয়ে রয়েছেন পর্যঙ্কে, কোথাও বা মন্ত্রীদের সঙ্গে বসেছেন মন্ত্রণায়, কোথাও বা গোদান করছেন ব্রাহ্মণদের। কোথাও স্নান করতে চলেছেন, হাস্যালাপ করছেন প্রিয়ার সঙ্গে, কোথাও বা পুত্রকন্যার বিয়ের আয়োজন করছেন।

নানা ভাবে অবস্থিত। নানা লীলায় উদ্ভিন্ন।

তখন নারদ বললে করজোড়ে, 'হে যোগেশ্বর, আজ দেখলাম আপনার যোগমায়ার প্রভাব। এবার আমাকে অনুমতি করুন, আমি সকল লোকে আপনার ভুবনপাবনী লীলাগান গেয়ে বেড়াই।'

'পুত্র, তুমি মোহগ্রস্ত হয়ো না।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ, 'লোকশিক্ষার জন্যে আমি এরূপ করে থাকি।'

আবার দেখ, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ছেড়ে জলস্পর্শ করে পরমাত্মার ধ্যান করি। অন্ধকারের পরপারে যাঁর বাসা সেই পরমাত্মা।

সেই এক স্বয়ংজ্যোতি, অনন্য, অব্যয়, নিরস্তকল্মষ ব্রহ্মনামা পুরুষ। উদ্ভব আর বিনাশের মধ্যে যে শক্তি সেই শক্তিতেই যাঁর সত্তা ও আনন্দস্বরূপত্বের উপলব্ধি।

আবার যেমন ধরো নিত্যগোপাল। এত বড় ভক্ত, ঠাকুরের মতে যে পরমহংস অবস্থা পেয়েছে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করছেন তারককে। বলছেন, 'দ্যাখ তারক, নিত্য-গোপালের সঙ্গে বেশি মিশিসনে। ওর আলাদা ভাব। ও এখানকার লোক নয়।'

তেইশ-চব্বিশ বছরের ছেলে এই নিত্যগোপাল। বিয়ে-থা করেনি। বালকস্বভাব। নিয়ত বাস করে ভাবরাজ্যে। ডিমে তা দেওয়া পাখির দৃষ্টির মতো ফ্যালফেলে। ঠাকুর বলেন, পরমহংস অবস্থা। তাই দেখেন গোপালের মত।

গিরিশের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বসতে গিয়ে দেখেন আসনের কাছে একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। যত বিষয়ব্যাপারের কথা, পরনিন্দা আর পরচর্চা। ইশারায় বললেন কাগজখানা সরিয়ে নিতে। কাগজ সরাবার পর বসলেন আসনে।

সেখানে নিত্যগোপাল এসেছে।

'কি রে, কেমন আছিস?'

'ভালো নেই।' বললে নিত্যগোপাল। 'শরীর খারাপ। ব্যথা।'

'দু-এক গ্রাম নিচে থাকিস।'

'লোক ভালো লাগে না। কত কি বলে, ভয় হয়। আবার জোর করে ভয় কাটিয়ে উঠি।'

'ওই তো হবে। তোর আছে কে?'
'এক তারক আছে। সর্বদা সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। কিন্তু সময়ে-সময়ে ওকেও ভালো লাগে না।'
এত উচ্চভূমিতে আছে নিত্যগোপাল তার সঙ্গে সঙ্কেতে কথা হয় ঠাকুরের। 'তুই এসেছিস?' অমনি আবার উত্তর দেন নিগূঢ় স্বরে, 'আমিও এসেছি।'
ভাবাবস্থায় নিত্যগোপালের বুক রক্তবর্ণ। কিন্তু ভাব প্রকৃতিভাব। বলরামের বাড়িতে ভাবাবস্থায় নিত্যগোপালের কোলের উপর পা ছড়িয়ে দিলেন ঠাকুর। ঠাকুর সমাধিস্থ, আর নিত্যগোপাল কাঁদতে লাগল অঝোরে।
একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য, তোর কোনটা ভালো?'
'দুইই ভালো।' বললে নিত্যগোপাল।
'তাই তো বলি, চোখ বুজলেই তিনি আছেন আর চোখ চাইলেই তিনি নেই?'
সেদিন যেই নরেন গান ধরল—সমাধিমন্দিরে মা কে তুমি গো একা বসি, অমনি ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরকে বসানো হল আসনে, সামনে ভাতের থালা। সমাধির আবেশ এখনো কাটেনি সম্পূর্ণ, দুই হাতেই ভাত খেতে শুরু করে দিলেন। শেষে খেয়াল হলে বললেন ভবনাথকে, তুই খাইয়ে দে। ভবনাথ খাওয়াতে লাগল। ঠিকমত খাওয়া হল না আজ, বেশির ভাগই পড়ে রইল। বলরাম বললে, 'নিত্যগোপাল কি পাতে খাবে?'
'পাতে? পাতে কেন?' ঠাকুর প্রায় ধমকে উঠলেন।
'সে কি, আপনার পাতে খাবে না?'
নিত্যগোপালও ভাবাবিষ্ট। ঠাকুর এসে বসলেন তার পাশটিতে। যে পাতেই তোকে দিক, তোকে আমি খাইয়ে দি নিজের হাতে। তুই আমার গোপাল।
সেই গোপাল সেন। অনেক দিন হল সেই যে একটি ছোট্ট ছেলে আসত এখানে, এর ভেতর যিনি আছেন সেই মা তার বুকে পা রাখলে, মনে নেই? বললে, তোমার এখনো দেরি আছে, আমি পারছি না থাকতে ঐহিকদের মধ্যে। এই বলে যাই বলে বাড়ি চলে গেল। আহা, আর ফিরে এল না। তারপর শুনলাম দেহত্যাগ করেছে। সেই গোপালই নিত্যগোপাল।
এমন যে নিত্যগোপাল তার সঙ্গে মিশতে বারণ করলেন তারককে।
'ওরে সেখানে তুই যাস?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
বালকের মতো সরল মুখে বললে নিত্যগোপাল। 'যাই। নিয়ে যায় মাঝে-মাঝে।'
সে একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক। অপার ভক্তিমতী, ঠাকুরে দত্তচিত্ত। নিত্য-গোপালের অপূর্ব ভাবাবস্থা দেখে বড় আকৃষ্ট হয়েছে, তাকে সন্তানরূপে স্নেহ করে, কখনো-কখনো নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে।
'ওরে, সাধু সাবধান।' শাসনবাণী উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। 'বেশি যাসনে, পড়ে যাবি। কামিনীকাঞ্চনই মায়া। মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয় সাধুকে। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুও ডুবে গিয়ে খাবি খাচ্ছে সেখানে।'

নিত্যগোপালের পরমহংস অবস্থা আর স্ত্রীলোকটিও অশেষ ভক্তিসম্পন্না। তবুও কি অমোঘ শাসন। শাসনবেশে কি করুণা! সাধু সাবধান! কে জানে লৌহগৃহের কোন অসতর্ক ছিদ্রপথে সাপ ঢুকবে! পরমহংস হয়েছ বলেই মনে কোরো না তোমার আর পতন হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, সাধু সাবধান!
সেই নিত্যগোপাল অবধূত হয়েছে। জ্ঞানানন্দ অবধূত। চিতাভস্মভূষোজ্জ্বল দ্বিতীয় মহেশ। পরনে রক্তবাস হাতে ত্রিশূল গলায় নাগসূত্র। করে পানপাত্র মুখে মন্ত্রজাল বনে-গৃহে সমানুরাগ সন্ন্যাসী।
ঠাকুর তাই ঠিকই বলেছিলেন, ওর ভাব আলাদা। ও এখানকার নয়।
ওরা একডেলে গাছ, আমি পাঁচডেলে। আমার পাঁচফুলের সাজি।
মনের আনন্দে সে রাতে আর ঘুম এল না তারকের। একটি মৃদুমিঠে সুগন্ধের মতো উপভোগ করতে লাগল সেই অনিদ্রাটুকুকে।
মাঝরাতে চেয়ে দেখল ঠাকুর দিগ্বসন হয়ে ভাবের ঘোরে ঘুরছেন ঘরের মধ্যে আর কি সব বলছেন নিজের মনে। খানিক পরে বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়। বলছেন জড়িতস্বরে, 'ওগো, ঘুমিয়েছ?'
ধড়মড় করে উঠে বসল তারক। বললে, না তো, ঘুমুইনি।
'ঘুমোওনি? তবে আমাকে একটু রামনাম শোনাও তো।'
কি ভাগ্য, তারক উঠে বসে রামনাম শোনাতে লাগল।
রাত তিনটে বাজলেই আর ঘুমুতে পারেন না ঠাকুর। এমনিতে ঘুম দু-এক ঘণ্টার বেশি নয়, বাকি সময় যতক্ষণ জীবভূমিতে থাকেন, নাম করেন। যারা থাকে তাঁর কাছাকাছি সকলকে ডেকে তোলেন। ওরে ওঠ, আর কত ঘুমুবি? উঠে একবার ভগবানের নাম কর।
এক-এক দিন খোল করতাল নিয়ে এসে বাজনা শুরু করে দেন। কীর্তনের ধুম লাগান। তারপর নাচেন ভাবের আনন্দে ভরপুর হয়ে। ওরে তোরাও নাচ। লজ্জা কিসের? হরিনামে নৃত্য করবি তাতে আর লজ্জা কি! লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। যে হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে পারে না তার জন্ম বৃথা! নাচছেন আর দর-দরধারে অশ্রু ঝরছে।
বাক্যে যা বলবে মনে যা ভাববে বুদ্ধি দিয়ে যা নিশ্চয় করবে সবই অর্পণ করবে ঈশ্বরকে। সংকল্পবিকল্পকারী মনকে নিরোধ করে ভক্তিভরে ভজনা করলেই মিলবে অভয়। সুতরাং স্বীয় প্রিয়ের নাম করো। লজ্জা ত্যাগ করে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করো সংসারে। অনুরাগ উদিত হলেই চিত্ত বিগলিত হবে, কখনো হাসবে কখনো কাঁদবে কখনো রোদন-চীৎকার করবে কখনো বা উন্মাদের মত নৃত্য করবে। বায়ু অগ্নি সরিৎ সমুদ্র দিক দ্রুম আকাশ নক্ষত্র সমস্ত কিছুকে শ্রীহরির শরীর জেনে অনন্যমনে প্রণাম করবে। যে ভোজন করে তার যেমন প্রতি গ্রাসেই একসঙ্গে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় তেমনি যে ভজনা করে তারও নাম করার সঙ্গে-সঙ্গেই ভক্তি, ঈশ্বরের অনুভব ও বৈরাগ্য এসে পড়ে। 'ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।' এই ভজনাতেই পরা শান্তি, আর কিছুতে নয়।
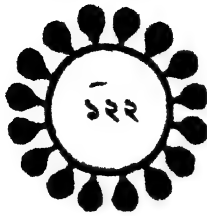
শিখে রাখ, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন। সামনে মাতাল, তাকে ধর্মকথা বলতে গেলে হয়তো কামড়ে দেবে। বরং তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতা, খুড়ো বলে ডাক, হয়তো তোকে আদর করে বসবে। দেখবি, শুনবি, বলবি নে। অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করার চেয়ে সহ্য করা ভালো। তুই কি কারু দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যে তোর শাসনে শোধন হবে? যিনি শাসন করবার ঠিক করবেন। তুই বিচারের ভালো-মন্দ কী বুঝিস? আর শোন, তৈরি অন্ন ছাড়বিনে কখনো। যদি ডাল-ভাত জুটে থাকে তাই খেয়ে নে, পোলাওয়ের আশা করবি নে। কাঠের মালা আর ঘেঁটু ফুল পেয়েছিস তাই দিয়ে সেরে নে শিবপুজো। কবে জবাফুল আর স্ফটিকের মালা পাবি তারই জন্যে বসে থাকবি পথ চেয়ে?

ভক্ত হবি, তাই বলে বোকা হবি? তোর হক ছাড়বি, স্বত্ব খোয়াবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক-ঠিক জিনিস দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি। ওজনে কম দিল কিনা দেখে নিবি যাচাই করে। আবার যে সব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় সে সব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবিনি।

মোট কথা, সরল হবি, উদার হবি, বিশ্বাসী হবি। তাই বলে বোকা বাঁদর হবি না। কাছাখোলা, আলাভোলা নেলাখেপা হবি না।

'অনেক তপস্যা, অনেক সাধনার ফলে লোকে সরল হয়, উদার হয়। সরল না হলে পাওয়া যায় না ঈশ্বরকে। সরল বিশ্বাসীর কাছেই তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।' বললেন ঠাকুর।

আর শোন, কান্না পেলেই কাঁদবি।

বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে বালকের মত রামলালের কাছে বসে কাঁদছেন ঠাকুর : 'আমি একটু খাঁটি দুধ খাব। কালীবাড়িতে যে দুধ খাই তাতে স্বাদগন্ধ নেই। বড় সাধ শাদা-শাদা ধোবো-ধোবো মেটো-মেটো গন্ধ এমন একটু খাঁটি দুধ খাই। একটু খাওয়াতে পারিস রামনেলো? বাজারে কি গয়লাবাড়িতে গিয়ে দেখ দেখি মেলে কিনা!'

ঘুরে এল রামলাল। হাত খালি। দুধের বিন্দুবিসর্গও কোথাও নেই।

তবে কি হবে? পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন ঠাকুর।

এদিকে বলরামের স্ত্রী তার গৃহে বসে দুধ জ্বাল দিচ্ছে আর কাঁদছে। যোগেন-মা কাছে বসে, তাকে লক্ষ্য করে বলছে, 'দেখ দিদি, এমন দুধ, প্রাণভরে ভগবানকে

খাওয়াতে পারলুম না। এ দিয়ে কেবল বাড়ির লোকের পেটপুজো হবে। এক কাজ করবি দিদি? যাবি দক্ষিণেশ্বর?'
যোগেন-মা তো স্তম্ভিত।
'রাত হয়ে এসেছে কেউ টের পাবে না। চল খিড়কি খুলে বেরিয়ে পড়ি। প্রাণ বড় উচাটন হয়েছে, ঠাকুরকে একটু খাইয়ে আসি খাঁটি দুধ। তুই যদি সঙ্গে যাস— যাবি?'
'যাব।'
আধসেরটাক দুধ নিলে একটা ঘটিতে করে। বাটি ঢাকা দিয়ে গামছা জড়ালে। তারপর গা ঢাকা দিয়ে চলল দক্ষিণেশ্বর। সেই একরাজ্যের পথ। তাও কিনা পায়ে হেঁটে!
সমস্ত বন্ধনবেষ্টনী লঙ্ঘন করে এ সেই ডাক। এ ডাক নিরবধি, এ ডাক পৃথিবী ছাড়িয়ে।
ঠাকুরের ঘরে ঢুকল এসে দুজন। হাতে গামছা-বাঁধা ঘটি।
পুলকিত হলেন ঠাকুর। শুধোলেন, 'দুধ এনেছ বুঝি?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ—'
'বিকেল থেকেই মনে হচ্ছে একটু ধেবো-ধোবো মেটো-মেটো খাঁটি দুধ খাই। তাই নিয়ে এসেছ তোমরা—'
যেন নন্দরানীর সামনে গোপাল, তেমনি ভাবে দুধ খেলেন ঠাকুর। পরে পরিহাস করে বললেন, 'তোমরা কুলের কুলবধূ, এত রাতে যে আমার কাছকে এলে তা তোমরা আমার হাতে দড়ি দেবে নাকি?' বলে হাসতে লাগলেন।
রামলালকে বললেন একটা গাড়ি নিয়ে আসতে। গাড়ি এলে বললেন, 'বলরামকে চুপিচুপি বলবি এরা আমার কাছকে এসেছিল যেন রাগ না করে।'
কিন্তু রাগ করছে হরিবল্লভ। বলরামের খুড়তুতো ভাই, কটকের সরকারী উকিল। অধিকন্তু রায় বাহাদুর।
নানা কথা কানে ঢুকেছে। নানা বিরুদ্ধ কথা। তুমি যাচ্ছ তো যাও, তুমি মাতামাতি করছ তো করো, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের ওখানে পাঠাও কেন? ওদের কি মাথাব্যথা?
বলরামের এক উত্তর। 'তুমি ভাই একবার তাঁকে দেখে যাও স্বচক্ষে।'
তাই এসেছে হরিবল্লভ। তাকে দেখি আর না দেখি তোমাকে এবার কটকে টেনে নিয়ে যাব। এই মত্ততার প্রভাব থেকে মুক্ত করব তোমাকে।
বলরামের বাড়ি ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্লা'। বলরামের অন্নই ঠাকুরের শুদ্ধান্ন। বলরামের সমস্ত পরিবার এক সুরে বাঁধা। এক মন্ত্রে উদ্দীপিত। স্বামী-স্ত্রী থেকে শুরু করে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ঠাকুরে প্রেরিত, ঠাকুরে ভাবিত, ঠাকুরে নিমজ্জিত।
স্বভাবে কৃপণ কিন্তু সাধুসেবায় বদান্য। বলেন, সাধুসেবা ছাড়া আত্মীয়পোষণ মানে ভূতভোজন। আত্মীয়স্বজনের পাল্লায় পড়ে ছোট মেয়ে কৃষ্ণময়ীর বিয়েতে অনেক খরচ করে ফেলেছেন তাই সারাদিন আছেন ভারি বিমর্ষ হয়ে। একটা সাধুভোজন

হল না অথচ এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেল জলের মত। অকারণে এত অপচয়!

এমন সময়ে দৈবযোগে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত যোগীন এসে উপস্থিত।

বলরামের আনন্দ তখন দেখে কে। ব্যাকুল হয়ে তার দুহাত চেপে ধরল বলরাম। বললে, 'গৃহীর বিবাহে সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ খাওয়া বারণ। জানি। তবু ভাই তুমি যদি দয়া করে অন্তত একটা মিষ্টিও খাও আমার সব সার্থক হবে। তখন এত ব্যয় আর অপব্যয় বলে মনে হবে না।'

তা কি করে হয়! যোগীন মুখ ফেরাল।

কান্নার কাছে কার নিস্তার আছে! বাপই গলবেন, আর এ তো তাঁর সন্তান।

বলরামের কাতরতায় নরম হল যোগীন। নিল একটা মিষ্টি। মুখে দিল। অমনি সমস্ত মধুর হয়ে গেল বলরামের। যা মনে হয়েছিল ক্ষয় তাই মনে হল আনন্দ। যা মনে হয়েছিল অপব্যয় তাই ঐশ্বর্য-উল্লাস।

কৃষ্ণময়ীর খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু শ্বশুরঘর করতে যাবার সময় গাড়িতে উঠেছে গয়নার বাক্স সঙ্গে নিয়ে নয়, ঠাকুরপুজোর বাক্সটি কাঁখে করে। ঠাকুরের নিত্য-পুজার ছবিখানি আর জপের মালাগাছি রয়েছে সে বাক্সটিতে। সেই তার ইহজীবনের পাথেয়, পরজীবনের ভাণ্ডার।

ঠাকুর বললেন, আহা দেখেছ, কৃষ্ণময়ীর চোখ দুটি ঠিক ভগবতীর চোখের মত!

বলরামের শাশুড়িও কম যায় না। ঠাকুর প্রণাম করে-করে কপালে কড়া পাড়িয়ে ছেড়েছে। পুত্র বাবুরামকে অর্পণ করে দিয়েছে ঠাকুরের পদসেবায়। পরিপূর্ণচিত্তে। 'যমে নিলে যতটা শোক না হয় তার চেয়ে বেশি হয় ছেলে সংসারবিরাগী হলে।' বললেন ঠাকুর।

কিন্তু বাবুরামের মা মূর্তিমতী প্রশান্তি।

বলরামের অসুখ করেছে, তার গায়ে হাত বুলোচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, 'রুগীকে আমি ছুঁতে পারি না, রোগের যাতনায় ভগবানকে ভুলে থাকে বলে। কিন্তু বলরামের কথা আলাদা। রোগের মধ্যেও ওর মন ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন।'

ভাইয়েদের উপর জমিদারির ভার তুলে দিয়েছে। বাঁধাবরাদ্দ মাসোয়ারা নিয়েই সে খুশি। কিন্তু সে টাকায় যেন ইদানীং সঙ্কুলান হচ্ছে না তা নিয়ে একদিন আক্ষেপ করল বলরাম। নরেন কাছে ছিল, বলে উঠল, 'নিজের বিষয় নিজে দেখলেই তো হত। বেশ থাকতে পারতেন স্বচ্ছন্দে।'

কথাটা যেন মর্মে লাগল এসে বলরামের। বললে, 'নরেনবাবু গড অলমাইটি। আপনার কথা ফিরিয়ে নিন। প্রভু আর তাঁর সন্তানদের সেবা করছি আমি। আমি কি করে বিষয়ী হব?'

সেই বলরামকে ফেরাতে এসেছে হরিবল্লভ।

শ্যামপুকুরে ঠাকুর তখন অসুস্থ, একদিন এসেছে বলরাম। মুখখানি চিন্তাম্লান। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'কি হয়েছে? কিসের এত ভাবনা?'

বলরাম বললে যা বলবার।

'কি রকম লোক তোমার এই ভাইটি?'

'এমনিতে ভালো। ঈশ্বরবিশ্বাসী। দোষের মধ্যে এই, শুধু ঈশ্বর নয়, যা শোনে তাই বিশ্বাস করে বসে।'

'তা করুক। একদিন এখানে আনতে পারো?'

'জানি না আসবে কিনা। এত সব বাজে কথা শুনেছে আপনার সম্বন্ধে, বোধহয় চাইবে না আসতে।'

'তা হলে এক কাজ করো। গিরিশকে ডাকো।'

এল গিরিশ। কি ব্যাপার? হরিবল্লভ? হরিবল্লভ বোস? বা, ও আর আমি যে এক-সঙ্গে পড়েছি। আমি ঠিক ওকে নিয়ে আসতে পারব।

পরদিনই টেনে নিয়ে এল গিরিশ।

'ঐ দেখ আমি বলেছিলাম না, কেমন শিশুর মতো সরল দেখতে!' হরিবল্লভের দিকে তাকিয়ে ভাবাকুলস্বরে বলতে লাগলেন ঠাকুর : 'যার হৃদয় ভক্তিতে ভরপুর নয় তার কি অমন চোখ হতে পারে?' তারপরে হরিবল্লভকে সবিশেষ লক্ষ্য করলেন। 'ভেবে-ছিলুম কটকের সরকারী উকিল কত না জানি তোমার চোটপাট, কিন্তু এখন দেখছি বিনম্র, অকিঞ্চন—'

ঠাকুরকে অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করল হরিবল্লভ। এ কার সম্বন্ধে শুনেছিল সে? এ কে পীযূষপুঞ্জদৃষ্টি কোমলগাত্রপবিত্র মধুমঙ্গলপ্রিয়।

'শুধু তাই নয়, আমার আত্মীয় আপনি। বলরাম যেমন আত্মীয়। কি বলেন?'

ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল হরিবল্লভ। বললে, 'আপনার দয়া।'

গলে গেল সমস্ত কাঠিন্য। উড়ে গেল সমস্ত বিমুখতা। এই করুণাঘনের কাছে বসতে ইচ্ছা হল ঘন হয়ে।

'মেয়েরাও পায়ের ধুলো নেয়। তা ভাবি, তিনিই একরূপে আছেন ভিতরে—প্রণাম তাঁর, আর কারু নয়!'

'বা, আপনি তো সাধু।' বললে হরিবল্লভ, 'আপনাকে সকলে প্রণাম করবে তাতে দোষ কি।'

হরিবল্লভের দোষদৃষ্টি ঘুচে গেল মুহূর্তে।

ঠাকুর বললেন, 'আমি কি! সে ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ কপিল কেউ এলে হত। আমি রেণুর রেণু।' তাকালেন হরিবল্লভের দিকে। 'আপনি আবার আসবেন।'

'আপনি বলছেন কেন?'

'বেশ, আবার এসো।'

'বলতে হবে কেন, নিজের টানেই আসব।'

'বলরাম অনেক দুঃখ করে। মনে হল একদিন যাই, গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হয়। পাছে বলো, একে কে আনলে?'

বড় লজ্জিত হল হরিবল্লভ। যেন ধরা পড়ে গেছে। পাশ কাটাবার চেষ্টায় বলল, 'ও সব কথা কে বলেছে? আপনি কিছু ভাববেন না।'

পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপায় নেই, পথও নেই। একেবারে ঢেলে দিতে হবে পায়ের উপর। নৈবেদ্য করে দিতে হবে দেহ-মন!

বড়লোক বলেই তো এটুকু অহঙ্কার! ঈশ্বরকৃপা না থাকলে খুব বড়লোকও অপদার্থ হয়ে যায়। যদু বংশ ধ্বংসের পর অর্জুন আর পারল না গাণ্ডীব তুলতে।
যাবার আগে ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিতে গেল হরিবল্লভ। ঠাকুর পা গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়বার পাত্র নয়। আর সে ছাড়বে না এ প্রাণজীবনকে। জোর করে টেনে নিল দু পা। ধুলো নিল ললাটে।
নীরোগনির্মল হয়ে গেল। জীবনের চক্রাবর্তের মধ্যে খুঁজে পেল ধ্রুব বিন্দু।
এসেছিল বলরমাকে নিয়ে যেতে, নিজেই বাঁধা পড়ল। ঐ যে বাপ বলেছিল নেশাখোর ছেলেকে, কি মধু যে পাস ঐ মদে কে জানে। ছেলে বলেছিল, একটু খেয়েই দেখ না। বাপ খেল, দেখি কি ব্যাপার। খেয়ে উঠে ছেলেকে বললে, ও তুমি ছাড় বাপু, আমি আর ছাড়ছিনে। সেই অবস্থা!
হরিবল্লভ চলে গেলে পর বললেন ঠাকুর, 'কেমন ভক্তি দেখেছ! নইলে জোর করে পায়ের ধুলো নেয়!'
পরে মাস্টারকে বললেন চুপিচুপি, 'সেই যে তোমায় বলেছিলাম না ভাবে দেখলাম দুজন লোক। একজন ডাক্তার, মহেন্দ্র ডাক্তার, আর, আরেকজন এই লোক, এই হরিবল্লভ। তাই দেখ এসেছে।'
আবার এসেছে।
এবার নিচে মাটির উপর বসে ঠাকুরকে পাখা করছে হরিবল্লভ।
কিন্তু হরীশের সর্ববিসর্জন। সব ছেড়েছুড়ে ডেরা নিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। বলে, 'উপায় নেই, এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে। নইলে টাকা দেবে না ব্যাঙ্ক।'
মহিমাচরণ বেদান্তচর্চা জ্ঞানচর্চা করে, হরীশ রাগভক্তির আখড়াধারী।
'জ্ঞান কি জানিস?' ঠাকুর বোঝাচ্ছেন হরীশকে। 'স্বস্বরূপকে জানা। মায়াই দেয় না জানতে। যেন সোনার উপর ঝোড়াকতক মাটি পড়েছে সেই মাটিটা ফেলে দেওয়া। ঐ মাটিটাই মায়া।'
'আর রাগভক্তি?'
'যেমন একটা পোড়োবাড়ির বনজঙ্গল কাটতে-কাটতে নলবসানো ফোয়ারা পেয়ে যাওয়া। মাটি সুরকি ঢাকা ছিল, যাই ঢাকা সরে গেল ফরফর করে জল উঠতে শুরু করল।'
প্রকৃতিভাব হরীশের, মেয়ের কাপড় পরে শোয়। অথচ নিজের স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে এসেছে। ঠাকুর তাকে বলছেন, 'ওরে যা না একবার বাড়ি। তোর বউ খায় না, ঘুমোয় না, খালি কাঁদে। একবারটি তাকে দেখা দিয়ে এলে কি হয়?'
মুখ গোঁজ করে বসে থাকে হরীশ। কানে আঙুল দেয় মনে-মনে।
'কচি মেয়েটাকে একটু দয়া করতে পারিসনে? দয়া কি সাধুর গুণ নয়? ওরে তাকে যদি একটু বোঝাস সে ঠিক বুঝবে।'
দয়া দেখাতে গিয়ে দায়ে পড়ে যাই আর কি। চোখের জল দেখে ফের ব্যাধের জালে জড়িয়ে পড়ি। ঠাকুর কি আমাকে পরীক্ষা করছেন?
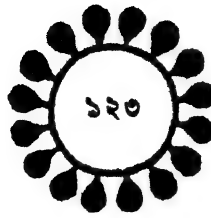
'ভয় কি রে? আমি আছি।' তারককেও তাই বলছেন ঠাকুর। 'স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখাশোনা করতে হবে বৈকি। একটু ধৈর্য ধর, মা সব ঠিক করে দেবেন। মাঝে-মাঝে যাবি বাড়িতে, যেমন-যেমন বলে দেব তেমন-তেমনটি করবি। দেখবি স্ত্রী সঙ্গে থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।'

রাখালকেও পাঠিয়েছি অমনি তার স্ত্রীর কাছে।

ভয় কিসের? আমি আছি।

দুস্তর সমুদ্রে আমিই দীপস্তম্ভ। বিপথ-বিপদের অন্ধকারে আমিই অরুণোদয়। নিদারুণ নৈষ্ফল্যের মধ্যে আমিই মঙ্গলস্বরূপ। যদি কিছু থাকে এ বিশ্বলোকে, যদি কোনো শ্রী—সমস্ত বিরোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে যদি কোনো শৃঙ্খলা—তবে আমি আছি।

আফিসে কাজ করত তারক, ছেড়ে দিল। আর যখন রাখালের বেলায় কথা উঠল তাকে চাকরিতে বসিয়ে আবদ্ধ করবে তখন ঠাকুরকে এসে জানাতেই ঠাকুর বললেন, 'খবরদার, ঈশ্বরের জন্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস এ বরং শুনব তবু কারুর দাসত্ব করছিস চাকরি করছিস এ কথা যেন না শুনি।'

কিন্তু নিরঞ্জনের বেলায় অন্য কথা। কেন হবে না? সেও চাকরি করছে বটে, কিন্তু মা'র ভরণপোষণের জন্যে।

'মা'র জন্যে কর্ম করে, তাতে দোষ নেই।' বলছেন ঠাকুর। 'আহা মা! মা ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা!'

মা নেমে আয়, নেমে আয়। একদিন হঠাৎ তারকের বুকে পা রাখলেন ঠাকুর। মাথায় হাত বুলুতে-বুলুতে বলতে লাগলেন, নেমে আয় মা, নেমে আয়। যেমন রাখালের জিভ টেনে ধরে সাঙ্কেতিক মন্ত্র এঁকে দিয়েছিলেন তেমনি তারকের জিভে নখাগ্র দিয়ে লিখে দিলেন বীজমন্ত্র। কুণ্ডলীপাকানো সাপ হেলে-দুলে উঠল। করল ফণাবিস্তার।

কেমন ভাবে শুবি? ভক্ত সন্তানদের শেখাচ্ছেন ঠাকুর: 'প্রথমটা চিত হয়ে শুবি। ভাববি মা-কালী দাঁড়িয়ে আছেন বুকের উপর। এই ভাবে মায়ের ধ্যান করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়বি। দেখবি সুস্বপ্ন হবে।'

রাত দুপুরে উঠে পড়েছেন কখন। ওরে তারক, আমাকে একটু গোপালনাম শোনা তো! নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে।

যদি কাউকে না পান, দারোয়ানকে ডাকিয়ে আনেন। আমাকে একটু রামনাম শোনাও দারোয়ানজী। শুধু নাম। সীতারাম। জীবনের সমস্ত শীতে যে আরাম সেই সীতারাম।

তারকের সময়-সময় ইচ্ছে হয় ঠাকুরের কাছে বসে কাঁদে। কেন কাঁদবে? তা জানে না। দুঃখে না আনন্দে, তাও না। দুঃখের আনন্দে না আনন্দের দুঃখে, তা বা কে বলবে? এমনি অহেতুক কাঁদব। সব চেয়ে বড় কথা, কাঁদতে ভালো লাগবে।

একদিন সত্যি-সত্যি বকুলতলার কাছে পোস্তার উপর বসে খুব খানিকটা কাঁদল তারক।

'ওরে ওরে দ্যাখ তো, তারক কোথায় গেল?' ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কান্না ঠিক তাঁর কানে গেছে। আর অমনি চঞ্চল হয়েছেন।

ডাকিয়ে আনলেন তারককে। কাছে বসালেন। বললেন, 'কাঁদছিস? খুব ভালো কথা। ভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়। জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়।'

কাঁদতে-কাঁদতে ধ্যান, তন্ময়তা। কান্নাতেই কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ।

ধ্যান হত গিয়ে এঁড়েদার বিষ্ণুর। ধ্যানে কাঠ মেরে যেত। সবাই ধাক্কা মারছে, তবু নিঃসাড়। কত ডাকাডাকি, বিষ্টু, ও বিষ্টু, কোথায় কে। নাকের নিচে হাত রাখো, নিশ্বাসের রেখা নেই। তখন সবাই খবর দিতে ছুটল ঠাকুরকে। ঠাকুর এসে ছুঁয়েছেন কি, বিষ্ণু চোখ মেলেছে। সূর্যের স্পর্শে জেগেছে অরবিন্দ।

ছোকরা বয়েস, ইস্কুলে পড়ে। এরই মধ্যে এত!

ঠাকুর বললেন, 'পূর্বজন্মের সংস্কার। গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছে একজন। আরাধনা করছে শবের উপর বসে। কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। নানারকম বিভীষিকা দেখছে। শেষকালে মূর্তিমান বিভীষিকা বাঘ তাকে ধরে নিয়ে গেল। আরেকজন বাঘের ভয়ে গাছে চড়ে বসেছিল। সে ভাবলে এই ফাঁকে একটু শবসাধন করে নি। পুজার সমস্ত উপকরণ তৈরি, আচমন করে একটু বসে পড়ি শবের উপর। যেই ওকথা মনে এল তরতর করে নেমে এল গাছ থেকে। আচমন করে শবের উপর বসে জপ করতে লাগল। একটু জপ করতে না করতেই ভগবতী আবির্ভূত হলেন। বললেন, প্রসন্ন হয়েছি, বর নাও। তখন সে লোক বললে, মা, এ কী কাণ্ড। ঐ লোকটা অত খেটেপিটে অত আয়োজন করে তোমার সাধন করছিল, তোমার দয়া হল না, আর আমি ওর ছাড়া-আসনে বসে কি একটু জপ করলুম আর অমনি আমাকে দর্শন দিলে! ভগবতী তখন হাসিমুখে বললেন, বাছা, তুমি কি জন্মান্তরের কথা কিছু জানো? তুমি কত জন্ম আমার জন্যে তপস্যা করেছ তা কি আর তোমার মনে আছে? এই একটু শুধু বাকি ছিল, আজ এই দণ্ডে তা পূরণ হয়ে যেতেই আমার দর্শন পেলে। এখন বলো কি বর পছন্দ?'

সেই বিষ্ণু গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শুনে অবধি ঠাকুরের মন খুব বিষণ্ণ। বললেন, 'অনেক দিনই বলত আমাকে—সংসার ভালো লাগে না। পশ্চিমে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল, সারা দিন এখানে-সেখানে

মাঠে-নির্জনে পাহাড়ে-বনে বসে শুধু ধ্যান করত। আমাকে বলত কত ঈশ্বরীয় রূপ সে দর্শন করে। বোধহয় এই শেষ জন্ম। পূর্বজন্মে অনেক করা ছিল, বাকিটুকু সেরে নিল এ জন্মে, এই কটি অল্প বছরের মধ্যে।'

'কিন্তু আত্মহত্যা শুনে ভয় হয়।' বললে একজন ভক্ত।

'আত্মহত্যা মহাপাপ। ফিরে-ফিরে আসতে হবে সংসারে আর জ্বলতে হবে দাবাগ্নিতে। তবে যদি কেউ ঈশ্বরদর্শন করে দেহত্যাগ করে স্বেচ্ছায়, তবে তাতে আর দোষ নেই। তাকে বলে না আত্মহত্যা। যখন একবার সোনার প্রতিমা ঢালাই হয়ে যায় মাটির ছাঁচে, তখন মাটির ছাঁচ ভেঙে ফেললে আর দোষ কি।'

আত্মহত্যা কি রকম জানো? জেল থেকে কয়েদী পালানো। জেল থেকে পালিয়ে কয়েদীর রেহাই নেই, এক সময় না এক সময় সে ধরা পড়বেই। তখন তার দ্বিগুণ খাটনি। প্রথম, তার প্রথম মেয়াদের বাকি অংশ; দ্বিতীয়, জেল-পালানোর জন্যে অতিরিক্ত দণ্ড। তাই আত্মহত্যা অর্থে দ্বিগুণ কারাবাস।

ওরে এবার তোরা ভিক্ষেয় বেরো। ঠাকুর ডাকছেন তাঁর ভক্ত-সন্তানদের। ওরে কাঁধে ঝুলি নে, নগ্ন পায়ে ফের গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে। নীরবে নম্রমুখে গিয়ে দাঁড়া। যাতে তোকে দেখলেই বুঝতে পারে তুই দীনহীন, তুই ভিক্ষুক—

ভিক্ষেয় বেরুব?

হ্যাঁ, অভিমান নাশ করতে হবে, নির্মূল কর্‌তে হবে। নত হতে হবে প্রত্যেকের সামনে। পায়ের নিচে মাটির ঢেলার মতো অহঙ্কারকে ধুলো করে দিতে হবে। দ্বারে-দ্বারে নিষেধ দ্বারে-দ্বারে প্রত্যাখ্যান তবু অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে চিত্তের প্রসন্নতা। চতুর্দিকে নৈরাশ্য, তবু তার ঊর্ধ্বে জাগ্রত রাখতে হবে নিষ্ঠার জয়নিশান। ওরে ভিক্ষেয় বেরো। অহমিকাকে কুহেলিকার মত উড়িয়ে দে। জীবনের দৈন্যের গহ্বরকে গভীর করে তোল। ভিক্ষার সুধায় ভরে তোল সেই বিরহের পাত্র।

সব চেয়ে সহজ কে? ঈশ্বর। দুঃখ কি? অসন্তোষ। সুখ কি? আত্মবোধের যে শান্তি। শত্রু কে? গুরুবাক্যে সংশয়। প্রেয়সী কে? দীনে করুণা ও সজ্জনে মৈত্রী। শোভা কি? নিস্পৃহতা। তৃপ্তি কি? সর্বসঙ্গবিরতি। কামধেনু কি? অনঘা শ্রদ্ধা।

বলরামের সঙ্গে রাখাল বৃন্দাবনে গিয়েছে। শরীর টিকছে না কলকাতায়। যদি বৃন্দাবনে গিয়ে ভালো হয়, আনন্দে থাকে।

ওমা, সেই বৃন্দাবনে গিয়ে ফের রাখালের অসুখ করেছে।

'কি হবে!' ঝরঝর করে বালকের মতো কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। 'ওরে ও যে সত্যিই ব্রজের রাখাল। যদি ওর নিজের জায়গা পেয়ে আর ফিরে না আসে! যদি স্বস্থানে শরীর রাখে!'

রেজেস্ট্রি করে চিঠি পাঠানো হল কিন্তু উত্তর নেই।

মা'র কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। পরিত্রাণপরায়ণা ভবতারিণীর। বিশ্বেশ্বরীর কাছে। মা, আমার রাখালকে ফিরিয়ে দে। ও আমার গোপাল, ও আমার নিত্যসঙ্গী। আমার হাড়ের হাড়। আমার নয়নের নয়ন।

রাখালের চিঠি এসেছে। লিখেছে মাস্টারকে। লিখেছে এ বড় ভালো জায়গা।

এখানে ময়ূর-ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করছে—
শুনে ঠাকুরের আনন্দ দেখে কে। তার জন্যে চণ্ডীর কাছে মানসিক করেছিলুম। সে যে বাড়িঘর ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল। তাকে আমিই তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগের যে তখনো বাকি ছিল! আহা, কি লিখেছে দেখ! ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করছে। লিখবেই তো! ওর যে সাকারের ঘর।
বৃন্দাবন থেকে ফিরে পিতৃগৃহে উঠেছে রাখাল। ঠাকুরের অভিমান নেই। বললেন, 'রাখাল এখন পেনসন খাচ্ছে।'
'আপনার সামনে একটি ব্রহ্মচক্র রচনা করে সাধনা করি এ আমার ইচ্ছে।' একদিন বললে মহিমাচরণ।
বেশ তো! রাজী হলেন ঠাকুর।
কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রে রচিত হল সেই ব্রহ্মচক্র। মাস্টার, কিশোরী আর রাখাল বসেছে সেই চক্রে। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু গঙ্গার ছলছলানি যা একটু শোনা যাচ্ছে। আর ঝিল্লির অন্ধগুঞ্জন। মহিমাচরণ সবাইকে বললে ধ্যানস্থ হতে। ছোট খাটটিতে বসে একদৃষ্টে দেখছেন ঠাকুর।
ধ্যান শুরু হতে না হতেই রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত। ঠাকুর নেমে এসে রাখালের বুকে হাত বুলুতে লাগলেন। শোনাতে লাগলেন মা'র নাম।
ব্রহ্মচক্রে বসে রাখালই ব্রহ্মানন্দ।
'রাখালকে দিয়ে মা কত কি দেখালেন। ওরে সব কথা বলতে নেই, বলতে বারণ।'
তোমাকে জানি আমার সাধ্য কি! আনন্দে যে তুমি আমার কাছে একটু ধরা দিয়েছ এতেই আমি তোমার আপন হয়ে গেছি। আমার শরীরে এই যে বহমানা প্রাণধারা এ তো তোমারই নামজপমালা।
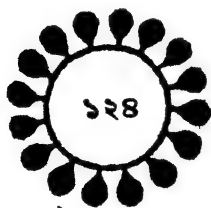
'একটা চিল একটা মাছ মুখে করে উড়ে যাচ্ছে, আর-সব চিল তাকে তাড়া করল, ঠোকরাতে লাগল।' বলছেন ঠাকুর। 'মহাযন্ত্রণা। তখন চিল করলে কি! মাছটা ফেলে দিলে মুখ থেকে। ব্যস নিশ্চিন্দি। তখন তার মহানিস্তার।'
অতএব চিল তোমার গুরু। তার থেকে শিখলে অপরিগ্রহ। শিখলে অকিঞ্চনতা।
'গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়।' বললেন ঠাকুর। 'বাণলিঙ্গ শিব খুঁজছিল একজন।

কোথায় পাবে কে জানে। তখন একজন বলে দিল, অমুক নদীর ধারে যাও, অমুক গাছ দেখতে পাবে সেখানে। সেই গাছের কাছে দেখতে পাবে ঘুরনি-জল। সেই জলে গিয়ে ডুব দাও, পাবে বাণলিঙ্গ। তাই বলি সন্ধান নিয়ে ডোবো।'

প্রথম গুরু পৃথিবী।

কি শিখলে পৃথিবীর কাছ থেকে? আপন ব্রতে অচল থাকবার বুদ্ধি। কত উৎপাতে আক্রান্ত হচ্ছে তবু অবিচল। আর শিখবে ক্ষমা। সহিষ্ণুতা।

দ্বিতীয় গুরু বৃক্ষ।

কি শিখলে বৃক্ষের কাছ থেকে? পরার্থে জীবনধারণ। কেটে ফেললেও কিছু বলে না, রৌদ্রে শীর্ণশুষ্ক হয়ে গেলেও জল চায় না। 'তরু যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে তবু পানি না মাগয়।' অস্নেহে-অসেবায়ও ফলধারণ করে, আর যারা স্নেহ-সেবা করেনি তাদেরই জন্যে করে সেই ফলোৎসর্গ।

তৃতীয় গুরু বায়ু।

গন্ধবহন করে কিন্তু লিপ্ত হয় না। তেমনি বিষয়ে প্রবিষ্ট হয়েও বাক্য ও বুদ্ধিকে অবিকৃত রাখব। শিখব অনাসক্তি।

চতুর্থ আকাশ।

অনন্ত হয়েও সামান্য ঘটের মধ্যে এসে ঢুকেছে। ব্যাপ্ত হয়ে আছে মেঘলোকে অথচ মেঘ তাকে ছুঁতে পাচ্ছে না। তেমনি আত্মা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েও অস্পৃষ্ট। তেমনি আকাশের মত অসঙ্গ হও।

তারপর, জল।

কি শিখবে জলের থেকে? স্বচ্ছতা, স্নিগ্ধতা, মধুরতা। জল যেমন নির্মল করে তুমিও তেমনি দর্শন স্পর্শন ও কীর্তন দ্বারা বিশ্বভুবন পবিত্র করো।

ষষ্ঠ গুরু, অগ্নি।

কাঠের মধ্যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন, অব্যক্ত, নিগূঢ়। প্রতি কণা কাঠে প্রতি কণা অগ্নি। তেমনি সমস্ত বিশ্বে ঈশ্বর গুপ্তরূপে অনুস্যূত। প্রদীপ্ত হলেই অগ্নি সমস্ত মালিন্য দগ্ধ করে অথচ সেই মালিন্যস্পর্শে নিজে কলুষিত হয় না। তেমনি তুমিও তেজে ও তপস্যায় প্রদীপ্ত হও, যারই সেবা পাও না কেন, পাপমলে লিপ্ত হয়ো না। আগুনের নিজের কোনো উৎপত্তিবিনাশ নেই। উৎপত্তিবিনাশ শিখার, আগুনের নয়।

পরের গুরু, চন্দ্র।

হ্রাসবৃদ্ধি হয় কার? চন্দ্রকলার, চন্দ্রের নয়। তেমনি জেনে রাখো যা কিছু জন্মমৃত্যু সব দেহের, আত্মার নয়।

চন্দ্র গুরু হলে সূর্যও গুরু।

কী শিখবে সূর্যের থেকে? আত্মা যে স্বরূপতঃ অভিন্ন সেই তত্ত্ব। পাত্রে জল আছে তার উপরে পড়েছে সূর্যকিরণ। জলপাত্রের আকারভেদে সূর্যকিরণকে ভিন্ন-ভিন্ন সূর্যরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। আসলে সূর্য এক, অনন্য। তেমনি উপাধিভেদে আত্মাকে ভিন্ন-ভিন্ন আত্মা মনে হয়। আসলে আত্মা এক, দ্বিতীয়রহিত। আরো কিছু শেখবার আছে সূর্যের কাছে। সূর্য পৃথিবীর জল আকর্ষণ করে আবার

পৃথিবীকেই প্রত্যর্পণ করে। তুমিও তেমনি বিষয় গ্রহণ করে যথাকালে অর্থীদের বিতরণ করো।
নবম গুরু, কপোত।
কপোতের কাছ থেকে শিখবে অতিস্নেহ বা আসক্তিবর্জন। কি হয়েছিল শোনো। এক কপোত কপোতীর প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে বাসা বাঁধল বৃক্ষচূড়ে। স্বাধীন বিচরণের আনন্দ আর রইল না। কালক্রমে সন্তান হল কতগুলি। সংসারবাসের এই বা কম আনন্দ কি! এই সুখস্পর্শ মধুর কূজন, এই অঙ্গচেষ্টা। একদিন আহারের খোঁজে গিয়েছে দুজনে, শাবকগুলি মাটির উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় এক দুরন্ত ব্যাধ এসে উপস্থিত। জাল ফেলে সহজেই ধরে ফেলল বাচ্চাগুলোকে। মা মায়ামুগ্ধা কপোতী এসে দেখে সর্বনাশ। রোদন করতে লাগল। কাঁদতে-কাঁদতে নিজেও সেই জালের মধ্যে আটকা পড়ল। কপোত এসে দেখল, স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাই চলে যাচ্ছে তাকে ফেলে। এ সব স্নেহপুত্তলীদের ছেড়ে কি করে থাকব বৃক্ষনীড়ে, আর কেনই বা থাকব? এই বিবেচনা করে সে নিজের থেকেই ঢুকল গিয়ে জালের মধ্যে। ব্যাধ তো সিদ্ধকাম। এক জালে এতগুলো পাখি ধরতে পারবে এ তার কল্পনার অতীত। অত্যাসক্তির জন্যেই কপোত-কপোতীর এই ছিন্নদশা। সুতরাং স্নেহপ্রসঙ্গে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না।
তারপর, অজগর।
অজগর কী করে? যথালব্ধ দ্রব্যদ্বারা শরীরমাত্র নির্বাহ করে। যদি কিছু নাও জোটে, নিশ্চেষ্ট হয়ে ধৈর্য ধরে পড়ে থাকে। তেমনি অজগরকে দেখে সর্বারম্ভপরিত্যাগী হও।
তারপর চেয়ে দেখ সমুদ্রের দিকে।
প্রসন্ন, গম্ভীর, দুর্বিগাহ্য ও দুরত্যয়। তেমনি হবে সমুদ্রের মত। আর কী? বর্ষায় জলাগমে স্ফীত হয় না, গ্রীষ্মে জলাভাবে শুষ্ক হয় না। তেমনি নিরভিমান তেমনি নিত্যসরস চিরপরিপূর্ণ থেকো।
দ্বাদশ গুরু, পতঙ্গ।
কামমূঢ় হয়ো না। আগুনে মুগ্ধ হয়ে পুড়ে মরে পতঙ্গ তেমনি বস্ত্রাভরণসজ্জিত নারী দেখে উড়ে পড়ো না। বিরত থাকো। দৃঢ়ব্রত হও।
ত্রয়োদশ, মধুকর।
ছোট-বড় নামী-অনামী সকল ফুল থেকেই ভ্রমর মধু আহরণ করে। তেমনি ছোট-বড় মানী-অমানী সকলের কাছ থেকেই সারসংগ্রহ করবে। আর কী শিখবে? শিখবে সঞ্চয়নিবৃত্তি। মৌমাছি যে মধু সঞ্চয় করে, অন্যে এসে কেড়ে-ধরে নিয়ে যায়। তেমনি কৃপণের ধন যায় সেয়ানের পেটে।
আরেক গুরু, হাতি।
করিণীর অঙ্গসঙ্গ লাভের জন্যে গর্তে পড়ে বাঁধা পড়ে। সুতরাং যে সন্ন্যাসী সে দারুময়ী যুবতীমূর্তিকেও ছোঁবে না পা দিয়ে।
পরের গুরু, হরিণ।

হরিণ ধরা পড়ে ব্যাধের গীতে আকৃষ্ট হয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গও নারীদের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে আটকা পড়েছিল সংসারে। সুতরাং নৃত্যগীত সেবা করবে না।

তারপরে মৎস্য।

রসে জিতে সর্বং জিতং। রসনা জয় করতে পারলেই সর্বজয়ী হলে। আমিষযুক্ত বড়িশ দিয়েই মাছ ধরে। সুতরাং সর্ব অর্থে রসনাকে সংযত করো।

আরেক গুরু পিঙ্গলা।

বিদেহনগরের গণিকা এই পিঙ্গলা। একদিন বেশভূষা করে প্রণয়ীর আশায় অপেক্ষা করছে গৃহদ্বারে। এ এল না, ও নিশ্চয়ই আসবে এমনি ভাবছে পথচারীদের লক্ষ্য করে। একবার ঘরে ঢোকে, আবার দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। আশা-নিরাশায় দুলছে এমনি সারাক্ষণ। প্রায় মধ্যরাতও বুঝি কেটে যায়। তখন মনে নির্বেদ এল পিঙ্গলার। ছি-ছি, নিজ দেহ বিক্রয় করে অন্য দেহ থেকে রতি আর বিত্ত আশা করছি। যিনি সর্বদা সমীপস্থ, যিনি রতিপ্রদ বিত্তপ্রদ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে দুঃখভয়শোকমোহের আকর তুচ্ছ দেহকে ভজনা করছি। না, এ অপমান সহনাতীত। সর্বদেহীর যিনি সুহৃৎ, প্রিয়তম, নাথ আর আত্মা, তাঁর নিকট দেহ বিক্রয় করে লক্ষ্মীর মত তাঁর সঙ্গেই আমি রমণ করব। এখন যেহেতু কামনাভঙ্গজনিত নৈরাশ্য আমার মনে এসেছে ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয়ই আমার উপর সদয় হয়েছেন। অতএব বিষয়সঙ্গহেতু যে দুরাশা তা ত্যাগ করে ভগবানের শরণ নিলাম। শান্তি পেল পিঙ্গলা। শয্যায় গিয়ে সুখে ঘুমিয়ে পড়ল। আশাই দুঃখের কারণ, আশাত্যাগই পরম সুখ।

অষ্টাদশ গুরু, বালক। অজ্ঞ বালক।

মান নেই অপমান নেই চিন্তা নেই ভাবনা নেই লজ্জা ঘৃণা ভয় কিছু নেই। বালকের থেকে শেখ আত্মক্রীড়তা। আত্মক্রীড় হয়ে সংসারে অবস্থান করো।

অন্য গুরু, কুমারী।

হাতে কয়েক গাছি কঙ্কণ, ঘরে বসে ধান কুটছে কুমারী। মৃদু-মৃদু শব্দ হচ্ছে কঙ্কণের। বাইরে উৎকর্ণ পথিক দাঁড়িয়ে পড়েছে কঙ্কণের শব্দে। নিশ্চয়ই এ কোনো কুমারীর গৃহকাজ, তারই হাত দুটির নড়াচড়া। কঙ্কণনিক্কনে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে ফেলেছে। তখন কী করে কুমারী! দুগাছি রেখে বাকি কঙ্কণ খুলে নিল হাত থেকে। সে কি, এখনো একটু-একটু শব্দ হচ্ছে যে। দেয়ালের বাইরে এখনো লোকে কান খাড়া করে আছে। তখন আরো একগাছি খুলে ফেলল। মোটে একগাছি রাখল তার মণিবন্ধে। আর শব্দ নেই। সেই এককঙ্কণন্যায় একাকী থাকো! কুমারীর থেকে শেখ সঙ্গরাহিত্য।

পরের গুরু, শরনির্মাতা।

শরনির্মাতা যখন একমনে শর সরল করে তখন সম্মুখ দিয়ে ভেরীঘোষসহ রাজাও যদি চলে যায় টের পাবে না। তেমনি মনকে এক বস্তুতে, সার বস্তুতে যুক্ত করো।

তারপর, সর্প।

পরকৃত গর্তে বাস করে সাপ। একা ঘুরে বেড়ায়। সাপের থেকে শেখ অনিকেতনতা।

ঊর্ণনাভ আরেক গুরু।

কী করে মাকড়সা? নিজের হৃদয় থেকে মুখ দিয়ে সূক্ষ্ম তন্তুজাল বিস্তার করে। সেই জালের মধ্যেই বাস করে বিহার করে। আবার শেষকালে নিজেই গ্রাস করে সেই জাল। তবে এই শেখ মাকড়সা থেকে যে ঈশ্বরই সৃষ্টি করছেন স্থিতি করছেন আবার সংহারও করছেন।

আরেক গুরু, কীট।

এমন কীট আছে যে অন্য কীট কর্তৃক ধৃত হয়ে নীত হয় তার বিবরে। তখন ভয়ে-ভয়ে সে আততায়ী কীটের ধ্যান করতে-করতে তারই আকারপ্রাপ্ত হয়। তেমনি তন্ময় হয়ে ভগবানের ধ্যান করো। তাঁর সারূপ্যলাভ হয়ে যাবে।

শেষ গুরু, শ্রেষ্ঠ গুরু তোমার নিজের দেহ।

নিজের দেহ? হ্যাঁ, এর সাহায্যেই সমস্ত তত্ত্ব নিরূপণ করছ। বড় বিচিত্রচরিত্র এই গুরু। একে একটু বেশি সেবা করলেই নিয়ে যায় অধঃপাতে। একে শুধু প্রাণ-মাত্রধারণের উপযোগী ভোগ দাও, তোমাকে জ্ঞানবৈরাগ্য দেবে। আর কী দেখছ? দেখছ পরিবার বিস্তার করছে দেহ, সে পরিবারপালনের জন্যে কত ক্লেশকষ্ট, শেষে বৃক্ষের মতো দেহান্তরের বীজ সৃষ্টি করে নিজেকে নাশ করছে।

বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানছে তেমনি মনকে টানছে নানা শক্তি, নানা ইন্দ্রিয়। সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করে সমচিত্ত হও।

শুধু একজনের কাছ থেকে নয়, বহুজনের কাছ থেকে, যার কাছ থেকে যেটুকু পারো, জ্ঞানকণা কুড়িয়ে নাও।

তদ্‌গতান্তরাত্মা হও।

যাকে ঠাকুর বলেন, 'ডাইলিউট হয়ে যাও।'

নাটমন্দিরে একা-একা পাইচারি করছেন ঠাকুর। যেমন সিংহ অরণ্যে একা থাকতে ভালোবাসে তেমনি। নিঃসঙ্গানন্দ।

শশধর পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখলে, ডাইলিউট হয়ে গেছে। কেমন বিনয়ী। আর সব কথা লয়।'

যে আসল পণ্ডিত সে সব কথাই নেবে। যখন যেটুকু পায়, যেখান থেকেই পাক। কোনো গোঁড়ামি নেই, বাঁধা-ধরা নেই, এই পাত্র ধরে আছি যেখান থেকে পারো দাও আমাকে স্নিগ্ধ হবার শান্ত হবার শরণাগত হবার মন্ত্র।

কিন্তু যাই বলো, শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে? কিছু তপস্যার দরকার। কিছু সাধ্য-সাধনার।

তবে জ্ঞান হলে কী হয়? ঠাকুর বললেন শশধরকে দেখে, 'প্রথম চিহ্ন, শান্ত। দ্বিতীয় অভিমানশূন্য। দেখ না শশধরের দুই চিহ্নই আছে।'

দেরি করে এসেছে বলে ঠাকুর রসিকতা করছেন, 'আমরা সকলে বাসরশয্যা জেগে বসে আছি। বর কখন আসবে।'

ঠাকুরকে প্রণাম করে বসল শশধর।

জিগগেস করল, 'আর কি লক্ষণ জ্ঞানীর?'

'আরো লক্ষণ আছে।' বলছেন ঠাকুর। 'সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে, যেমন

লেকচার দেবার সময় সিংহতুল্য। আবার স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসিকশেখর।'
সবাই হেসে উঠল।

শশধর জিগগেস করলে, 'কিরূপ ভক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায়?'

'আমার বাপু জ্বলন্ত ভক্তি, জ্বলন্ত বিশ্বাস। ভক্তি তো তিনরকম। সাত্ত্বিক ভক্তি, সব সময়ে গোপনে রাখে নিজেকে। হয়তো মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করে কেউ টেরও পায় না। আর রাজসিক ভক্তি—লোকে দেখুক, আমি ভক্ত। ষোড়শ উপচারে পুজো করে, গরদ পরে বসে গিয়ে ঠাকুর ঘরে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মালায় মুক্তো, মধ্যে-মাঝে আবার একটি করে সোনার রুদ্রাক্ষ।'

'আর তামসিক?'

'যাকে বলে ডাকাতে ভক্তি, উৎপেতে ভক্তি।' বলতে-বলতে ঠাকুরের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগায় ভয় নেই, মুখে কেবল মারো, কাটো, লোটো। উন্মত্ত হুঙ্কার, হর হর ব্যোম ব্যোম। মনে খুব জোর। খুব বিশ্বাস। একবার নাম করেছি, আমার আবার পাপ!'

এই তমোগুণেই ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরের কাছে জোর করো। রোক করো। তিনি তো পর নন, আপনার লোক, আমার সব কিছু। তাঁর কাছে আবার ঢাকব কি, লুকোবো কি? তিনিই তো আমাকে ভক্ত করে দীপ্ত করলেন। আমার লজ্জাহরণ করলেন। তাই নির্লজ্জের মত ধরব এবার আঁকড়ে। আর ছাড়ানছোড়ান নেই।

দেখ আবার সেই তমোগুণই পরের ভালোর জন্যে প্রয়োগ করা যায়। যে বৈদ্য শুধু রোগীর নাড়ী টিপে 'ওষুধ খেয়ো হে,' বলে চলে যায়, রুগী খেল কিনা খোঁজ নেয় না, সে অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য রুগীকে ওষুধ খেতে বোঝায় অনেক করে, মিষ্টি কথায় বলে, 'ওষুধ না খেলে কেমন করে ভালো হবে, লক্ষ্মীটি খাও, এই দেখ আমি ওষুধ মেড়ে দিচ্ছি,' সে মধ্যম বৈদ্য। আর উত্তম বৈদ্য কে? রুগী কোনোমতেই খেল না দেখে সে বুকে হাঁটু দিয়ে বসে জোর করে ওষুধ খাইয়ে দেয়। কি, খাবে না কি, জোর করে জবরদস্তি করে খাইয়ে দেব। এটা হল বৈদ্যের তমোগুণ। এতে রুগীর মঙ্গল, বৈদ্যেরও সাফল্য।

'তেমনি ভক্তির তমঃ। যেন ডাকাতপড়া ভাব। তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ! আমি যেমনই ছেলে হই তুমি আমার আপন মা, তোমাকে দেখা দিতেই হবে।' বলে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গান ধরলেন ঠাকুর:

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গোব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ
সুরাপানাদি বিনাশি নারী
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক
ওমা, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

ঠাকুর গাইছেন আর তাই শুনে কাঁদছে শশধর। পাণ্ডিত্যের তুষারপিণ্ড গলে গিয়েছে। ডাইলিউট হয়ে গিয়েছে।
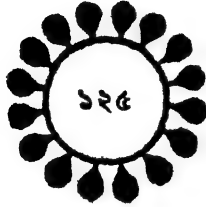
তবে এক গল্প শোনো :

এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্নে সুন্দর একটি বাগান করেছে। নানারকমের গাছ, ফুলে-ফলে ভরা। সেদিন হল কি, একটা কার গরু ঢুকে পড়েছে বাগানে। ঢুকে পড়েই, বলা-কওয়া নেই, খেতে শুরু করে দিয়েছে গাছ-গাছালি। দেখতে পেয়ে বামুন তো রেগে টং। হাতের কাছে ছিল এক আস্ত-মস্ত লাঠি, তাই দিয়ে গরুর মাথায় মারলে এক ঘা। সেই ঘা এত প্রচণ্ড হল যে গরুটা মরে গেল তক্ষুনি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বামুন। গোহত্যা করে ফেললুম। হিন্দু হয়ে? এ পাপের কি আর চারা আছে? তখন তার মনে পড়ল বেদান্তে আছে, চোখের কর্তা সূর্য, কানের কর্তা পবন, হাতের কর্তা ইন্দ্র। ঠিকই তো, বামুন লাফিয়ে উঠল, এ গোহত্যা তো আমি করিনি, ইন্দ্র করেছে। যেহেতু ইন্দ্রের শক্তিতে হাত চালিত হয়েছে এ গোহত্যার জন্যে দায়ী ইন্দ্র। মন খাঁটি করলে বামুন। ফলে গোহত্যার পাপ তার শরীরে ঢুকতে পেল না, মনের দরজায় ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়াল। মন বললে, এ পাপ আমার নয়, ইন্দ্রের। আমাকে কেন, তাকে গিয়ে ধরো। পাপ তখুনি ছুটল ইন্দ্রকে ধরতে। ব্যাপার শুনে ইন্দ্র তো অবাক। বললে, রোসো, আগে বামুনের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আসি। মানুষের রূপ ধরে ইন্দ্র তখন এল সেই বাগানে। ফুল-ফল লতাপাতা দেখে মন খুলে খুব প্রশংসা করতে লাগল। বামুনকে শুনিয়ে-শুনিয়ে। মশাই, বলতে পারেন এ বাগানখানি কার? জিগগেস করল বামুনকে। আজ্ঞে, এটি আমার করা। এ সব গাছপালা আমি পুঁতেছি। আসুন না, ভালো করে দেখুন না ঘুরে-টুরে। ইন্দ্র ঢুকল বাগানের মধ্যে। যেন কতই সব দেখছে এমনি ভাব করতে-করতে অন্যমনস্কের মত সে জায়গাটায় এসে উপস্থিত হল যেখানে সদ্যমৃত গরুটা পড়ে আছে। রাম, রাম, এ কি, এখানে গোহত্যা করলে কে! বামুন মহা ফাঁপরে পড়ল। এতক্ষণ সব আমি করেছি, সব আমার করা, বলে খুব বরফট্টাই করছিল, এখন মাথা চুলকোতে লাগল। তখন ইন্দ্র নিজরূপ ধরলে। বললে, তবে রে ভণ্ড, বাগানের যা কিছু ভালো সব তুমি করেছ আর গো-হত্যাটিই কেবল আমি করেছি! বটে? নে তোর গোহত্যার পাপ। আর যায় কোথায়,

পাপ এসে ঢুকে পড়ল ব্রাহ্মণের শরীরে। তাই বলি, যা করেন সব তিনি এই বলে নিজেকে ঠকিও না। নিজের বেলায় ভালোটি আর মন্দটি ভগবানের ঘাড়ে। ওটি চলবে না। ভালোমন্দ সব তাঁকে অর্পণ করে ভালোমন্দের ওপারে চলে যাও।
জ্ঞেয় বস্তু কি?
সুখদুঃখরহিত ঈশ্বরই জ্ঞেয়।
সুখদুঃখরহিত কোনো বস্তু আছে, থাকতে পারে?
পারে। শীত আর গ্রীষ্মের সন্ধিস্থলে কি আছে? এমন একটি অনির্বচনীয় অবস্থা, যা শীতলও নয় উষ্ণও নয়। যদি শৈত্যোষ্ণতাজ্ঞানহীন বস্তু থাকা সম্ভব, তাহলে সুখদুঃখবিহীন বস্তুর অস্তিত্বও মানতে হবে।
অমৃত সরকার ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের ছেলে। সে অবতার মানে না।
'তাতে দোষ কি?' ঠাকুর বললেন স্নেহহাস্যে। 'ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সাকার বলেও যদি বিশ্বাস করো, ঠকবে না। দুটি জিনিস শুধু দরকার, সে দুটি থাকলেই হল। সে দুটির একটি হচ্ছে বিশ্বাস, আর একটি শরণাগতি। ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছেন এ বিশ্বাস কি করা সোজা? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরতে পারে? তাই কথা হচ্ছে যে পথে যাও যদি আন্তরিক হও ঠিক-ঠিক মিলে যাবে অমৃত। মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও সমান মিষ্টি।'
আবার, সাকারবাদীদের মতে একটি-দুটি দেবতা নয়, তেত্রিশ কোটি।
হলই বা। কলকাতা শহরে হাজার-হাজার ডাকবাক্স। বড় পোস্টাপিসেই ফেল আর ছোট ঐ ডাকবাক্সেই ফেল, ঠিকানা যদি ঠিক-ঠিক লেখা থাকে, যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছুবে। একটি ডাক পাঠাও তাঁকে, তোমার পায়ে পড়ি। পাঠিয়ে একবারটি দেখ ঠিক পৌঁছয় কিনা।
'তোমার ছেলে অমৃতটি বেশ।' ডাক্তারকে বললেন ঠাকুর।
'সে তো আপনার চেলা।'
'আমার কোনো শালা চেলা নেই।' ঠাকুর হাসলেন। 'আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। আমিও ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। চাঁদা মামা সকলের মামা।'
একটি যুবক ঠাকুরকে এসে জিগগেস করলে, 'মশায়, কাম কি করে যায়? এত চেষ্টা করি তবু মাঝে-মাঝে মনে কুচিন্তা এসে পড়ে।'
'আসুক না।' ঠাকুর নিশ্চিন্তের মত বললেন। 'কেন এল তাই বসে-বসে ভাবতে যাওয়া কেন? শরীরের ধর্মে আসে, আসবে। তাই বলে মাথা ঘামাবিনে। মাথা না ঘামালেই মাথা তুলতে পারবে না কাম। তা ছাড়া তোকে বলে দি, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'
'কিন্তু মনের ও ভাবটা যাবে কি করে?'
'হরিনামে। হরিনামের বন্যায় ভেসে যাবে সব আবর্জনা।'
যোগীনেরও সেই জিজ্ঞাসা। কাম যায় কিসে? শুধু হরিনামে যাবে এ সে মানতে

রাজী নয়। কত লোকই তো হরি-হরি করছে, কারুরই তো যাওয়ার নমুনা দেখছি না। পঞ্চবটীতে এক হঠযোগী এসেছে, তার সঙ্গ করল। যদি কিছু আসন-প্রাণায়ামের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দিয়ে দমন করা যায় শত্রুকে। ঠাকুর তাকে ধরে ফেললেন। হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললেন নিজের ঘরের দিকে। 'তুমি আমার দিকে না গিয়ে এদিকে এসেছ, তাই না? তোকে, শোন্, বলি, ওদিকে যাসনি। ও সব হঠযোগ শিখলে ও করলে মন শরীরের উপরই পড়ে থাকবে সর্বক্ষণ, যাবে না ঈশ্বরের দিকে। আমি তোকে যা বলেছি সেই পথই ঠিক পথ। হরিনামের পথ। হরিনামের শব্দেই উড়ে যাবে পাপ-পাখি।'

নিজেকেই তবু বেশি বুদ্ধিমান বলে যোগীনের ধারণা। ভাবলে এসব ঠাকুরের অভিমানের কথা। পাছে তাঁকে ছেড়ে আর কারু কাছে যাই সেই ভয়েই অমনি একটা ফাঁকা উপদেশ দিয়েছেন। শেষকালে মনে কি ভাব এল, ঠাকুরের কথামতই দেখি না করে। লেগে গেল হরিনামের মহোৎসবে। ঠাকুরের কী অশেষ কৃপা, কয়েকদিনের মধ্যে ফল পেল প্রত্যক্ষ।

কিন্তু কামক্রোধ ঈশ্বর দিয়েছেন কিসের জন্যে?

'মহৎ লোক তৈরি করবেন বলে।' বললেন ঠাকুর। 'মন্দ না থাকলে ভালোর মাহাত্ম্য কি! অন্ধকার না থাকলে আলোর দাম কে দেয়! সীতা বললেন, রাম, অযোধ্যায় সব যদি সুন্দর অট্টালিকা হত তো বেশ হত। অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা আর পুরোনো। রাম বললেন, সব বাড়িই যদি সুন্দর হয়, নিখুঁত হয়, তো মিস্ত্রিরা করবে কি।'

থাক মন্দ, থাক পাপ, থাক কামক্রোধ। শুধু সংযম করো, সাবধান হও। কত রোগের থেকে সাবধান হচ্ছ, সম্ভোগের জন্যেই কত অভ্যাস করছ সংযম। এও তেমনি। আর ঈশ্বরের চেয়ে বড় সম্ভোগ আর কি আছে!

'দেখ না এই হনুমানের দিকে চেয়ে। ক্রোধ করে লঙ্কা পোড়ালো, শেষে মনে পড়ল, এই রে, অশোকবনে যে সীতা আছেন। তখন ছটফট করতে লাগল।'

তাই তো বলি রাশ টানো।

মদনকে দগ্ধ করলে শিব। মুগ্ধ করলে কৃষ্ণ। শিব মদনদহন। আর কৃষ্ণ মদনমোহন!

দাক্ষিণাত্য বেড়াবার সময় রামচন্দ্র ঠিক করলেন চাতুর্মাস্য করবেন। চাতুর্মাস্য কাটাবার জন্যে একটি পাহাড় মনোনীত করলেন। গিয়ে দেখলেন সেখানে একটি শিবমন্দির। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, মন্দিরে যাও। শিবের অনুমতি নিয়ে এস। মন্দিরে গিয়ে শিবকে লক্ষ্মণ জানাল তাদের প্রার্থনা। শিব কিছুই বললেন না, শুধু অন্যমূর্তি ধারণ করলেন। অন্যমূর্তি মানে অদ্ভুত এক নৃত্যমূর্তি। নিজ লিঙ্গ নিজের মুখে পুরে নৃত্য করছেন। লক্ষ্মণ ফিরে এল রামের কাছে। তাঁকে বললে সব আগাগোড়া। শুনে রাম উৎফুল্ল হলেন। লক্ষ্মণ বললে, বুঝলুম না কিছু। রাম বললেন, শিব অনুমতি দিয়েছেন। তিনি ঐ মূর্তির মাধ্যমে বলছেন, লিঙ্গ আর জিহ্বা সংযম করে যেখানে খুশি সেখানে থাকো। রসনা আর বাসনাকে যদি একসঙ্গে বন্দী করতে পারো তা হলেই অভয়লাভ।

চৈত্রমাসের প্রচণ্ড রোদে ঠাকুর এসেছেন বলরাম-মন্দিরে।

বললেন, 'বলেছি তিনটের সময় যাব, তাই আসছি। কিন্তু বড় ধুপ।'
ভক্তেরা হাওয়া করতে লাগল ঠাকুরকে। সেবা করবে না সুধাদ্রব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে বুঝতে পারছে না। পাখার ছন্দ ভুল হয়ে যাচ্ছে।
'ছোট-নরেন আর বাবুরামের জন্যে এলাম।' মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর: 'পূর্ণকে কেন আনলে না?'
'সভায় আসতে ভয় পায়।' বললে মাস্টার।
'ভয়?'
'হ্যাঁ, পাছে আপনি পাঁচজনের সামনে সুখ্যাত করে বসেন, সব লোকজানাজানি হয়—'
'বা, এ তো বেশ কথা।' ঠাকুর বললেন অন্যমনস্কের মত: 'কে জানে কখন কি বলে ফেলি। যদি বলে ফেলি তো আর বলব না। আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছ? ভাব-টাব হয়?'
'কই বাইরে তো কিছু দেখতে পাই না।'
'কি করে পাবে? তার আকর আলাদা। বাইরে তো তার ফুটবে না ভাব।'
'হ্যাঁ, আমিও তাকে সেদিন বলছিলুম আপনার সেই কথাটা।' মাস্টার বললে প্রফুল্ল-মুখে।
'কোন কথাটা?'
'সেই যে বলেছিলেন, সায়র দীঘিতে হাতি নামলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডোবায় নামলে তোলপাড় হয়ে যায়।'
'শুধু তাই নয়, পাড়ের উপর জল উপচে পড়ে।' ঠাকুর জুড়ে দিলেন আরেকটু। 'কিন্তু তা ছাড়া, দেখেছ? ছেলেটার আর সব লক্ষণ ভালো।'
'হ্যাঁ,' মাস্টার সায় দিল: 'চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে সমুখে।'
'চোখ শুধু উজ্জ্বল হলেই হয় না। এ অন্য জাতের চোখ। আচ্ছা,' ঠাকুর আরেকটু অন্তরঙ্গ হলেন: 'তোমায় কিছু বলেছে?'
'কি বিষয়?'
'এই এখানকার সঙ্গে দেখা হবার পর কিছু হয়েছে তার?'
'হ্যাঁ, বলেছে, ঈশ্বরচিন্তা করতে গেলে, আপনার নাম করতে গেলে, চোখ দিয়ে জল পড়ে, গায়ে রোমাঞ্চ হয়।'
'বা, তবে আর কি।' যেন মুক্ত হাওয়ার শান্তি পেলেন ঠাকুর।
কতক্ষণ পরে মাস্টার আবার বললে, 'সে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে—'
'কে? কে দাঁড়িয়ে আছে?' চমকে উঠলেন ঠাকুর।
'পূর্ণ।'
'কোথায়?'
দরজার দিকে উৎসুক হয়ে তাকালেন ঠাকুর। উঠি-উঠি করতে লাগলেন।
'এখানে নয়, হয়তো তার বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।' বললে মাস্টার।

'আমাদের কাউকে যদি যেতে দেখে রাস্তা দিয়ে অমনি ছুটে আসবে, প্রণাম করে পালাবে।'

'আহা, আহা—' ভাবে তন্ময় হলেন ঠাকুর। 'ও একটা বিরাট আধার। তা না হলে ওর জন্যে জপ করিয়ে নিলে গা?'

সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকাল। ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ গো, পূর্ণর জন্যে বীজমন্ত্র জপ করেছি।'

বিরাট আধার, কিন্তু পূর্ণর বয়েস মোটে তেরো। বিদ্যাসাগর-ইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ঠাকুরের কাছে যে আসে এবাড়ির লোক পছন্দ করে না একদম। তাই লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে এক-আধটু, মাস্টারমশায়ের ছায়ায়-ছায়ায়। সবাই সন্ত্রস্ত, কে কখন টের পায়। সকলের চেয়ে ভয় বেশি মাস্টারমশায়ের, কেননা বাড়ির লোক জানতে পেলে তাকেই দায়ী করবে সর্বাগ্রে। পূর্ণর আসা কোনো ভক্তের আসা নয় এমনি কোনো এক পথভোলা পথের ছেলের ঢুকে পড়া। সব সময়ে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা।

এতই যখন ভয় তখন ও-ছেলেকে পথ দেখানোর কি দরকার!

আমি পথ দেখাব? ও নিজেই পথের ঠিকানা নিয়ে এসেছে। কে ওকে বলেছে ঠিকানা কে বলবে!

কানের কাছে মুখ এনে ঠাকুরও বলছেন চুপি-চুপি, 'সে সব করো? যা সেদিন বলে দিয়েছিলাম—'

পূর্ণ ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, করি।

'স্বপনে কিছু দেখ? আগুন, মশালের আলো, সধবা মেয়ে, শ্মশানমশান? এ সব দেখা বড় ভালো। দেখ?'

পূর্ণ হাসল এক মুখ। বললে, 'আপনাকে দেখি।'

'তা হলেই হল।'

দেখারও দরকার নেই। শুধু টানটুকু থাকলেই হল। তুমি তো আয়-আয় করছই, আমিই শুধু যাই-যাই করছি না। তুমি যদি কারণরূপে আছ, এবার তারণরূপে এস। তোমার রূপ সর্বপ্রত্যকভূত হোক। তোমার চরণতরী আশ্রয় করতে দাও। তোমার চরণতরী আশ্রয় করে ভবাব্ধিকে যেন গোষ্পদ জ্ঞান করতে পারি।

'তোমার উন্নতি হবে।' পূর্ণকে বললেন শেষ কথা : 'আমার উপর তোমার টান তো আছে।'

কাছি দিয়ে নৌকো বাঁধা আছে ঘাটে। তুমি জোয়ারের জল হয়ে সেই কাছিতে টান দাও। আমি যেন তোমার দিকে মুখ ফেরাতে পারি। আমার হাল না থাক পাল না থাক, তবু তুমি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলো। তুমি হও আমার স্রোতের টান। সব-ভাসানো সব-ডুবানোর টান।

ঠাকুরের তখন অসুখ। পূর্ণ চিঠি লিখেছে ঠাকুরকে। কি লিখেছে পড়ো তো!

'আমার খুব আনন্দ হয়।' কে একজন পড়ে শোনাল পূর্ণর চিঠি : 'এত আনন্দ যে মাঝে-মাঝে রাত্রে ঘুম হয় না।'

'আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে।' অসুখের কষ্টকে নিমেষে উড়িয়ে দিলেন : 'আহা, দেখি দেখি চিঠিখানা।'
চিঠিখানি নিলেন হাতে করে। মুড়ে টিপে দেখতে লাগলেন। বললেন, 'অন্যের চিঠি ছুঁতে পারি না। কিন্তু এর চিঠি বেশ ভালো চিঠি। ধরতে পারি হাতের মধ্যে। ধরতে পারি বুকের উপর।'
তোমার এই আকাশব্যাপিনী জ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপিটি কবে ধরতে পারব হাতের মুঠোয়। কবে বা ধরতে পারব বুকের উপর! •
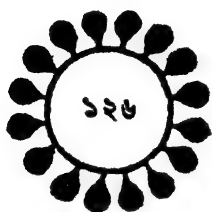
'ভক্ত্যা সর্বং ভবিষ্যতি।' ভক্তি দ্বারাই সব কিছু হবে। ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি। ভক্তি শ্রীপাদপদ্মবিষয়িনী।
স্ফটিকমণির ঘরে যে প্রদীপ জ্বলে তার প্রকাশ তীব্র। সেই প্রদীপই যদি জ্বলে আবার পদ্মরাগমণির ঘরে তার প্রকাশ মধুর। তেমনি একই নিখিলপ্রদীপে ভগবানের দুরকম প্রকাশ—তীব্র আর মধুর। তীব্র প্রকাশের নাম ঐশ্বর্য, মধুর প্রকাশের নাম মাধুর্য।
আমার এমন কোনো সাধ্য নেই, নেই আমার আধারে এত আয়তন যে তোমার ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করি। কিন্তু ভালোবাসতে কে না পারে বলো? বনের পশুপাখিও পারে।
তেমনি যদি একবার ভালোবাসতে পারি তোমাকে, দেখাতে পারি মধুর হওয়া কাকে বলে। তুমি তো মধুলুব্ধ মধুসূদন। তাই আমার মধুর হওয়ার কারণই হচ্ছে তুমি আছ। ভক্তই ভগবদস্তিত্বের প্রমাণ। তেমনি আমিও যেন তোমার পরিচয়টি বহন করি। পাত্র না পেলে তুমি তোমার কৃপা ঢালবে কি করে? আমাকে সে শূন্য-শান্ত পাত্রটি হতে দাও।
অমলা ভক্তি। নিশ্চলা ভক্তি। বিশুদ্ধা ভক্তি। বিমুক্তা ভক্তি।
স্বীয় প্রিয়ের নামকীর্তন করবে, লজ্জা কি। কণ্ঠস্বরটি গাঢ় করো, তীক্ষ্ম করো। কখনো উচ্চহাস্য, কখনো রোদন কখনো আর্তনাদ কখনো গান কখনো উন্মাদনৃত্য। জড় জীব জ্যোতিষ্ক—যা কিছু আছে স্থূলে-অস্থূলে, সমস্তই হরির শরীর বলে জেনো। অনন্যমনে প্রণাম কোরো। যে ভোজন করে তার একসঙ্গেই তুষ্টি পুষ্টি ও

ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। তেমনি যে হরিকে ভালোবাসে বা ভজনা করে সে একসঙ্গেই ভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি ও বৈরাগ্য লাভ করে।

বৈদ্যের মতো ভক্তও তিনরকম। যে সর্বভূতে সমদৃষ্টি, অর্থাৎ যে সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখে সে উত্তম ভক্ত। যার ঈশ্বরে প্রেম, জীবে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা, বিরোধীর প্রতি উপেক্ষা সে মধ্যম ভক্ত। আর, অধম বা প্রাকৃত ভক্ত কে? যে শুধু বিগ্রহে-প্রতিমায় হরির পুজা করে, হরিভক্ত বা আর কাউকে নয়, সে অধম বা প্রাকৃত ভক্ত।

সন্দেহ কি, উত্তম ভক্তই ভাগবতপ্রধান। বাসনা নয়, বাসুদেবই তার একমাত্র আশ্রয়। অবশে অভিহিত হলেও যে হরিনাম পাপহরণ করে, সেই হরির পাদপদ্ম সে প্রেম-রজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছে হৃদয়ের মধ্যে। সাধ্য নেই হরি ত্যাগ করে সেই সুধা-নিবাস।

'কলিতে নারদীয় ভক্তি।' বললেন ঠাকুর।

নারদ মানে কি? যে নার অর্থাৎ জল দেয়। জল মানে কি? জল মানে পরমার্থবিষয়ক জ্ঞান।

নারদ কী করে?

শ্বাসে-গ্রাসে হরিনাম করে।

বীণাহস্তে সুখাসীন, নারদ একদিন জিগগেস করলে ব্যাসকে, তোমাকে ক্ষুব্ধ দেখছি কেন? এমন মহাভারত রচনা করেছ, ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছ, তোমার আর কী চাই?

এত বই লিখেও তৃপ্তি হল না। ব্যাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন আমার এই অতৃপ্তি আপনিই বলুন বিচার করে।

আমি জানি। বললে নারদ, তুমি ভগবানের অমল চরিতকথা বলোনি বিশদ করে। ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিপূর্ণ না হলে প্রীতিপদ হয় না।

ভক্তিতেই তৃপ্তি। ভালোবাসাতেই গৌরব। অশ্রুতেই আনন্দ।

সুতরাং ঈশ্বরের লীলাকথা বর্ণনা করো। রসের আকার হচ্ছে রাস। বর্ণনা করো সেই রাসলীলা।

ব্যাস রচনা করল ভাগবত। পরমবেদ্যকে শুধু জানা নয়, তাকে ভালোবাসতে জানাই আসল বিদ্যা। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি।'

'হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়। কিন্তু একটা পাখি এসে বসলেই ডুবে গেল।' বলছেন ঠাকুর। 'কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। নিজে তো ভাসেই, আবার কত মানুষ গরু হাতি পর্যন্ত নিয়ে যায় সঙ্গে করে। যেমন স্টিম-বোট। আপনিও পারে যায়, আবার কত লোককে পার করে।'

ঠাকুরের কাশি হয়েছে।

মহেন্দ্র ডাক্তার বললে, 'আবার কাশি হয়েছে? তা কাশিতে যাওয়া তো ভালো।' হাসল ডাক্তার।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তাতে তো মুক্তি গো। আমি মুক্তি চাই না ভক্তি চাই।' মুক্তি হলে তো সব ফুরিয়ে গেল। সব শূন্যাকার। আমার স্পৃহা আস্বাদনে। ভাব-

গ্রহণে। ভাবের কি শেষ আছে? ভালোবাসার কি অন্ত হয়? তবে আমিই বা কেন অন্ত হব?

আমি অব্যর্থকালত্ব চাই। হে ঈশ্বর, তোমাকে ছেড়ে যেটুকু সময় যায় সেইটুকুই ব্যর্থ। এমন করো যেন সব সময়েই তোমাতে লেগে থাকি, মগ্ন থাকি, এতটুকু ক্ষণকণা যেন বিফল না হয়। আর দাও তোমার বসতিপ্রীতি। তোমার যেখানে বসতি সেখানেই আমার অনুরাগ। তোমার বাস তো শুধু তীর্থে নয়, অখিলসংসারে। অনুতে-রেণুতে। তোমার সর্বব্যাপিত্ববোধে আমার সমস্ত স্থান তীর্থান্বিত করো। বিশ্বময় প্রীতিতে বিস্তৃত হই। স্থানে আর সময়ে এক তিল পরিমাণ তোমার বিরহব্যবধান না থাকে।

'লাখজন্ম হলেই বা ভয় কি।' বললে নরেন, 'বারে-বারে আসব, ছুঁয়ে যাব ঝরা-মরাকে, ধুয়ে যাব কটি ধূলিকণা, তুলে দিয়ে যাব কটি কাঁটার ক্লেশকষ্ট।'

আমি বৃষ্টিবিন্দু হতে চাই। বললে বিবেকানন্দ। আকাশবাসী একটি ছোট্ট বারিকণা। কিন্তু আকাশেই থাকব না। ঝরে পড়ব।

ঝরে পড়ব কোথায়? জিগগেস করলে স্বামীজী।

শিকাগোতে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সেই ফরাসিনী গায়িকা। মাদাম কালভে। তাকেই এই প্রশ্ন।

নীরবে গাঢ়নম্র চোখে চেয়ে আছে মাদাম।

ঝরে পড়ব, কিন্তু সমুদ্রে নয়। সমুদ্রে পড়ে মিশে যাব সেই সমুদ্রের সঙ্গে এই কল্পনা আমার কাছে অসহ্য লাগে। কিছুতেই না, উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলতে লাগল বিবেকানন্দ, আমি মোক্ষ চাই না, নির্বাণ চাই না, বিলুপ্তি চাই না। বারে-বারে আমি আমার এই ব্যক্তিত্বের চেতনা নিয়ে বাঁচতে চাই। আমি চাই লক্ষ-লক্ষ পুনর্জন্ম।

ঠাকুরের অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি।

জানো না বুঝি? একদিন এক সমুদ্রে ছোট্ট একটি বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়ল। মাদাম কালভের দিকে চেয়ে বলল আবার স্বামীজী। সমুদ্রে পড়েই কাঁদতে লাগল বৃষ্টিবিন্দু।

কাঁদতে লাগল? কেন? তন্ময়ের মতো জিগগেস করলে মাদাম।

ভয়ে। দুঃখে। মিশে যাবে মিলিয়ে যাবে এই বেদনায়। সমুদ্র বললে, ভয় কি, দুঃখ কি, কত শত বৃষ্টিবিন্দু, কত শত তোমার ভাইবোন এমনি করে পড়েছে আমার মধ্যে। জল হয়ে মিশে গিয়েছে জলাশয়ে। তোমাদের এই বিন্দু-বিন্দু জলবিম্ব দিয়েই তো আমি তৈরি। বিন্দু ছাড়া কি সিন্ধু আছে?

তবু কাঁদতে লাগল বৃষ্টিবিন্দু। আমি লুপ্ত হতে চাই না, আমি লিপ্ত হতে চাই। সমুদ্র বললে, বেশ, তবে সূর্যকে বলো তোমাকে মেঘলোকে নিয়ে যাক। আকাশ থেকে ঝরে পড়ো আরেকবার।

খুশির রঙে টলমল করে উঠল সেই বৃষ্টিবিন্দু। চলে গেল মেঘলোকে। আবার ঝরে পড়ল। এবার জলে পড়ল না, মাটিতে পড়ল। তৃষ্ণার্ত, মলিন মাটিতে। মুছে দিল এক কণা ধূলি। মুছে দিল এক কণা পিপাসা।

মাদাম কালভের দুই চোখে মন্ত্রের সম্মোহন। মন্ত্রের সঞ্জীবনী।

হ্যাঁ, বারে-বারে জন্মাব। শঙ্খনাদ-উদার কণ্ঠে বললে বিবেকানন্দ, যতবার যেটুকু পারি কাঁটা তুলে দিয়ে যাব পৃথিবীর। যেটুকু পারি দেয়াল ভেঙে ফেলব ব্যবধানের। যেটুকু পারি পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাব সর্বসুখদাতা ঈশ্বরের দিকে। আমি চাই না আমার এই ব্যক্তিত্বের বিনাশ, এই আত্মচেতনার বিলুপ্তি। আমিই সেই মহান অজানা। সেই অখিল-অলৌকিক। বারে বারে এই লোকসংসারে ফিরে-ফিরে এসে জানাব নিজেকে, এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে, বৃহত্তর অধ্যায়ে,—দুই চোখ জ্বলে উঠল স্বামীজীর।

ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে নরেন, আর পড়বি না?'

নরেন বললে, 'একটা ওষুধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়াটড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।'

শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে? আর কতই বা পড়বে জিগগেস করি? হাটের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে একটা হো-হো শব্দ শোনা যায়, হাটের মধ্যে ঢুকলে তখন অন্যরকম। তখন সব দেখছ-শুনছ কোথায় কি বেপারবেসাতি, কোথায় কি দরদাম! সমুদ্রও দূরে থেকে হো-হো শব্দ করছে। কী হবে শুধু শব্দ শুনে? কাছে এগোও, দেখবে কত জাহাজ কত পাখি কত ঢেউ। তারপরে স্নান করে তার স্বাদ নাও। সার কথা, হাটের মধ্যে প্রবেশ করা, অবগাহন করা সমুদ্রে।

গুরুর জন্যে শাস্ত্রপাঠ? পথনির্দেশের জন্যে? গুরু না থাকে, না জোটে, শুধু ব্যাকুল হয়ে কাঁদো, কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা করো। তিনিই দেবেন সব বলে-কয়ে, জানিয়ে-বুঝিয়ে।

সমুৎকণ্ঠায় কণ্টকিত হও। আসন জমিয়ে বসলাম তোমার এই দুয়ারে। প্রস্তুত হয়ে এসেছি, মরবার জন্যে প্রস্তুত। যাকে ইচ্ছে সরিয়ে দাও তুলে নাও, আমাকে পারবে না হটাতে। কিছু একটা করে তবে উঠব। হয় ধরে নয় মরে। হয় তোমার ঘরে মিলন নয় তোমার দুয়ারে মৃত্যু। ঘর-দুয়ার এক করে ছাড়ব।

'নরেন বেশি আসে না।' ঠাকুর আক্ষেপ করছেন। নিজেই আবার প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। 'তা ভালোই করে। ও বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।'

কাউকে কেয়ার করে না নরেন। এইটেই যেন কত বড় তার গুণের কথা। 'বলব কি, আমাকেই কেয়ার করে না।' স্নেহদ্রবস্বরে বলছেন ঠাকুর, 'সেদিন কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল আমার সঙ্গে। ভালো জায়গায় তাকে কত বসতে বলল কাপ্তেন। তা সে চেয়েও দেখল না। সেদিন হাজরার সঙ্গে কত-কি কথা কইছে। জিগগেস করলুম, কি গো, কি সব কথা হচ্ছে তোমাদের? উড়িয়ে দিল আমাকে, বললে, লম্বা-লম্বা কথা। দেখেছ তো কত বিদ্বান আমার নরেন, তবু আমার কাছে কিছু প্রকাশ করে না, পাছে লোকের কাছে বলে বেড়াই। মায়ামোহ নেই, বন্ধনপীড়ন নেই, একেবারে খাপখোলা তরোয়াল।'

প্রথমে ধূমায়িত পরে জ্বলিত, পরে দীপ্ত, পরে উদ্দীপ্ত এই অগ্নি।

সন্ধ্যের পর ঠাকুরের কলকাতা যাবার কথা। পাইচারি করছেন এদিক-ওদিক আর মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, 'তাই তো হে কার গাড়িতে যাই—'

এমন সময় নরেন এসে উপস্থিত। এসেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে।
'এসেছ? তুমি এসেছ?' যেন গুমোট করে ছিল চারদিক এক ঝলক বসন্তবাতাস ছুটে এল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে তেমনি ভাবে নরেনের মুখে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন। ভাবখানা এই, আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবি? কতদিন থাকবি তোর ও-সব জ্ঞানতর্কের পাথরের দেশে? আমি তোকে গলিয়ে দেব, ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, আদর করে-করে, তোর চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে। জ্ঞান-তর্কে পারব না তোর সঙ্গে, কিন্তু তোকে ভালোবাসায় জিতে নেব। আমি যদি তোকে ভালোবাসি তবে সাধ্য কি তুই আমাকে ফেলে যাস, আমাকে ছেড়ে থাকিস?
মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর। হাসিহাসি মুখে বললেন, 'কি হে, আর যাওয়া যায়?'
আনন্দভরা চোখে মাস্টারও হাসতে লাগল।
'জানো, লোক দিয়ে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ও এসেছে। বলো, আর কি যাওয়া যায়?'
'যে আজ্ঞে। আজ তবে থাক।'
ঠাকুরও যেন পরম স্বস্তি পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কাল যাব। গাড়ি না হয় নৌকোয় যাব। কি বলো? আজ নরেন এসেছে। লোক পাঠিয়েছিলুমই বা। ওর কী দায় ছিল আসতে? তবু ও এসেছে। আজ আর যাওয়া যায় না।' আর-সব ভক্তবৃন্দ যারা সমবেত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা আজ এস। অনেক রাত হল।'
একে-একে প্রণাম করে বিদায় হল ভক্তেরা। নরেনের বেলায় না-রাত না-দিন।
হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। শুধু একবেলার ক্ষণিক মিলন নয়, চাই চিরজীবনধনের সঙ্গে চিরজীবনক্ষণের মিলন।
আমি একতাল সোনা আমাকে তুমি আগুনে পুড়িয়ে গলিয়ে নাও। কি, বিশ্বাস হয় না? জ্বালো তোমার আগুন, আজই হাতে-হাতে নাও পরখ করে। তোমার যেমন খুশি সকল নাচে নাচিয়ে নাও আমাকে, বাজিয়ে নাও সকল রাগিণীতে। সব ছেঁকে নাও, বেছে নাও, পিষে নাও। তোমার যা পছন্দ তাতেই আমি রাজী। তুমি যাতে নিশ্চিত তাতেই আমি নিশ্চিন্ত। তাই যদি হয় তবে আমার সুখও বাহবা দুঃখও বাহবা।
রাম দত্তর সঙ্গে তর্ক করছে নরেন। তুমুল তর্ক।
মাস্টার এক পাশে বসে। ঠাকুরও দেখছেন চুপ করে। শেষকালে বললেন মাস্টারকে লক্ষ্য করে, 'আমার এসব বিচার ভালো লাগে না।' ধমক দিলেন রামকে। 'থামো।'
না থামো তো, আস্তে-আস্তে। কে কার কথা শোনে। রাম থামলেও নরেন থামবে না। কিন্তু তাকে কে ধমক দেবে?
অসহায়ের মত তাকালেন আবার মাস্টারের দিকে। বললেন, 'আমি এসব বাকবিতণ্ডা জানিও না, বুঝিও না। আমি অবোধ ছেলের মত শুধু কাঁদতুম আর বলতুম, মা, এ বলছে এই, ও বলছে ঐ। কোনটা সত্য তুই আমাকে বুঝিয়ে দে।'

এই আত্মনিবেদন। এই ভক্তি পরমপ্রেমরূপা। ভালোবাসার করস্পর্শে লৌহদুর্গের দ্বার খোলা।
কিছু জানি না কিছু বুঝি না। তবু তোমাকে ভালোবাসি।
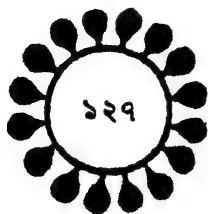
যদি আর কিছু না পারো সারা দিনমানে একবার, শুধু একবার আমাকে মনে কোরো।
নবগোপাল ঘোষ প্রথম দিন তো একেবারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসেছিল। তারপর সেই যে ডুব মারল, তিন-তিন বছর আর দেখা নেই।
'হ্যাঁ রে, কি হল বল দেখি নবগোপালের? তাকে একটু খবর দে।' তিন-তিন বছর পর একদিন খোঁজ করলেন ঠাকুর।
খবর গেল নবগোপালের কাছে। সে তো প্রায় আকাশ থেকে পড়ল। সেই কবে একবার গিয়েছিলাম তিন বছর আগে, সেই কথা আজও পর্যন্ত মনে করে রেখেছেন! ভুলে যাননি! দিনে-রাত্রে কত লোক আসছে তাঁর কাছে, তার মধ্যে কে-না-কে নবগোপাল ঘোষ, তাকেও হারিয়ে যেতে দেননি। স্মৃতির কৌটোর এক পাশে কুড়িয়ে রেখেছেন। কিছুই তিনি হারান না। ফেলে দেন না ভোলেন না এতটুকু। আমরাই ভুলি। ফিরে যাই। পথ হারিয়ে পথ খুঁজি।
সময় হলে তিনিই আবার পথ দেখান। ডাক দেন।
নবগোপাল পড়ল আবার পায়ে এসে। তুমি ভোলো না। চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্র-লিপিতে প্রতি রাত্রে তুমি লিখে পাঠাও, আমি ভুলিনি। বিনম্রকোমল শ্যামলশীতল তৃণদলেও সেই ভাষাই লিখে রেখেছ, ভুলিনি তোমাকে। বললে, 'আমার সাধনভজন কি করে কী হবে?'
'তোমাকে কিছু করতে হবে না।' বললেন ঠাকুর, 'মাঝে-মাঝে শুধু দক্ষিণেশ্বরে এসো।'
শুধু এইটুকু?
এই বা কি কম কঠিন? দেখ না, কত বাধা এসে পড়বে যাবার মুখে। মন ঠিক করতেই এক যুগ। তারপর মন যদি ঠিক হল তো শরীর বললে ঠিক নেই। মন-শরীর দুই-ই ঠিক, হঠাৎ দেখা দিল সর্বসংকল্পনাশন অকাজের তাড়না। হাতের কাছে দক্ষিণেশ্বর,

সেই হাত খুঁজতেই রাত ফুরোয়।
একদিন ভাবসমাধি হয়েছে ঠাকুরের, নবগোপাল এসে হাজির। রাম দত্ত ছিল, নবগোপালকে বললে, 'এইবেলা ঠাকুরের কাছ থেকে কিছু বর চেয়ে নিন।'
নবগোপাল সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ের কাছে। বললে, 'বিষয়চিন্তায় ডুবে আছি। কি করে যাবে এই বিষজ্বালা আমাকে বলে দিন।'
'কোনো চিন্তা নেই।' আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। 'যদি আর কিছু না পারো সারা দিনমানে একবার, শুধু একবার আমাকে স্মরণ কোরো।'
শুধু এইটুকু?
হ্যাঁ, এইটুকু। অঙ্কুরটি ছোট, কিন্তু ওর মধ্যে অব্যক্ত আছে বনস্পতির আয়তন। বেশ তো, দেখ না, সারা দিনে-রাত্রে শুধু একবার আমাকে স্মরণ করে দেখ না কি হয়! একবার স্মরণ করলেই কতবার সাধ যায় স্মরণ করতে। স্মরণ করতে-করতেই অনন্যশরণ।
একদিকে তুমি কত সহজ, আমার দুর্বল দুই বাহুর বন্ধনে বন্দী, আবার আরেকদিকে তুমি অপরিসীম, সমস্ত আয়ত্তের অতীত, সমস্ত বন্ধন-ক্রন্দনের বাইরে। একদিকে তুমি কঠোর কাজের মানুষ, আরেকদিকে তুমি অকাজের রাজা। বৃত্তিরূপে থেকে আবার নিবৃত্তিরূপে বিরাজিত। একবার দেখি অমোঘ নিয়মে বেঁধে রেখেছ আমাকে, আবার দেখি তোমার অশাসনের অঙ্গনে বাজিয়ে দিয়েছ আমার ছুটির ঘণ্টা। একদিকে তুমি সুদুর্গম সুগম্ভীর, আবার, কি আশ্চর্য, তুমি একেবারে হিসাবকিতাবছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত ভোলানাথ।
সেইখানেই তো আমার ভরসা। আমি কি পারব তোমাকে গৌরীশঙ্করের চূড়ায় গিয়ে ধরতে? আমি ধরব তোমাকে বিধি-বাধা-না-মানা ঝড়ের ঘূর্ণবেগে। আর সকলের কাছে তুমি দস্তুরসঙ্গত, আমার কাছে তুমি খাপছাড়া, অগোছালো। আমার যে ভালোবাসার বেসাতি। অনাবশ্যকের ঐশ্বর্য।
নবাই চৈতন্যরও সেই কথা।
পানিহাটির উৎসবে এসেছেন ঠাকুর। নৌকোয় উঠেছেন ফিরে যাবার মুখে, ছুটতে-ছুটতে নবাই এসে হাজির। বাড়ি কোন্নগর, মনোমোহনের খুড়ো। শুনেছে ঠাকুর এসেছেন উৎসবে, তাই দেখতে এসেছে। এতক্ষণ খুঁজেছে ভিড়ের মধ্যে, দলের মধ্যে সেই শতদল কোথায়, ভিড়ের মধ্যে কোথায় সেই অপরূপ! এত দেরি করে এলে কেন? ঐ যে তিনি নৌকোয় উঠছেন। সত্যি? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল নবাই। ছেড়ো না, ছেড়ো না নৌকো। আর কি ছাড়ে! যে মুহূর্তে দেখতে পেলেন ব্যথিতের ব্যাকুলতা, পারায়ণ-পরায়ণ স্তব্ধ হলেন।
পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল নবাই। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।
একেই বলে দেখা আর প্রেমে পড়া। কিম্বা প্রেমে পড়ে দেখা। খুঁজেছে, ছুটেছে, লুটিয়ে পড়েছে। প্রশ্ন করেনি, তর্ক করেনি, বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে জাগতে দেয়নি দ্বিধার কুশাঙ্কুর। শুধু বিশ্বাস নয়, উন্মত্ত ব্যাকুলতা। একেবারে সর্বসমর্পণ।
ঠাকুর তাকে স্পর্শ করলেন।

পাগলের মত নাচতে লাগল নবাই। নাচে, নাচে, আবার থেকে-থেকে প্রণাম করে ঠাকুরকে।

আরেক রকম স্পর্শে তাকে ফের প্রকৃতিস্থ করলেন ঠাকুর। সবাই ভাবলে শান্ত হয়ে গেল বুঝি নবাই। দেখল ছেলের উপর সংসারের ভার দিয়ে নবাই গঙ্গাতীরে কুটির বেঁধে বাস করতে লাগল নির্জনে। সঙ্গের সাথী তিনজন। ধ্যান কীর্তন আর উপাসনা।

'ধ্যান চক্ষু বুজেও হয়, চক্ষু চেয়েও হয়।' বললেন ঠাকুর। 'ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে তার লক্ষণ আছে। মাথায় পাখি বসবে জড় মনে করে। আমি দীপশিখা নিয়ে আরোপ করতুম। শিখার যেটা লালচে রঙ সেটাকে বলতুম স্থূল, আর শাদা অংশটাকে বলতুম সূক্ষ্ম। মধ্যখানে একটা কালো খড়কের মত রেখা আছে। সেটাকে বলতুম কারণশরীর।'

গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন আর বহির্মুখ থাকে না, যেন বার-বাড়িতে কপাট পড়ল। দয়ানন্দ বললে, অন্দরে এসো কপাট বন্ধ করে। অন্দর-বাড়িতে কি যে-সে আসতে পারে?

'ধ্যান হবে তৈলধারার মত।' বললেন আবার ঠাকুর। 'ভিতরে আর ফাঁক নেই। অনর্গল প্রবাহ। তেমনি মনেরও অনর্গল মগ্নতা। একটা ইটকে বা পাথরকেও যদি ঈশ্বর বলে ভক্তিভাবে পুজো করো, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বরদর্শন হবে।'

আর কীর্তন?

কীর্তন হবে হিল্লোল-কল্লোল। ক্রন্দনের সঙ্গে নর্তন মিশলেই কীর্তনের জন্ম। নরোত্তম কীর্তনীয়াকে বললেন ঠাকুর, 'তোমাদের যেন ডোঙ্গা-ঠেলা গান। এমন গান হবে যে নাচবে সকলে।' বলেই গান ধরলেন নিজে : 'নদে টলমল টলমল করে। গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে। তারপর এবার আখর দাও, আর নাচো—'

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে॥
যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে।
যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে॥

নবাই এসেছে। এসেই উচ্চতালে কীর্তন শুরু করে দিল। বইয়ে দিল সুরের গঙ্গা। আসন ছেড়ে উঠে ঠাকুর নাচতে লাগলেন। কাছে ছিল মহিমাচরণ, জ্ঞানপথে যার চর্চা-চিন্তা, সেও মেতে উঠল নৃত্যে।

গাইতে-গাইতে বড় টলছেন ঠাকুর। নিরঞ্জন ভাবলে, পড়ে যাবেন বুঝি। হাত বাড়িয়ে

ধরতে গেল। মৃদুস্বরে ধমকে উঠলেন : 'এই। শালা ছুঁসনে।' মাস্টার ছিল সামনে। তার হাত ধরে টান মারলেন। 'এই, শালা, নাচ।'
একেই বলে উর্জিতা ভক্তি। ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। ভক্তি যেন উথলে পড়ছে। রাম বললেন লক্ষ্মণকে, ভাই যেখানে দেখবে উর্জিতা ভক্তি, সেইখানে জানবে আমি আছি।
'হরিনামে কেমন আনন্দ দেখলে?' সবাইকে উদ্দেশ করে জিগগেস করলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমার আরো বেশি আনন্দ। কেন বলো তো? মহিমাচরণ আসছে এদিকে, জ্ঞান পেরিয়ে ভক্তির দিকে। জ্ঞান হচ্ছে একটানা স্রোত আর ভক্তি হচ্ছে জোয়ার-ভাঁটা। আর দেখ না জ্ঞানীর মুখ-চেহারা শুকনো আর ভক্তের মুখ-চেহারা স্নিগ্ধ।'
তারপর তৃতীয় সাথী প্রার্থনা।
কী প্রার্থনা করবে? শুধু বলবে, ঈশ্বর, যেন ভোগাসক্তি যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়। কাতর হয়ে প্রার্থনা করলেই চোখে জল আসবে। ঈশ্বর তৃষ্ণার্ত। চোখের জল না পেলে তাঁর পিপাসা নিবারণ হয় না। চাতক যেমন বৃষ্টির জলের জন্যে চেয়ে থাকে ঈশ্বরও তেমনি চোখের জলের জন্যে চেয়ে আছেন। শিশির না ঝরলে ফুলটি ফোটে না, আর ফুলটি না ফুটলে উড়ে আসে না মধুকর। তেমনি অশ্রু না ঝরলে ফোটে না হৃদকমল, আর হৃদকমল না ফুটলে ছুটে আসেন না ভগবান। তাই কাঁদবার জন্যেই প্রার্থনা।
না কাঁদলে ধুয়ে যাবে না আসক্তির ধুলোবালি। বাইরে শুকনো জ্ঞানের কথা, অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভোগতৃষ্ণা—কিছু হবে না। হাতির যেমন বাইরের দাঁত আছে তেমনি আবার ভিতরের দাঁত। বাইরের দাঁতে শোভা, ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি বাইরে লেকচার উপাসনা ভক্তির আড়ম্বর, ভিতরে কামকাঞ্চনে স্পৃহা। লুকিয়ে-লুকিয়ে লেহনচর্বণ। সমস্তই অনর্থক। যত জলই ঢালো গাছ অফলা।
তাই কেঁদে-কেঁদে মা'র কাছে শুধু এই প্রার্থনা :
মা, তোর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দে। আর যা কিছু চাইছি, কী যে সত্যি চাইবার তা না জেনেই চাইছি। সন্তান যদি একবার মাকে পায় সে কি আর রঙিন খেলনার জন্যে কাঁদে?
প্রথমে অভ্যাস পরে অনুরাগ। ঠাকুর বললেন, 'প্রথমে বানান করে লেখ, তারপর টেনে যাও।'
অন্তরের টানেই তখন টেনে যাবে। এই অভ্যাসটি কেন? যাতে শরীর যাবার সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়ে। নাম শুধু মুখে বললেই হবে না, মনে ধরতে হবে। মনে-মনে এক হতে হবে। শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। তাই ভোগাসক্ত মনে ফুটবে না নামমূর্তি। কাঁচের পিঠে কালি মাখিয়ে ছবি ধরো। তেমনি মনে মাখাও ভক্তি আর বৈরাগ্যের রঙ, ফুটে উঠবে নামের প্রতিচ্ছায়া।
হেম ঠাকুরকে কীর্তন শোনাবে বলেছিল। তা আর হল না। শেষে বললে, 'আমি খোল-করতাল নিলে লোকে কি বলবে!' ভয় পেয়ে গেল পাছে লোকে পাগল বলে। আর, এই যে সুখের আশায় ছন্নছাড়ার মত উদ্দাম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এতে সবাই

তাকে সুস্থমস্তিষ্ক বলছে। আর যা অক্ষয় আনন্দের আকর তার জন্যে ক্রন্দন-কীর্তনই পাগলামি!

কোথা থেকে কি ছদ্মবেশে যে আসক্তি আসে তার ঠিক নেই।

হরিপদকে চেনো তো?

সে ঘোষপাড়ার এক মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছে। বলে, তার নাকি গোপাল ভাব। কোলে বসিয়ে খাওয়ায়। বলে, বাৎসল্য ভাব। ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'ঐ বাৎসল্য থেকেই তাচ্ছল্য।'

সাবধান করে দিলেন হরিপদকে। ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ভাবে, বোধহয় 'রাগকৃষ্ণ' হয়েছে।

জানো না বুঝি? ঐ মেয়েছেলেটি যে পথের পন্থী তাদের মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে 'রাগকৃষ্ণ'। গুরু জিগগেস করে, রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস। উত্তর চাই, হ্যাঁ, পেয়েছি।

তাই ধরেছে হরিপদকে। এমন সুন্দর ছেলেটা না মেছমার হয়ে যায়।

সুন্দর কথকতা জানে। সব না মাটি হয়। গলার এমন মিঠে সুর, তা না উড়ে পালায়।

সেদিন তার চোখ দুটি লক্ষ্য করলেন ঠাকুর। যেন চড়ে রয়েছে। বললেন, 'হ্যাঁ রে, তুই খুব ধ্যান করিস?'

মাথা হেঁট করে রইল হরিপদ।

'শোন, অত নয়।'

পদসেবার ভার দিয়েছেন হরিপদকে। হাত-ভরা কোমল ভক্তি, স্নেহসিক্ত পবিত্রতা। হায়, আসক্তির ছোঁয়া লেগে হাত দুটি না তার শূন্য-শুষ্ক হয়ে যায়।

মনে শান্তি পাচ্ছেন না ঠাকুর। সে মেয়েছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন মিনতি করে, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন করছ করো কিন্তু, দেখো, অন্যায় ভাব যেন এনো না।'

হরিপদর যম-দুয়ারে কাঁটা দিয়ে দিলেন।

'আচ্ছা, এই যে ছেলেরা সব আসছে এখানে, বাধা-বারণ মানছে না, এর মানে কি?' ঠাকুর বলছেন আত্মভোলার মত : 'এই খোলটার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে, নইলে টান হয় কি করে? কেন আকর্ষণ হয়? বলা নেই কওয়া নেই দলে-দলে লোক অমনি এলেই হল? কোনো মানে নেই ওর?'

সকলেই তো আসবে। তোমার ওখানেই যে সকলের সকল পথ সমাপ্ত হয়েছে। তুমি যে সর্বসমন্বয়ের সমুদ্র।

'কেন একঘেয়ে হব? কেন হব একরোখা?' বলছেন ঠাকুর উদার সারল্যে : 'অমুক মতের লোক তা হলে আসবে না, এ ভাবনা আমার নয়। কেউ আসুক আর নাই আসুক, আমার বয়ে গেছে। লোকে কিসে হাতে থাকবে, কিসে দল বাড়বে এ সব আমার মনে নেই। অধর সেন বড় কাজের জন্যে বলতে বলেছিল মাকে, তা ওর সে কাজ হল না। তাতে যদি ও কিছু মনে করে আমার বয়ে গেল।'
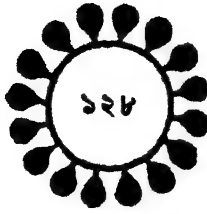
চিৎপুর রোড দিয়ে গড়ের মাঠের দিকে চলেছেন ঠাকুর। চলেছেন গাড়ি করে। উইলসনের সার্কাস দেখতে। সঙ্গে রাখাল, মাস্টারমশাই, আরো দু-একজন। এক-জনের হাতে ঠাকুরের বটুয়া। তাতে মশলা, কাবাবচিনি। ঠাকুরের গায়ে সবুজ বনাত। কার্তিকে নতুন শীত পড়েছে।

একবার এধার একবার ওধার ঘন-ঘন মুখ বাড়াচ্ছেন গাড়ি থেকে। লোক দেখছেন। আপনমনে কথা কইছেন তাদের সঙ্গে। মাস্টারকে বলছেন, 'দেখছ সবার কেমন নিম্নদৃষ্টি। সব পেটের জন্যে চলেছে। কারুর ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নেই।'

মাঠে তাঁবু পড়েছে সার্কাসের। গ্যালারির টিকিট আট আনা। তাই কেনা হল ঠাকুরের জন্যে। শুধু ঠাকুরের জন্যে কেন, সকলের জন্যে। সব চেয়ে উঁচু ধাপে গিয়ে সবাই বসল। ঠাকুরের মহাস্ফূর্তি। বালকের মত আনন্দ করে বললেন, 'বাঃ, এখান থেকে তো বেশ দেখা যায়।'

সার্কাসের মেয়ে ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছুটছে। বড়-বড় লোহার রিঙ-এর মধ্যে দিয়ে ছুটছে ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে উঠে আবার ঘোড়ার পিঠে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এক পায়ে, মাঝখানে ডিঙিয়ে গিয়েছে সেই লোহার রিঙ। খুব কায়দার কসরত। বিস্ময়-আয়ত চোখে তাই দেখছেন ঠাকুর।

সার্কাসের শেষে বলছেন মাস্টারকে, 'দেখলে বিবি কেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার উপর, আর ঘোড়া কেমন ছুটছে বনবন করে। ভাবো দিকিন, কত অভ্যেস করেছে তবে না হয়েছে। কত মনোযোগ, কত একাগ্রতা! একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙে যাবে, হয়তো বা অবধারিত মৃত্যু। অভ্যাসযোগে সব এখন জল-ভাত। সংসার করাও এমনি কঠিন। অনেক সাধন-ভজন করেই তবে না ঈশ্বরকৃপা! সাধন আর ভজন, অভ্যাস আর অনুরাগ।'

অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যুর সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে। সেই অভ্যাস করে যাও। মৃত্যুর সময়ের জন্যে প্রস্তুত রাখো নিজেকে।

'সাধনের সময়,' ঠাকুর বললেন, 'এই সংসার ধোঁকার টাটি। কিন্তু জ্ঞানলাভ হবার পর তাঁকে দর্শনের পর এই সংসারই আবার মজার কুটি।'

শুধু অভ্যাস। মন যায় না তবু কষ্টকাঠিন্য করে একটু বোসো। এইটুকুই সাধন। প্রথমে তেতো লাগে, এই তেতোটুকুই খাও। খেতে-খেতেই মধু, খেতে-খেতেই নেশা। ছেলের পড়ায় মন নেই, বাপ-মা জোর করে বসাচ্ছে তাকে বইয়ের সামনে। এই

জোরটুকুই কৃচ্ছ্র। পড়তে-পড়তে ছেলের কখন অনুরাগ এসে গিয়েছে, তখন বই আর নামায় না মুখ থেকে। বাপ-মা বারণ করলেও না। অভ্যাস করাই এই অনুরাগের নাগাল পাবার জন্যে। মরা জল ঠেলে-ঠেলে স্রোতের জলে চলে আসার জন্যে। ঘষো তোমার শুকনো কাঠ। মরা কাঠেই জ্বলবে একদিন আগুনের অনুরাগ। চেঁচিয়ে গলা সাধো, একদিন হঠাৎ এসে যাবে সুররাগের ঢেউ। রুদ্ধ দরজার পাশে বসে ডাক-নামটি ধরে ডাকো একমনে। কখন দরজা খুলে গিয়ে জেগে উঠবে ভালোবাসার প্রতিধ্বনি।

হাতে দাঁড় পড়েছে, দাঁড় টেনে যাও, ঝাঁ করে কখন পাড়ি জমে যাবে টেরও পাবে না।

দুপুরবেলা ইস্কুল পালিয়ে চলে এসেছে মাস্টার। শুনেছে বলরামমন্দিরে এসেছেন ঠাকুর, আর কে রোখে! শুধু ছাত্রই ইস্কুল পালায় না, মাস্টারও ইস্কুল পালায়।

'কি গো, তুমি? এখন? ইস্কুল নেই?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

কে একজন ভক্ত ছিল সামনে, বলে উঠল, 'না মশাই, উনি ইস্কুল পালিয়ে এসেছেন।'

সবাই হেসে উঠল। কিন্তু মাস্টার জানে কে যেন তাকে টেনে আনলে! এমন টান যার ব্যাখ্যা হয় না। পায়ে কুশকণ্টকের বোধ নেই, পথ মনে হয় একটানা বাঁশি।

মাস্টারকে সেবা শেখাতে লাগলেন ঠাকুর। আমার গামছাটা নিংড়ে দাও তো। জামাটা শুকোতে দাও। পা-টা কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারো?

সাহ্লাদে সেবা করছে মাস্টার।

সমুদ্রের দিকে চলেছে নদী। নদীতে উচ্ছ্বাস উঠেছে। নদী ভাবছে এ উচ্ছ্বাস কার, আমার না, সমুদ্রের? ওগো সমুদ্র, বলে দাও, এ আবেগ-আবর্ত কার? আমার, না, তোমার? কিন্তু এ জিজ্ঞাসা কতক্ষণ? যতক্ষণ না ঐকান্তিক সমর্পণ হচ্ছে সমুদ্রে। সমুদ্রে একবার মিশে গেলে, পূর্ণ সমর্পণ হয়ে গেলে, তখন কি আর থাকবে এ জিজ্ঞাসা? তখন কি আর থাকবে আমি-তুমি?

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আমরা সব হলহল করে কথা কই। কিন্তু মাস্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে কে জানে।'

ঠাকুর বললেন, 'ইনি গম্ভীরাত্মা।'

তাই বলে একটা গান গাইবে না? সবাই গাইছে, ও কেন মুখ বুজে থাকবে?

ঠাকুরের কাছে নালিশ করল গিরিশ। 'কিছুতেই গাইছে না মাস্টার।'

ঠাকুর বললেন, 'ও স্কুলে দাঁত বার করবে। যত লজ্জা গান গাইতে!' মাস্টারের দিকে তাকালেন। 'ঈশ্বরের নামগুণকীর্তনে লজ্জা করতে নেই। নামগুণকীর্তন অভ্যাস করতে-করতেই ভক্তি আসে।'

ভক্তিতেই সর্বসিদ্ধি। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান।

'তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ওদেশে ধান মাপে, পেছনে বসে রাশ ঠেলে দেয় আরেকজন। দয়ায় মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। আর দয়া আকর্ষণ করবে কি করে? শুধু ভক্তিতে, ভালোবাসায়। ভালোবাসাতে কান্না আর কান্নাতেই দয়া।'

আমার কী ছিল? কান্না ছাড়া আর ছিল না কিছু পুঁজিপাটা। কেঁদে-কেঁদে বলতুম তাই মাকে, বেদ-বেদান্তে কি আছে জানিয়ে দাও, কি আছে বা পুরাণ-তন্ত্রে। সব

জানিয়ে দিলেন দেখিয়ে দিলেন। শিবশক্তি, নৃমুণ্ডস্তূপ, গুরুকর্ণধার, সচ্চিদানন্দ-সাগর।

'একদিন দেখলুম কি জানো? চতুর্দিকে শিবশক্তি। মানুষ পশুপাখি তরুলতা সকলের মধ্যেই এই পুরুষ আর প্রকৃতি। আরেকদিন দেখলুম নরমুণ্ডের পাহাড়। আমি তার মধ্যে একলা বসে। সেদিন দেখলুম মহাসমুদ্র। নুনের পুতুল হয়ে সমুদ্র মাপতে চলেছি। গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম। কোত্থেকে একটা জাহাজ চলে এল। তাতে উঠে পড়লুম। দেখলুম। গুরুকর্ণধার। তারপরে আবার দেখলুম ছোট্ট একটি মাছ হয়ে খেলা করছি সাগরে। সচ্চিদানন্দসাগরে প্রফুল্ল মৎস্য। কি হবে বুদ্ধিবিচারে? কি বুঝবে তুমি তিনি না বোঝালে? এইটিই সকল বোঝার সার করো, যে, তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখনই সব বোঝা যায়। তার আগে নয়।'

মাস্টারকে দিয়ে গান গাইয়ে ছাড়লেন ঠাকুর। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি পাঠিয়েছেন তাকে পুজো দেবার জন্যে। ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী। স্নান করে খালি পায়ে গিয়েছে মন্দিরে আবার খালি পায়ে ফিরে এসেছে প্রসাদ নিয়ে। ডাব চিনি আর সন্দেশ। ঠাকুর তখন শ্যামপুকুরে। দক্ষিণের ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন মাস্টারের প্রতীক্ষায়। পরনে শুদ্ধ বস্ত্র কপালে চন্দনের ফোঁটা।

পায়ের চটিজুতো খুলে রেখে প্রসাদ ধরলেন ঠাকুর। খানিকটা মুখে দিয়ে বললেন, 'বেশ প্রসাদ।'

তারপর চমকে উঠে বললেন, 'আমার বই এনেছ?'

'এনেছি।'

রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই। ঠাকুর বললেন, 'বেশ, এখন এইসব গান ডাক্তারের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও।'

বলতে-বলতেই ডাক্তার এসে হাজির। 'এই যে গো তোমার জন্যে বই এসেছে।' সোল্লাসে বলে উঠলেন ঠাকুর।

বই দুখানি হাতে নিলেন ডাক্তার। বললেন, 'গান পড়ে সুখ কি, গান শুনে সুখ।'

'তবে শোনাও হে মাস্টার—'

এবার আর ঠাকুরের কথা ঠেলতে পারল না। গলা ছেড়ে গান ধরল মাস্টার।

'মন কি তত্ত্ব করো তাঁরে,
যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে।'

তারপর নাচিয়ে পর্যন্ত ছেড়েছেন। আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে এ-ভাব ত্যাগ করো। লজ্জা, অভিমান, গোপন ইচ্ছা—এ সব পাশ। এ ছুঁড়ে

ফেলে দিতে না পারলে স্ফূর্তি কই, সারল্য কই? গড় হয়ে দেবতার দুয়ারে প্রণাম করতে গেলে দামী শালে ধুলো লাগবে সুতরাং মনে-মনে প্রণাম করে দায় সারি এ হচ্ছে অহঙ্কারের কথা। কিন্তু শাল গায়ে দিয়ে ঐ ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়াই আনন্দ। সত্যিকার আনন্দ হলে, গায়ের শাল আর পথের ধুলোয় ভেদ থাকে না। সত্যিকার বন্যা এলে বালির বাঁধে কি করবে? কালীপদসুধাহ্রদে একবার যদি ডুবতে পারো, সব হিসেব পচে যাবে, পুজো হোম জপ বলি কিছুরই আর ধার ধারতে হবে না।

কিন্তু শিবনাথের উলটো কথা। সে বলে, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়।

'শোনো কথা!' বললেন ঠাকুর, 'জগৎচৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য! যিনি বোধ-স্বরূপ, যাঁর বোধে জগৎকে জগৎ বলে বোধ হয় তাঁকে চিন্তা করা মানে অবোধ হওয়া?'

'ভাবতে গেলে সব কিন্তু ছায়া।' বললে প্রতাপ মজুমদার।

'তা কেন?' আপত্তি করল ডাক্তার। 'বস্তুরই তো ছায়া। ঈশ্বর যদি বস্তু হন তা হলে তাঁর ছায়াও বস্তু। এদিকে ঈশ্বর সত্য অথচ তাঁর সৃষ্টি মিথ্যে এ মানতে রাজী নই। তাঁর সৃষ্টিও সত্য।'

সেকথা বৈকুণ্ঠ সেনও বলেছিল। ঠাকুরকে জিগগেস করলে, 'আচ্ছা মশাই সংসার কি মিথ্যে?'

এক কথায় জল করে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানা যায় ততক্ষণ মিথ্যে। ততক্ষণ মায়া। ততক্ষণ আমার-আমার। এদিকে চোখ বুজলে কিছু নেই অথচ আমার হারুর কি হবে! নাতির জন্যে কাশী যাওয়া হয় না! এ সংসার মিথ্যে একশোবার মিথ্যে।'

'কিন্তু সংসারে থেকে তাঁকে জানব কি করে?'

'এক হাত তাঁর পাদপদ্মে রাখো আরেক হাতে সংসারের কাজ করো। ছেলেদের গোপাল বলে খাওয়াও। বাপ-মাকে দেব-দেবী বলে সেবা করো। স্ত্রীর সঙ্গে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে থাকো, ভোগাসনে না বসে বোসো যোগাসনে।'

'কেন মশাই, এক হাত ঈশ্বরে আরেক হাত সংসারে রাখব কেন?' কে একজন ফোড়ন দিল: 'সংসার যে কালে অনিত্য তখন এক হাতই বা সংসারে রাখব কেন?'

সদানন্দ ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তাঁকে জেনে সংসার করলে সংসার অনিত্য নয়।'

সেদিন সদরালাও জিগগেস করেছিল এই কথা। 'কতদিন খাটনি খাটব সংসারের?'

'যতদিন তিনি খাটান। তিনি যা কাজ করতে দিয়েছেন তাই নির্বাহ করো। যদি মনে করো তাঁর দেওয়া কাজ তবে আর শুকনো কর্তব্য নয়, তবে তা পুজো।'

'এ সব কর্তব্যের জন্যে সংসার করা?'

'নিশ্চয়। সংসার করা মানেই কর্তব্যসাধন। ছেলেদের মানুষ করা, স্ত্রীর ভরণপোষণ করা, নিজের অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় রাখা। তা যদি না করো তুমি নির্দয়। যার দয়া নেই সে মানুষই নয়।'

'কিন্তু সন্তানপালন কতদিন?'

'যদ্দিন না সাবালক হয়। পাখি উড়তে শিখলে তখন কি আর ঠোঁটে করে খাওয়ায় তার মা? কাছে এলে ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না।'

'কিন্তু যদি জ্ঞানোন্মাদ হয়?'

'জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্তব্য নেই। তখন কালকের কথা আর তুমি ভাববে না, ঈশ্বর ভাববেন। জমিদার তো মরে গেল নাবালক ছেলে রেখে। নাবালকের কি হবে? তখন তার অছি এসে জোটে। অছি এসে ভার নেয়।' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন সদরালার দিকে। 'এ সব তো আইনের কথা। তুমি তো সব জানো। আর এ তো তুমি মন্দ লোকের উপর ভার দিচ্ছ না, স্বয়ং ঈশ্বরের উপর দিচ্ছ।'

'আহা কি অপরূপ কথা!' পাশে বসে ছিলেন বিজয় গোস্বামী, বলে উঠলেন মধুভাষে: 'নাবালকের অমনি অছি এসে জোটে। আহা! কবে সেই অবস্থা হবে! যাদের হয় তারা কি ভাগ্যবান!'

আমি হাল ছেড়ে দিলেই তুমি এসে হাল ধরবে। আমি শুধু অভয়মনে ছেড়ে দেব আমার নৌকো। হোক আমার পাল ছেঁড়া হাল ভাঙা, তবু ঝড়ের রাতে মত্ত সাগরকে আমার ভয় নেই। আমি জানি তুমি বসে আছ হালের কাছে। লক্ষ্য করছ হাল কতক্ষণে ছেড়ে দিই তোমার হাতে।

ছেড়ে দিয়েছি এবার। দেখি তুমি এখন কি করে ছাড়ো!
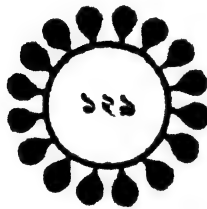
অন্ধ বিশ্বাস? কেন নয়? প্রতিমুহূর্তে করছ না এই অন্ধ বিশ্বাস? অন্ধকারে কেউ নেই এ বিশ্বাসও তো অন্ধ বিশ্বাস।

রোগ দেখে ডাক্তার দিয়ে গেল ব্যবস্থাপত্র। পাঠালাম ডিসপেনসারিতে। অন্ধ বিশ্বাস, কম্পাউন্ডার ঠিক-ঠিক ওষুধ দেবে, বিষ দেবে না। নাপিতের খোলা ক্ষুরের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি কামাবার জন্যে, অন্ধ বিশ্বাস গলার শিরাটি কাটবে না নাপিত। ট্যাক্সি চেপেছি, অন্ধ বিশ্বাস নিরাপদে নিয়ে যাবে পথ কাটিয়ে। সাহেব এসে বললে, উঠেছিলাম গৌরীশঙ্করে, প্রত্যক্ষও নেই অনুমানও নেই, অনায়াসে সত্য বলে মেনে নিলাম। অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কি।

আর-পাঁচজনকে দেখে, পাঁচটা কার্যকারণের ফল থেকেই এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম।

তেমনি দেখি না পাঁচজন কি বলে ঈশ্বর সম্বন্ধে। পাঁচ দেশের পাঁচজন। পাঁচ যুগের পাঁচজন। তারা যদি বলে, হ্যাঁ, আছেন, তাঁকে দেখেছি, তবে মেনে নিতে আপত্তি কি। একটা সাহেবকে সত্যবাদী বলে মানতে পারি, একজন সাধুকে মানতে পারব না? বেশ তো, সাহেবের মধ্যেও তো সাধু আছে। দেখ না তাদের জিগগেস করে।
বাপ ছেলেকে বর্ণপরিচয় শেখাচ্ছে। বলছে, 'পড়ো অ—'
ছেলে বললে, 'কেন, অ বলব কেন? বলব, হ—'
'না, অ-ই বলতে হয়। বলো, অ—'
'বা, বুঝিয়ে দাও, কেন অ বলব? আমি বলব, দ—'
বলো, কী যুক্তি আছে বাপের? কেন ছেলে অ বলবে? কেন সে হ বা দ বলবে না?
তখন অনন্যোপায় হয়ে বাপ বললেন, 'সকলে অ বলেছে, তুমিও অমনি অ বলো—'
যুক্তির সেরা যুক্তি। সকলে বলেছে। সুতরাং তুমিও বলো। তুমিও মানো। বর্ণপরিচয় যেমন অ থেকে শুরু তেমনি জগৎপরিচয়ের আদিতে ঈশ্বর।
অ বলো। বলো আদ্যবর্ণ। তেমনি ঈশ্বর বলো। বলো আদিভূত।
কেন অবিশ্বাস করি? নিজেকে অহঙ্কারী ভাবি বলে। নিজে না দেখলে মানব কেন এই অভিমান থেকেই অবিশ্বাস। যেন চোখ সবই ঠিক দেখে। সিনেমা দেখে যে চোখের জল ফেলি সেও চোখ ঠিক-ঠিক দেখেছিল বলেই। তাই না? হায় রে অহঙ্কার!
কোনো বিষয়ে জানতে হলেই নিজেকে প্রথম জানতে হবে অজ্ঞ বলে। নিজের যদি এই অজ্ঞত্ববোধ না থাকে তবে বিজ্ঞজনের সান্নিধ্য পাব কি করে? আমি জানি না উনি জানেন এই বিনয় এই অভিমানহীনতা না থাকলে কি করে জানতে পারব? ছেলে যদি মনে করে আমি বাপের চেয়ে বড় পণ্ডিত তবে অ-এর বদলে তাকে হ শিখে ফিরতে হয়। পড়তে হয় বিশালাক্ষীর দ-য়ে।
কিন্তু কোনোক্রমে যদি একবার বিশ্বাস হয় তবে কাটান-ছোড়ান নেই। নিশ্চয়-নিষ্পত্তি করে যেতে হবে ষোলো আনা। 'তুই হাসপাতালে এলি কেন?' বললেন ঠাকুর। 'বাড়িতে বসে চিকিৎসা করলেই পারতিস। কে তোকে ঢুকতে বলেছিল হাসপাতালে? যখন একবার ঢুকেছিস সম্পূর্ণ রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বড় ডাক্তার সার্টিফিকেট না দেওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই।'
যখন একবার এসে পড়েছি বিশ্বাসের বন্দরে তখন আর ফিরে যাওয়া নয়। ব্যাকুলতার হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে ভক্তির স্রোতে চলে যাব ভাসতে-ভাসতে।
ভক্তি? ভক্তি কি যে-সে কথা?
না হোক, তবু তোমার মমতা তো আছে, স্নেহপ্রীতি তো আছে। এ তোমার সহজাত। নিজের প্রতি মমতা। সন্তানের প্রতি স্নেহ। পত্নীর প্রতি প্রীতি। এ সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিম্নগামী। বাঁধ দিয়ে এ নিম্নগামী স্রোতকে ভিন্নগামী করে দাও। ঊর্ধ্ব-গামী করে দাও। প্রীতিও তরলতা ভক্তিও তরলতা। বাঁধের কাছটায় বাঁক ঘুরে প্রবলতর বেগে বয়ে যাবে জলস্রোত। প্রীতি ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হবে।
গাছের মূলটি ঊর্ধ্বমুখে। শাখাগুলি নতমুখ।

তোমার ভালোবাসার অঙ্কুরটি ঊর্ধ্বমুখ করে দাও। পরে বিতত শাখায় নত হয়ে জগজ্জনকে সে ছায়া দেবে, শান্তি দেবে।

'তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থাকো।' ঠাকুর বললেন অশ্বিনী দত্তকে : 'কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা তো আর শুকদেবের মত হতে পারবে না যে ন্যাংটো-ভ্যাংটো হয়ে পড়ে থাকবে।'

দক্ষিণেশ্বরে এসেছে অশ্বিনী। সাধ পরমহংসকে দেখবে। কিন্তু কে পরমহংস?

'আহা, দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন।' কে একজন ঘরের মধ্যে দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে।

ঐ তাকিয়ায় ঠেস দেবার নমুনা নাকি? তাকিয়ায় কি করে ঠেস দিয়ে বসতে হয় আমিরি চালে তাই জানে না। তবে নিশ্চয় উনিই পরমহংস হবেন।

একখানা কালোপেড়ে ধুতি পরনে, বসে আছেন পা দুখানি উঁচু করে, তাও দুহাত দিয়ে জড়িয়ে, আধা-চিত অবস্থায়। কেশব সেন তখন বেঁচে, এসেছে ঠাকুরের কাছে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে ঠাকুরও তেমনি প্রণাম করলেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। অশ্বিনী ভাবল এ আবার কোন ঢঙ!

সমাধিভঙ্গের পর কেশবকে বলছেন ঠাকুর, 'হ্যাঁ হে কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি বলে ঈশ্বর নেই? সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন বাবু, এক পা ফেলে আরেক পা ফেলতেই—উঃ, কি হল, বলে অজ্ঞান। ধরো ধরো, ডাক্তার ডাকো। ডাক্তার আসবার আগেই হয়ে গেছে! এই তো বীরত্ব! এ'রা বলেন ঈশ্বর নেই।'

ভক্তি-নদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ব—যাকে বলে সন্তরণে সিন্ধু-গমন—এ কি গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়? কি করে হবে! একবার ডুববে একবার উঠবে, একেবারে ডুবে যাবে কি করে! ঐ যা বলেছি গোলাপী নেশার বেশি হবে না।

'কেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?'

'আহা, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র—' দেবেন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করলেন ঠাকুর। বললেন, 'তবে কি জানো, এক গৃহস্থের বাড়ি দুর্গোৎসব হত, পাঁঠাবলি হ'ত উদয়াস্ত। কয়েক বছর ধরে বলির আর সে ধুমধাম নেই। কি ব্যাপার? একজন এসে জিগগেস করলে, আজকাল আর বলি নেই কেন? আর বলি! গৃহস্থ বললে, এখন দাঁত পড়ে গেছে যে। দেবেন্দ্রও এখন তাই ধ্যান-ধারণা করছে, তা করবেই তো! তা কিন্তু খুব মানুষ দেবেন্দ্র!'

কীর্তন আরম্ভ হল। এবং তারপর যা ঘটল, অশ্বিনী তা কোনোদিন কল্পনায়ও আনেনি। ঠাকুর নাচতে শুরু করলেন। সঙ্গে কেশব। আর যারা-যারা ছিল সকলে। মহাকাশে নক্ষত্রনর্তন। সূর্যও নাচছে সঙ্গে-সঙ্গে গ্রহতারকারাও নাচছে।

নিজে নেচে আর সকলকেও নাচান, অশ্বিনীর সন্দেহ রইল না, এই পরমহংস।

কে এই আত্মদ যাঁর সত্তাতে সকলে সত্তাবান, যাঁর বলে সকলে বলী, যাঁর ছন্দে সকলে প্রাণনৃত্যময়!

বিনয়পূর্ণ প্রার্থনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল মনের মধ্যে। অভিমান বিগলিত করো। প্রাণের মধ্যে পরমনৃত্যের ছন্দে-ছন্দে অহঙ্কারের শৃঙ্খল চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে যাক।

আরেক দিন গিয়েছে অশ্বিনী। সঙ্গে কটি যুবক-বন্ধু।
তাদের লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন, 'এ'রা এসেছেন কেন?'
'আপনাকে দেখতে।' বললে অশ্বিনী।
'আমাকে দেখবে কি গো! ঘুরে-ঘুরে বরং বিল্ডিং-টিল্ডিং দেখুন।'
অশ্বিনী হাসল। 'সে কি কথা! আপনাকে দেখতে এসেছে, ইট-বালি-চুন দেখবে কি!'
'তবে বলতে চাও এরা চকমকির পাথর? ঠুকলে আগুন বেরুবে? হাজার বছর জলে ফেলে রাখলেও আগুন-ছাড়া হবে না? হায়, আমাদের ঠুকলে আগুন বেরোয় কই?'
আবার হাসল অশ্বিনী। আপনি কি আচ্ছাদিত আগুন? আপনি দীপিত আগুন। যে ভাস্করের কাছে আরোগ্য আপনি সেই ভাস্কর। যে হুতাশনের কাছে ধন আপনি সেই হুতাশন। পরম-আয়ু, পরম-ধন-প্রদাতা।
আরো একদিন গিয়েছে। বালকভাবে বললেন ঠাকুর, 'ওগো সেই যে কাক খুললে ভস-ভস করে ওঠে, একটু টক একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পারো?'
অশ্বিনী বললে, 'লেমোনেড? খাবেন?'
আবদেরে গলায় বললেন, 'আনো না একটা।'
একটা এনে দিল অশ্বিনী। ঠাকুর খেলেন আনন্দ করে।
অশ্বিনী জিগগেস করল, 'আচ্ছা, আপনার জাতিভেদ আছে?'
'কই আর আছে! কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি।'
'আচ্ছা, কেশববাবু কেমন লোক?'
'ওগো সে যে দৈবী মানুষ।' একটু থেমে আবার বললেন, 'একটা লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—কত বড় শক্তি!' তারপর আবার একটু থামলেন। বললেন, 'কিন্তু জাতিভেদ জোর করে টেনে ছি'ড়তে চেয়ো না। ও আপনিই খসে যায়। যেমন নারকোল গাছের বালতো আপনি খসে পড়ে তেমনি। এই দেখ না, সেদিন একটা লম্বা দাড়িওলা লোক বরফ নিয়ে এসেছিল, এত বরফ ভালোবাসি অথচ ওর থেকে কিছুতেই খেতে ইচ্ছে হল না। আবার একটু পরে আরেকজন বরফ নিয়ে এল, ক্যাচড়ম্যাচড় করে খেয়ে ফেললাম চিবিয়ে।'
'আর ত্রৈলোক্যবাবু কেমন লোক?' আবার জিগগেস করল অশ্বিনী।
'ত্রৈলোক্য? আহা, বেশ লোক, বেড়ে গায়।'
সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ত্রৈলোক্য এসেছে ঠাকুরকে গান শোনাতে। মা'র গান ধরেছে ত্রৈলোক্য। 'মা, তোমার কোলে নিয়ে অঞ্চলে ঢেকে আমায় বুকে করে রাখো।'
প্রেমে কাঁদছেন ঠাকুর। বলছেন, 'আহা, কি ভাব।'
ত্রৈলোক্য আবার গাইল :

হরি আপনি নাচো আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে-তালে,
মানুষ তো সাক্ষীগোপাল
মিছে আমার-আমার বলে॥

ঠাকুর বললেন গদ্‌গদ হয়ে : 'আহা, তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক-ঠিক। যে সমুদ্রে গিয়েছে সেই দেখাতে পারে সমুদ্রের জল।'
গানশেষে ত্রৈলোক্য বললে, 'আহা, ঈশ্বরের রচনা কি সুন্দর!'
'দপ করে দেখিয়ে দেয়। হিসেব করে সুন্দরের বোধ আসে না।' বললেন ঠাকুর, 'সেই সেদিন শিবের মাথায় ফুল দিচ্ছি, হঠাৎ দেখিয়ে দিলে এই বিশ্বসৃষ্টি, এই বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পুজো বন্ধ হল। ফুল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যেন ফুলের গাছগুলিই একেকটি ফুলের তোড়া। সেই থেকে বন্ধ হল ফুল তোলা। মানুষকেও ঠিক সেইরকম দেখি। তিনিই যেন মানুষের শরীরটাকে নিয়ে হেলে-দুলে বেড়াচ্ছেন—যেন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাসছে, নড়ছে-চড়ছে, উঠছে-পড়ছে—'
আগের কথার জের টানল অশ্বিনী। প্রশ্ন করল : 'আর শিবনাথবাবু কেমন লোক?'
'বেশ লোক, তবে তর্ক করে যে।' একটু থেমে বললেন : 'শিবনাথকে দেখলে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, গাঁজাখোরকে দেখে ভারি খুশি। হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে বসে।'
শিবনাথকেও সেদিন তাই বলেছিলেন মুখের উপর : 'তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব? শুদ্ধাত্মাদের বোধ হয় যেন পূর্ব-জন্মের বন্ধু।'
আলিপুরের চিড়িয়াখানায়ও গিয়েছিলেন ঠাকুর। সে কথা বলছেন শিবনাথকে। শিবনাথ জিগগেস করল, 'কি দেখলেন সেখানে?'
'আর কি দেখব! মায়ের বাহন দেখলাম।'
কেন শিবনাথকে চাই? নিজেই ব্যাখ্যা করছেন ঠাকুর, 'যে অনেকদিন ঈশ্বরচিন্তা করে তার মধ্যে সার আছে। তার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভালো গায় ভালো বাজায় তার মধ্যেও ঈশ্বরের শক্তি আছে। যার যতটুকু বিদ্যা তার ততটুকু বিভূতি। এমন কি যে সুন্দর তার মধ্যেও ঈশ্বরের সার।'
ঈশ্বরই সংসারোত্তর মন্ত্র, তাই যার জিহ্বায় কৃষ্ণমন্ত্র তারই জন্মসাফল্য।
অচলানন্দের কথা উঠল। বরিশালে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে অশ্বিনীর।
'কেমন লাগল তাকে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'চমৎকার।'
'আচ্ছা বলো তো সে ভালো না আমি ভালো?'
কী সরল প্রশ্ন! অশ্বিনী বললে, 'কার সঙ্গে কার তুলনা! সে হল গিয়ে পণ্ডিত আর আপনি হচ্ছেন মজার লোক। তার কাছে শুধু বচন, আপনার কাছে শুধু মজা হরেক রকম মজা, অফুরন্ত মজা—'
কথাটি পেয়ে খুশি হলেন ঠাকুর। বললেন, 'বেশ বলেছ ঠিক বলেছ।'
মজার লোক। তুমি সর্বসুখনিলয়। তুমি আছ হাসে আর রাসে, আনন্দে আর বিনোদে। প্রশান্তবাহিতা তোমার স্থিতি। তুমি প্রাপ্তসমস্তভোগ। আপ্তসমস্তকাম। সুখ কি? আত্মার স্বরূপাবস্থাই সুখ। বিষয়ভোগে যে সুখ, সে সুখ কি বিষয়ে?

না। সে সুখ সুখময় আত্মায়। তিনি সুখ দিলেন বলে সুখের উপলব্ধি হল। ক্ষণ-কালের জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়েছিল, ক্ষণকালের জন্যে চিত্তবৃত্তি আত্মাভিমুখী হয়েছিল, ক্ষণকালের জন্যে মরণযন্ত্রণা বা পরিবর্তন-যন্ত্রণা ছিল না—সেই হেতু। সুখের বিষয় বিষয় নয়, সুখের বিষয় আত্মা।
তাই খণ্ড সুখ ক্ষুদ্র সুখ নিয়ে কি হবে? যে সুখ বারে-বারে মরে যায় সেই সুখের মূল্য কি। চাই অপরিচ্ছিন্ন সুখ। সেই অপরিচ্ছিন্ন সুখই তুমি।
'তাঁকে পাবো কি করে?' সরাসরি প্রশ্ন করল অশ্বিনী।
'কাঁদতে-কাঁদতে কাদাটুকু যখন ধুয়ে যাবে, তখন পাবে।' বললেন ঠাকুর, 'চুম্বক বরাবরই লোহাকে টানে। কিন্তু লোহার গায়ে যে কাদা মাখা। কাদা লেগে থাকতে কি করে লাগে চুম্বকের সঙ্গে! তাই কাদাটুকু ধুয়ে ফেল চোখের জলে।'
ঠাকুর তক্তপোশের উপর উঠে এলেন। শুয়ে পড়লেন। বললেন, 'হাওয়া কর দেখি।'
অশ্বিনী পাখা করতে লাগল।
'বড্ড গরম গো। পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও না—'
পরিহাস করল অশ্বিনী। 'আপনারও শখ আছে দেখছি।'
'কেন থাকবে না, কেন থাকবে না জিগগেস করি?'
'না, না, থাক, একশোবার থাক।'
কতক্ষণ পর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি গিরিশ ঘোষকে চেনো?'
'কোন গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে? দেখিনি কখনো। নাম শুনেছি।'
'আলাপ কোরো তার সঙ্গে। খুব ভালো লোক।'
'শুনি মদ খায় নাকি?'
উদার শান্তিতে বললেন ঠাকুর, 'তা খাক না, খাক না, কতদিন খাবে?'
'এখন ঠাকুরের কথায় যে আনন্দ পাই তার এক কণা যদি মদ-ভাঙ-গাঁজায় থাকত!' নিজের কথা বলছে সবাইকে গিরিশ : 'আমি কত কি ঠাকুরকে বলতাম তিনি কিছুতেই বিরক্ত হতেন না। যখন মদ খেয়ে টং হয়ে যেতাম, বেশ্যাও দরজা খুলে দিতে সাহস পেত না, তখনো ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পেতাম। সে অবস্থায়ও আদর করে ধরে নিয়ে যেতেন। লাটুকে বলতেন, ওরে দ্যাখ গাড়িতে কিছু আছে কিনা। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব? তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকতেন। চেয়ে থেকে আমার চোখের দৃষ্টি শাদা করে দিতেন। শেষে আপশোষ করতাম, আমার আস্ত বোতলের নেশাটা মাটি করে দিলে!'
আবার বলছে গিরিশ, 'সকলকে ঠাকুর গত জীবনের কথা জিগগেস করতেন, আমাকে কখনো করেননি। একবার করলে হয়! সব মহাভারত তাঁকে বলে দিই। বললে সব তিনি নিশ্চয়ই শোনেন বসে-বসে। মানা করেন না কিছুতেই। সাধে কি আর ওঁকে এত মানি?'
'আপনি আমার সব বিষয়ের গুরু।' একদিন গিরিশ ঠাকুরকে বললে মুখের উপর। 'এমন কি ফিচকেমিতেও।'
ঠাকুর বললেন, 'না গো তা নয়। এখানে সংস্কার নেই। করে জানা আর পড়ে বা

দেখে জানার ভেতর ঢের তফাত। করে জানলে সংস্কার পড়ে যায়। তা থেকে বেঁচে ওঠা ভারি শক্ত। পড়ে বা দেখে-শুনে জানাতে সেটা হয় না।'

এক রাজার এক গল্প আছে। ভারি স্ত্রৈণ সেই রাজা। একদিন রাজার এক বন্ধু তাকে এই নিয়ে খুব শ্লেষ করল। রাজা ভেবে দেখলেন, সত্যি, এবার থেকে চলতে হবে সামলে। অন্তঃপুরে এসে গম্ভীর হয়ে রইলেন, নিতান্ত দু-একটা দরকারি কথা ছাড়া কথাই কন না রানির সঙ্গে। খেতে বসেছেন রাজা, রানির পোষা বেড়াল রাজার পাতের কাছে ঘুরঘুর করছে। রাজা তাকে তাড়াতে চেষ্টা করছেন কিন্তু সে বারে-বারেই ফিরে আসছে। তখন রানি বলছে, 'আগে ওকে অনেক আস্কারা দিয়েছ, এখন কি আর তাড়ানো সম্ভব?'

আগে অনেক আস্কারা দিলে পরে আর তাড়ানো যায় না। তাই রাশ রাখো নিজের কাছে।

বারাঙ্গনা ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু তোমার বাসনার নটীকে কি করে ত্যাগ করবে?

তবে উপায়?

'আন্তরিক হও। অন্তরের নির্জনে বসে কাঁদো। অন্তরকে প্রক্ষালিত করো। অন্তরের থেকে চাও ঈশ্বরকে।

'ধ্যান করো।' বলছেন ঠাকুর, 'একাগ্র হও। ধ্যানে কত কি হয়তো দেখবে, কুকুর বেড়াল বাঁদর বেশ্যা লোচ্চা জুয়াচোর রাক্ষস পিশাচ দৈত্য দানব। ভয় পেয়ো না। ভেঙে দিও না ধ্যান। বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্তি দেখছ মনে করে স্থির থেকো। কিন্তু যদি কোনো বাসনা এসে হাজির হয়, তখুনি বুঝবে মহা বিঘ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। তখন ধ্যান ভেঙে কাতরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, ভগবান, আমার এ বাসনা পূর্ণ কোরো না।'

তুমিই শুধু পূর্ণ হয়ে বিরাজ করো।

তারপর বলি তোদের এক চরম কথা। অশেষ আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। 'শোন, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'
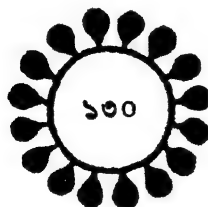
ঈশ্বরই মরণাতীত সত্য।

ঈশ্বরকে মাথায় নিলে মানুষ কি ছোট হয়ে যায়, না, বড়ো হয়ে ওঠে। সবই তাঁর

ইচ্ছা এই ভেবে কি মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, না, তাঁর ইচ্ছা প্রস্ফুটিত করি আমার জীবনে, আসে এই দুর্দম প্রেরণা? কাকে ধরে শোকে-দুঃখে নির্বিচল থাকি, বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করি, বৈমুখ্যে-বৈফল্যে সংগ্রহ করি নবতর সংগ্রামের তেজ! কে হতাশের আশা, নিঃস্বের সম্বল, চিরোৎকণ্ঠিতের শান্তি! কে সমস্ত বিবাদের মীমাংসা! সমস্ত অন্যায়ের সংশোধন!

কোথায় যাবে মানুষ? মায়ামূঢ় দিঙমূঢ় মানুষ! পথ চলতে-চলতে বিশ্রাম চায়। কোথায় সেই বিশ্রামায়তন! নিজের ঘরের চিন্তামণির সন্ধানে ঘর ছেড়ে বনে-বনে ঘোরে।

সন্ন্যাসী হয়েও বিশ্রাম চায়। কুটির বাঁধে, মঠ তোলে। নিজের বৃত্তি ছেড়ে এসে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। নিজের পুত্র ছেড়ে এসে চেলা বানায়। এক মায়া ছেড়ে আরেক মায়ার বশে আসে। যা চায় কোথাও তাকে পায় না খুঁজে-খুঁজে। সে মোহন মানুষ মনের মানুষ হয়ে মনের মধ্যেই বসবাস করছে। তাকে সেইখানেই খোঁজো, বোঝো, সেইখানেই ধরো।

যে প্রশান্তসাগর খুঁজছ সে তোমার মনের ভূমণ্ডলে।

ঠাকুর বললেন, 'গৃহীর অভিমান কুঁচ গাছের শিকড়, উপড়ে তোলা যায় সহজে। কিন্তু সন্ন্যাস অভিমান অশ্বত্থের মূল, কোনোক্রমে উৎপাটিত হয় না।'

প্রেমানন্দ স্বামী লিখছেন: 'সাধুর এ-দোর ও-দোর ঘোরা কি কম লাঞ্ছনা? সাধু-গিরি হ্যাক-থু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধোঁকা কাটিয়ে দাও ঠাকুর, ধোঁকা কাটিয়ে দাও। আর না প্রভু, অনেক হয়েছে। সাধু হয়ে আবার ঘর-বাড়ি করে থাকা ঘোর বিড়ম্বনা, মহা-মায়ার বিষম প্যাঁচ—'

যেখানেই আছ সেখানেই থাকো। দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়দের ঘোড়া ও বিষয়কে রাস্তা করো। আর জেনো আত্মাই হচ্ছে সেই রথের রথী।

জব্বলপুর থেকে এক ভদ্রলোক এসেছে। এম-এ পাশ পণ্ডিত। কাজেকাজেই ঘোরতর নাস্তিক। ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। জীবনে অনেক অশান্তি, অনেক আঘাত, তবু মানবে না ঈশ্বরকে। ঈশ্বর যে আছে তার প্রমাণ কি।

'তোমার কাছে প্রমাণ বলে যখন কিছু নেই, তখন নেই। কি আর করা! কিন্তু সামান্য তুমি একটু দয়া করতে পারো?' স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন ঠাকুর।

'কি, বলুন।'

'এইটুকু অনুমান করতে পারো যে, যদি কেউ থাকে? কত কিছু রয়েছে তোমার চোখের বাইরে, তোমার জ্ঞান-প্রমাণের বাইরে, তেমনি যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে, এইটুকু মেনে নিতে পারো?'

'যদি কেউ থাকে?' ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে ভাবলে কিছুক্ষণ। বললে, 'বেশ এইটুকু আনতে পারি অনুমানে। তারপরে কী হবে?'

'তারপরে তার কাছে প্রার্থনা করো।' ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন, 'এইভাবে বলো, যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকো তো আমার কথা শোনো। আমার অশান্তি-আঘাত দূর করে

দাও। তুমি যখন বলছ নেই তখন নেই। কিন্তু যদি কেউ থাকো, এইটুকু বলতে আপত্তি কি—'

ভদ্রলোক বললে, 'না, এতে আর আপত্তি কি! আমি জানি ঘরে কেউ নেই। তবু ইতিমধ্যে যদি কেউ এসে থাকো, আমার কথা শোনো।'

'হ্যাঁ, এমনি করেই করো প্রার্থনা। কদিন পর আবার এস আমার কাছে।'

কদিন পর এল সেই ভদ্রলোক। ঠাকুরের পা ধরে কাঁদতে লাগল। বলল, 'ঠাকুর, "যদি" আর নেই। "কেউ"-ও আর নেই। একমাত্র "আছেন," তিনি আছেন, একজনই আছেন।'

'লোকে ঈশ্বর মানবে না!' বলছেন ঠাকুর, 'যে মানুষ গলায় কাঁটা ফুটলে বেড়ালের পা ধরে, খেজুরগাছকে প্রণাম করে, তার আবার বড়াই, ঈশ্বর বিশ্বাস করবে না!'

কাপ্তেনকে তাই বললেন ঠাকুর, 'তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ। আর পোড়ো না।'

শব্দজাল না মহারণ্য। অনেক বাক্য নিয়ে মাথা ঘামিও না। জনককে বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। ওতে লাভ আর কিছুই নেই, শুধু বাগিন্দ্রিয়ের ক্লান্তি।

আর নারদ কি বলছে? বলছে কত তো পড়লাম, ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ। ইতিহাস পুরাণ ব্যাকরণ গণিত। দৈববিদ্যা ভূবিদ্যা তর্কশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র। নিরুক্ত কল্প ছন্দ ভূততন্ত্র গারুড়তন্ত্র। ধনুর্বেদ জ্যোতিষ নৃত্যগীতবাদ্য শিল্পবিজ্ঞান। কিন্তু কই, শান্তি কোথায়, সত্য কোথায়? শুধু কতগুলো শব্দের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি।

সনৎকুমার উত্তর দিলেন : 'যা কিছু অধ্যয়ন করেছ সব কতগুলি বুলি মাত্র।'

'শাস্ত্রের ভেতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?' বললেন ঠাকুর, 'শাস্ত্র পড়ে "অস্তি" মাত্র বোঝা যায়। পাওয়া যায় একটু আভাসলেশ। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক আওড়াও, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে ভালো হচ্ছে দেখা। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশী দেখা—অনেক অনেক তফাত। তাই বলি দেখবার জন্যে ডুব দাও। ডুব দেবার পর মনের অতলতলে তাঁকে দেখতে পাবে।'

চিঠির কথা আর চিঠি যে লিখেছে তার মুখের কথা—অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা আর ঈশ্বরের বাণী হচ্ছে মুখের কথা। বললেন ঠাকুর, 'আমি মা'র মুখের কথার সঙ্গে না মিললে শাস্ত্রের কথা লই না। বেদ-পুরাণ-তন্ত্রে কি আছে জানবার জন্যে হত্যে দিয়ে মাকে বলেছিলুম, আমি মুখ্খু, তুমি আমায় জানিয়ে দাও ঐ সব শাস্ত্রে কি আছে। মা বললেন বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যে। গীতার সার গীতা দশবার উচ্চারণ করলে যা হয়। অর্থাৎ ত্যাগী, ত্যাগী। যদি একবার ঈশ্বরের মুখের কথাটি শুনতে পাও দেখবে শাস্ত্র কোথায় কত নিচে তলিয়ে গেছে।'

তেমন-তেমন একটি মন্ত্র পেলে কি হবে শাস্ত্র দিয়ে?

'কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই, কিবা তার বল
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।'

শাস্ত্রপাঠ হয়নি কিন্তু সাধুসঙ্গ আছে। শুধু সাধুসঙ্গেই সর্বসিদ্ধি। আতরের দোকানে গেলে তুমি ইচ্ছে করো আর নাই-করো আতরের গন্ধ তোমার নাকে ঢুকবেই। একটা জীবন থেকে আরেকটা জীবনে তেমনি ভাবসংক্রমণ হবে, এক স্ফুলিঙ্গ থেকে আরেক বহ্নিকণা।

দ্বিজ প্রায়ই মাস্টারের সঙ্গে আসে। বয়স পনেরো-ষোলো। বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, ছেলেকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে দিতে নারাজ।

আঁরো দুটি ভাই আছে দ্বিজর। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোর ভায়েরাও আমাকে অবজ্ঞা করে?'

দ্বিজ চুপ করে রইল।

মাস্টার বললে, 'সংসারে আর দু-চার ঠোক্কর খেলেই যাদের একটু-আধটু যা অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে।'

'বিমাতা তো আছে। ঘা তো খাচ্ছে মন্দ নয়।' ঠাকুর একদৃষ্টে দেখছেন দ্বিজকে। বললেন, 'এই ছোকরাই বা আসে কেন? অবশ্য আগেকার কিছু সংস্কার ছিল। তবে কি জানো? তাঁর ইচ্ছে। তাঁর হাঁ-তে জগতের সব হচ্ছে, তাঁর না-তে হওয়া বন্ধ হচ্ছে। মানুষের আশীর্বাদ করতে নেই কেন?'

'মানুষের আশীর্বাদ করতে নেই?'

'না। কেননা মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। তাঁর ইচ্ছাতেই হয়-লয়।'

আবার দেখছেন দ্বিজকে। বলছেন, 'যার জ্ঞান হয়েছে তার আবার নিন্দার ভয় কি! কামারের নেহাই, হাতুড়ির ঘা পড়ছে কত, কিছুতেই কিছু হয় না।'

দ্বিজ চলে গেলে আবার বলছেন তার কথা।

'কি অবস্থা ছেলেটার। কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে। এ কি কম? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এল তা হলে তো সবই হল।'

সেদিন দ্বিজর সঙ্গে দ্বিজর বাপ এসেছে। আর ভাইয়েরাও। দ্বিজর বাপ হাইকোর্টের ওকালতি পাশ করে সদাগরী আফিসের ম্যানেজারি করছে।

'আপনার ছেলে এখানে আসে, তাতে কিছু মনে কোরো না। আমি শুধু এইটুকু বলি চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাকো। শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখো, আর কোনো গোল নেই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দ্বিজর বাপ সায় দিল।

'তুমি যে ছেলেকে বকো, তার মানে আমি বুঝেছি। তুমি ভয় দেখাও। তুমি ফোঁস করো। সেই ব্রহ্মচারী আর সাপের গল্প। জানো না?' ঠাকুর গল্প ফাঁদলেন।

রাখালেরা মাঠে গরু চরাচ্ছে। সেই মাঠে বিষধর এক সাপের বাসা। এক ব্রহ্মচারী একদিন যাচ্ছে ঐ মাঠ দিয়ে। রাখালেরা বললে, ঠাকুরমশাই যাবেন না ওদিকে। ওদিকে এক সর্বনেশে সাপ আছে ফণা তুলে। আমার ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি, বললে ব্রহ্মচারী। বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই ফণা-মেলা সাপ তেড়ে এল ব্রহ্মচারীর দিকে। ব্রহ্মচারী মন্ত্র পড়ল। মন্ত্র পড়তেই কেঁচো হয়ে গেল সাপ। তুই কেন পরের হিংসে করে বেড়াস? ব্রহ্মচারী শাসালেন সাপকে। বললেন, আয় তোকে মন্ত্র দি।

এই মন্ত্র জপ করলে তোর আর হিংসে থাকবে না। বলে চলে গেল ব্রহ্মচারী। সাপ মন্ত্র জপতে লাগল। তখন রাখালরা দেখলে, এ তো ভারি মজা, ঢেলা মারলেও সাপটা রাগে না। তখন একদিন একজন সাপটার ল্যাজ ধরে তাকে অনেক ঘুরপাক খাইয়ে আছড়ে ফেলে দিলে মাটির উপর। অচেতন হয়ে পড়ে রইল সাপ। রাখালেরা ভাবলে মরে গেছে। তাই মনে করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। অনেক রাত্রে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সাপ ঢুকল গিয়ে তার গর্তে। মার খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, এদিকে হিংসে করা বারণ, গর্তর বাইরে এসে খাবারের সন্ধান করে সাপ। কি আর খাবে। মাটিতে-পড়া-ফল আর পাতা ছাড়া তার আর খাদ্য নেই। কিন্তু এ দিয়ে কি জীবনধারণ সম্ভব? একদিন এ মাঠ দিয়ে যাচ্ছে ফের ব্রহ্মচারী, ডাকলে সাপকে। ভক্তিভরে প্রণাম করে সাপ কাছে এল। কি রে কেমন আছিস? যেমন রেখেছেন। সে কি রে, এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? লতা-পাতা খেয়ে কি করে আর মোটা হই? শুধু এইজন্যে? নিরামিষ খেলে কি রোগা হয়? দ্যাখ দেখি ভেবে আর কোনো কারণ আছে কিনা। আছে। সাপ তখন বললে রাখাল ছেলেদের সেই আছড়ে মারার কথা। আমি যে অহিংসার মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে যে কামড়াব না তা তারা কেমন করে জানবে? তুই কী অসম্ভব বোকা! ব্রহ্মচারী ধমকে উঠল। নিজেকে রক্ষা করতে জানিস না? আমি তোকে কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে বারণ করিনি। তুই ফোঁস করে ওদের ভয় দেখালিনে কেন?
'তুমিও তেমনি শুধু ফোঁস করো ছেলেকে, কামড়াও না নিশ্চয়ই।'
দ্বিজর বাপ হাসছে।
'শোনো, ভালো ছেলে হওয়া বাপের পুণ্যের চিহ্ন।' বললেন ঠাকুর, 'যদি পুকুরে ভালো জল হয় সেটি পুকুরের মালিকের পুণ্যের চিহ্ন, তাই না?'
হুঁ দিয়ে যাচ্ছে দ্বিজর বাপ।
'শোনো, এখানে এলে-গেলেই ছেলেরা জানতে পারবে বাপ আসলে কত বড় বস্তু। বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে তার ছাই হবে।' পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল ঠাকুরের : 'আমি মা'র কথা ভেবে থাকতে পারলাম না বৃন্দাবনে। যাই মনে পড়ল মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে আছেন, অমনি মন হু-হু করে উঠল। বৃন্দাবন অন্ধকার দেখলাম। আমি বলি সংসারও করো আবার ভগবানে মন রাখো। সংসার ছাড়তে বলি না। এও করো ওও করো।'
দ্বিজর বাপ এতক্ষণে মুখ খুলল। বললে, 'আমি বলি পড়াশোনা তো চাই। ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটায়। এখানে আসতে কি আর আমি বারণ করি?'
'আর জোর করেই কি তুমি বারণ করতে পারবে? যার যা আছে তাই হবে।'
আবার হুঁ দিল দ্বিজর বাপ।
মাদুরের উপর বসেছেন সবাই। কথা বলছেন আর মাঝে-মাঝে দ্বিজর বাপের গায়ে হাত দিচ্ছেন ঠাকুর। দ্বিজর বাপের গরম লাগছে। নিজে হাতে করে তাকে পাখা করছেন ঠাকুর।

দ্বিজর দিদিমা ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন অসুখ শুনে।
'ইনি কে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'যিনি মানুষ করেছেন দ্বিজকে? আচ্ছা, দ্বিজ নাকি একতারা কিনেছে? সে আবার কেন?'
মাস্টার বললে, 'ঠিক একতারা নয়, ওতে দুই তার আছে।'
'কেন, কি দরকার? একে তো তার বাপ বিরুদ্ধ, তায় ফের জানাজানি করে লাভ কি? ওর পক্ষে গোপনে ডাকাই ভালো।'
গোপনে-গোপনে শয়নে-স্বপনে যে তোমাকে ডাকছি জানতে দেব না কাউকে। হৃদয়ে তুমি যে তোমার রাঙা রাখীর ডোরটি বেঁধে দিয়েছ বাইরে থেকে কেউ তা জানতে পাবে না। তোমার সঙ্গে আমার প্রেম সংসার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সংসারকে ফাঁকি দেব, সিদ্ধ হব এই নিষিদ্ধ প্রেমে। তখন এই সংসারই হবে আমাদের মিলনমালঞ্চ। জলেস্থলে এত যে শোভা-সৌন্দর্য ছড়িয়ে রেখেছ এ আমাদেরই প্রেমের মুগ্ধ দৃষ্টি। ভুবনচরাচর আমাদেরই মহোৎসব-সভা।
অগাধজলসঞ্চারী রোহিত হও, গণ্ডূষজলে সফরী হয়ো না।
সেই রাজকুমারীর গল্পটি শোনো :
ভক্তিমতী রাজবালা, রামময়জীবিতা, কিন্তু তার রাজকুমার স্বামী ভুলেও রাম-নাম উচ্চারণ করবে না। তাতে রাজকুমারীর বড় দুঃখ। কত অনুরোধ স্বামীকে, একবার রাম-নাম বলো, স্বামী নিরুত্তর। স্বয়ং রামচন্দ্রের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায় রাজকুমারী। স্বামীকে সুমতি দাও, তাঁর জিভে একবার তোমার নামময় প্রদীপটি জেলে দাও। এমনিতে মলিন মুখ রাজকুমারীর, হঠাৎ সেদিন, বলা-কওয়া নেই, সকাল হতেই রাজকুমারী উৎফুল্ল। দেওয়ানকে খবর দিল, আজ নগরময় আনন্দোৎসব হবে, অগণন ব্রাহ্মণভোজন, অগণন ভিখারী-বিদায়। সত্বর সব ব্যবস্থা করুন। কারণ কি জানতে পাই? মিনতি করল দেওয়ান। আমার হুকুম। গম্ভীর হল রাজকুমারী। রাজকুমার বললে, এ কি সমারোহ! এত ঘটা-ছটা কিসের জন্যে? প্রথমে রাজকুমারী বলতে চায় না, শেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর বললে, জানো আজ আমার কত বড় শুভদিন! কাল রাত্রে স্বপ্নে তুমি একবার রাম-নাম করে ফেলেছ। এতদিন যে নাম শত অনুরোধেও উচ্চারণ করোনি, ঘুমঘোরে সে নাম তোমার মুখ থেকে স্খলিত হয়েছে। তাই এই উৎসবের আয়োজন। বিমূঢ়ের মত, হৃতসর্বস্বের মত তাকিয়ে রইল রাজকুমার। বেদনার্ত কণ্ঠে বললে, কি নাম? রাম-নাম। বলে ফেলেছি? মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে? রাজকুমার আর্তনাদ করে উঠল, যে ধন হৃদয়ের মধ্যে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম তা বেরিয়ে গিয়েছে? বলতে-বলতেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। রাজকুমারী দেখল, নাম-পাখি উড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বামীর দেহপিঞ্জর শূন্য! তাই যত্ন করে লুকিয়ে রাখো। শুধু সে দেখে আর তুমি দেখো।
আমার সকল জল্পনা তোমার নামজপ, আমার সকল শিল্পকর্ম তোমারই মুদ্রারচনা। আমার ভ্রমণ তোমাকে প্রদক্ষিণ, আমার ভোজন তোমাকে আহুতিদান। আমার শয়ন তোমাকে প্রণাম, তোমাকে আত্মসমর্পণই আমার অখিলসুখ। আমার সকল চেষ্টা তোমারই পূজাবিধি।

আমি স্বভাবতই কামাসক্ত, আমাকে আর প্রলুব্ধ কোরো না, বর দিয়ে। কামাসক্তির ভয়েই তো তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছি। আমার মধ্যে সত্যিকার ভৃত্যের লক্ষণ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই তুমি আমাকে কামপ্রবৃত্ত করছ। নতুবা হে অখিল-গুরু, তুমি করুণাময়, তোমার কেন এই কঠোরতা? যে তোমার কাছে বর চায় সে ভৃত্য নয়, সে বণিক। এই বাণিজ্যবুদ্ধি থেকে মুক্তি দাও আমাকে। আমি তোমার অকামসেবক তুমি আমার নিরভিপ্রায় প্রভু। হে সর্বকামদ, যদি নিতান্তই আমাকে বর দেবে তবে এই বর দাও যাতে কাম না অঙ্কুরিত হয় হৃদয়ে।

তোমার কথা অমৃতস্বরূপ। সন্তপ্তজনের প্রাণদাতা। সর্বপাপনাশী। শ্রবণমঙ্গল। সর্বশ্রীবর্ধক। যাঁরা তোমার নাম কীর্তন করেন তাঁরা বহুদাতা।

তুমি বিশ্বমঙ্গল মহৌষধি।
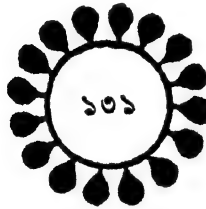
ঠাকুর অসুখে পড়লেন। গলায় ব্যথা।

'বড় গরম পড়েছে।' বললেন মাস্টারকে : 'একটু-একটু বরফ খেয়ো।'

মৃদু-মৃদু হাসল মাস্টার।

'গরমে আমারো বাপু বড় কষ্ট হচ্ছে। তা বরফ খেয়েই বা বিশেষ লাভ কি। এই দেখ না, কুলপি বরফ বেশি একটু খাওয়া হয়েছিল, গলায় এখন বিচি হয়েছে।'

এই প্রথম সূত্রপাত অসুখের।

'মাকে বলেছি, মা, ব্যথা ভালো করে দাও, আর কুলপি খাব না।'

'শুধু কুলপি?'

'না। আবার বলেছি, মা বরফও খাব না আর। যেকালে বলেছি একবার মাকে, আর খাব না কোনোদিন। কিন্তু জানো,' সরলস্বভাব বালকের মত বললেন, 'মাঝে-মাঝে এমন হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। সেদিন বলেছিলাম মাছ খাব না রোববার, কিন্তু, জানো, ভুলে খেয়ে ফেলেছি।'

মৃদু-মৃদু হাসল মাস্টার।

'কিন্তু জানো,' গম্ভীর হলেন ঠাকুর : 'জেনে-শুনে হবার যো নেই।'

কলকাতা থেকে হঠাৎ একজন ভক্ত এসে উপস্থিত। সঙ্গে বরফ নিয়ে এসেছে ঠাকুরের জন্যে।

কৌতূহলী হয়ে তাকালেন মাস্টারের দিকে। ছেলেমানুষ যেমন করে তাকায় লোভালু চোখে। জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁগা, খাব কি?'

মাস্টার চুপ করে রইল।

'হ্যাঁগা, বল না, খাব কি?' আবার জিগগেস করলেন বালকের মত।

'আজ্ঞে,' মাস্টার বললে কুণ্ঠিত হয়ে, 'মাকে জিগগেস করে নিন। যদি তিনি না করেন খাবেন না।'

খেলেন না ঠাকুর।

এমনি বালকস্বভাব। এমনি সর্ববন্ধনহীন সর্বানন্দ।

স্টারে দক্ষযজ্ঞ দেখতে গিয়েছেন। সঙ্গে রামলাল। কিছু খেয়াল নেই, যে পথে মেয়েরা ঢোকে সেই পথে এসে পড়েছেন। এতটুকু পিছিয়ে যাবার চেষ্টা নেই। যে মেয়েটিকে কাছে পেলেন তাকেই ডেকে জিগগেস করলেন, 'ওগো গিরিশকে একবার ডেকে দাও না।'

গিরিশের নিমন্ত্রণেই এসেছেন। চৈতন্যলীলার পর এবার দক্ষযজ্ঞ। কৃষ্ণকীর্তনের পর শিববন্দনা। নবীননীরদশ্যামল কৃষ্ণ আর শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ শিব।

কে এসে পড়েছেন নিভৃত প্রকোষ্ঠে জানে না হয়তো মেয়েটি একচক্ষে তাকিয়ে রইল। পর্বতের মধ্যে মহামেরু নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা, কে তুমি।

'বলো গে দক্ষিণেশ্বর হতে সব এসেছে।'

পড়ি-মরি করে ছুটে এসেছে গিরিশ। ছুটে এসেই লুটিয়ে পড়ল পায়ের উপর।

'ওঠো গো ওঠো। জামায় যে ময়লা লাগল।'

'ময়লা লাগল, না, ময়লা গেল?' মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললে উদ্দীপ্ত হয়ে, 'সবাইকে ডাক্। পায়ে লুটিয়ে পড়্, লুটিয়ে পড়্। মহা ভাগ্য তোদের, তিনি পথ ভুলে এসে পড়েছেন, ওরে, এমন সুযোগ আর পাবিনে—'

কে কোথায় সাজগোজ করছিল, সব ফেলে রেখে ছুটে এল। প্রণাম করতে লাগল একে-একে।

এ কি সেই ভুবনভয়ভঙ্গ চতুর্বর্গবদান্য শিব নয়?

'ওঠো ওঠো মায়েরা, আনন্দময়ীরা।' মুক্তহস্তে ঠাকুর কৃপাবর্ষণ করতে লাগলেন, 'নেচে গেয়ে অভিনয় করে সর্বজীবকে আনন্দ দিচ্ছ, নিত্য বসতি করো এই আনন্দে। যাও, এইবার সাজগোজ সেরে নামো গে—'

দক্ষ সেজেছে গিরিশ। হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল স্টেজে। বীরদর্পে ঘোষণা করল : 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।'

বালকের মত বিস্ময়বিহ্বল চোখে দেখছেন সব ঠাকুর। গিরিশের কথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর : 'ওরে রামলাল, এ শালা আবার বলে কি রে—'

বলে কিনা শিবনাম ঘোচাবে! এত দিন ধরে তবে ওকে শেখালাম কি!

'ও কথা গিরিশ বলছে না, দক্ষ বলছে।'

'গিরিশ বলছে না?' যেন অবাক হলেন ঠাকুর।

'না, ওটা দক্ষের কথা।'

গিরিশ আর দক্ষ যে আলাদা এ ভেদ ভুলে গিয়েছেন। যে পোশাকেই এসে দাঁড়াক, যে অবস্থাতেই, গিরিশ সব সময়েই গিরিশ।

এই বালকস্বভাব। রাজার পার্টে বাপ অভিনয় করছে, মা'র কোলে বসে দেখছে তার ছোট ছেলে। মা, বাবা আবার কখন আসবে, কোন দৃশ্যে, এই শুধু তার জিজ্ঞাসা। রাজার আবির্ভাবের কথা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। নাটকে আছে বিদ্রোহী সেনাপতি রাজাকে হঠাৎ অস্ত্রাঘাত করে বসবে। সেই দৃশ্যে যেমনি সেনাপতি রাজাকে তলোয়ারের ঘা দিল ছোট ছেলে মা'র কোলে বসে কেঁদে উঠল, মা, বাবাকে মারলে! ওটা যে রাজার উপর আঘাত তা কে বোঝায় সেই ছেলেকে! তার চোখে রাজা নেই, শুধু তার বাবা। তেমনি ঠাকুরের চোখে দক্ষ নেই, শুধু গিরিশ। যে গিরিশ ভক্ত-ভৈরব, সে শিবনাম উচ্চারণ করবে না?

'ভয় নেই, দক্ষ মানে গিরিশ আবার বলবে শিবনাম।'

বলবে তো? দেখিস। যেন আশ্বস্ত হলেন। দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, বসলেন আবার চেয়ারে।

সেবার গিয়েছিলেন 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখতে। গিরিশকে বললেন, 'বা, তুমি বেশ লিখেছ।'

'লিখেছি মাত্র।' গিরিশ বললে বিনীত ভাবে, 'কিন্তু ধারণা কই?'

'ধারণা না হলে কি এত সব লেখা যায়? ভিতরে ভক্তি না থাকলে আঁকা যায় কি চালচিত্র?'

প্রহ্লাদ পড়তে এসেছে পাঠশালায়। তাকে দেখে ঠাকুরের আহ্লাদ আর ধরে না। সস্নেহে তাকে ডেকে উঠলেন প্রহ্লাদ বলে। বলতে-বলতে সমাধিস্থ।

হাতির পায়ের নিচে ফেলেছে প্রহ্লাদকে। ঠাকুর কাঁদতে শুরু করলেন। ফেলেছে অগ্নিকুণ্ডে। আবার কান্না। গোলোকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন প্রহ্লাদের প্রতীক্ষায়। ঠাকুর আবার সমাধিস্থ।

অসুরদের পুরোহিত শুক্রাচার্য। তার দুই ছেলে, ষণ্ড আর অমর্ক। প্রহ্লাদের দুই মাস্টার। অসুররাজ বিষ্ণুশত্রু হিরণ্যকশিপু ছেলের পড়াশোনা নিয়ে আর ভাবে না, যোগ্য হাতেই তাকে সমর্পণ করা হয়েছে। একদিন গৃহাগত ছেলেকে কোলে নিয়ে হিরণ্যকশিপু জিগগেস করলে, যা যা এত দিন শিখলে তার মধ্যে তোমার সবচেয়ে কী ভালো মনে হল? প্রহ্লাদ বললে, বাবা, এই অন্ধকূপ সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করার কথাটিই সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সুখময় মনে হয়েছে।

কোল থেকে নামিয়ে দিল ছেলেকে। গুরুরা টেনে নিয়ে গেল। জিগগেস করলে, প্রহ্লাদ, এ তুমি নিজের থেকে বললে, না, আর কেউ তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে? আর কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। স্মিতহাস্যে বললে প্রহ্লাদ। যিনি শিখিয়ে দিয়েছেন, যাঁর আকর্ষণে আমার এই মতি হয়েছে, তিনিই শ্রীহরি শ্রীবিষ্ণু। তর্জন-গর্জন দণ্ড-বেত্র বহু শাসন-পীড়ন শুরু করল মাস্টাররা। নতুন করে শেখাল সব জাগতিক কর্মকাণ্ডের কথা। আবার নিয়ে এল বাপের কাছে। এইবার বলো সর্বোত্তম কী তুমি

শিখে এলে? পিতাকে বন্দনা করে প্রহ্লাদ বললে, নবলক্ষণা শিখে এসেছি। নবলক্ষণা? হ্যাঁ, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন। এই নবলক্ষণা ভক্তি বিষ্ণুকে অর্পণ করাই সর্বোত্তম শিক্ষা।

এবার দৈত্যরাজ ক্ষেপে গেল মাস্টারদের উপর। এই মারে তো সেই মারে। ষণ্ড-অমর্ক বলে, প্রভু এই শিক্ষা আমরা দিইনি। আর কেউও দেয়নি। এ বুদ্ধি ওর স্বভাবজ। প্রহ্লাদও সায় দিল, বললে, বাবা, সাধ্য নেই বিষয়াসক্ত স্বয়ংবন্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মায়। এ মতির দাতা তিনিই।

মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল ছেলেকে। সবলে লাথি মারল হিরণ্যকশিপু। অসুরদের বললে, শিগগির একে বধ করো। মাত্র পাঁচ বছরের শিশু, এ কিনা আমার পরমশত্রু বিষ্ণুর সেবক। দুষ্ট অঙ্গের মতন এ পরিত্যাজ্য। তীক্ষ্ম শূলে প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করল অসুরেরা। উপবাস করিয়ে রাখো। সাপ দিয়ে দংশন করাও। হাতির পায়ের নিচে ফেল। ফেল তপ্ত কটাহে। পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করো। পরব্রহ্মে-সমাহিত প্রহ্লাদকে কে স্পর্শ করে! সব চেষ্টা নিষ্ফল হল। মহা ভাবনায় পড়ল হিরণ্যকশিপু।

প্রভু, আপনি ত্রিজগৎবিজয়ী, বললে ষণ্ড-অমর্ক, ছোট একটা ছেলের জন্যে কেন ভাবছেন? পিতা শুক্রাচার্য শিগগিরই ফিরে আসছেন, যতদিন না আসেন ততদিন আমাদের কাছে ওকে পাশবন্ধ করে রেখে যান, দেখি আরেকবার চেষ্টা করে।

দেখ। যারা খেলা করে বেড়ায় সে সব ছেলেদের দলে ভিড়িয়ে দাও।

আবার শুরু হল নতুন প্রয়াসের পরিচ্ছেদ। পড়াশোনা যখন বন্ধ থাকে তখন দল পাকিয়ে আসে সব সমবয়সীরা। হেলাফেলার খেলায় ডাক দেয়।

প্রহ্লাদ বললে, মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। মনুষ্যজন্মেই পুরুষার্থসাধন। কিন্তু মনুষ্যজন্মও নশ্বর, অধ্রুব। সুতরাং বাল্যেই ভাগবত ধর্মের আচরণ করবে।

এ আবার কেমনতরো কথা!

হ্যাঁ, বিষ্ণুই সর্বভূতের আশ্রয়, সকলের প্রিয়, সকলের বান্ধবস্বরূপ। আয়ু বড়জোর একশো বছর। তার আদ্ধেক যাচ্ছে ঘুমে। কুড়ি বচ্ছর অনর্থক ক্রীড়ায়। কুড়ি বচ্ছর জরাজনিত অক্ষমতায়। বাকি সময় যাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র-বিষয়ভোগের আসক্তিতে। ত্রিতাপে জর্জরিত হয়ে। কেশকার কীট যেমন নিজের জালে বদ্ধ তেমনি। কামিনীর ক্রীড়ামৃগ, সন্তানের শৃঙ্খলরজ্জু। হে দৈত্যবালকগণ, মুকুন্দশরণাগতি ও তাঁর পদসেবাই এই ক্লেশক্লেদ থেকে মুক্তি আর মঙ্গলের উপায়।

প্রহ্লাদ এত কথা জানলে কি করে? বলাবলি করতে লাগল ছেলেরা।

যতদিন মাতৃগর্ভে ছিলাম নারদ আমাকে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন। সেই স্মৃতি ত্যাগ করেনি আমাকে। হে বয়স্যগণ, আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করো, বালকেরও ভাগবতী মতি জন্মাতে পারে। বয়স বা বিকার দেহের, আত্মার নয়। খনি খুঁড়ে যেমন সোনা, তেমনি এই দেহক্ষেত্রেই আত্মযোগের দ্বারা ব্রহ্মত্বলাভ।

'প্রহ্লাদচরিত্র' প্লে হবার পর 'বিবাহবিভ্রাট' হবে। গিরিশ ঠাকুরকে বলছে শুনে যেতে।

'না, প্রহ্লাদের পর আবার ওসব কি! গোপাল উড়ের দলকে তাই বলেছিলাম, শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বোলো। বেশ ভগবানের কথা হচ্ছিল, শেষে কিনা বিবাহ-বিভ্রাট, সংসারের কথা। কি লাভ হল? যা ছিলুম তাই হলুম।'
'থাক তবে। কিন্তু কেমন দেখলেন প্রহ্লাদচরিত্র?'
'দেখলাম তিনিই সব হয়েছেন। মেয়েরা আনন্দময়ী মা, এমনকি গোলোকে যারা রাখাল সেজেছে তারাও সাক্ষাৎ নারায়ণ। ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ কি? একটি লক্ষণ আনন্দ। নিঃসংকোচ আনন্দ। যেমন সমুদ্র। উপরে হিল্লোলকল্লোল, নিচে স্থির জল গভীর জল। কখনো বালকের ভাব। আঁট নেই, যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। কখনো পৌগণ্ড ভাব, ফস্টিনস্টি করে। কখনো যুবার ভাব, যখন কর্ম করে, লোক-শিক্ষা দেয় তখন সিংহতুল্য।'
ঈশ্বর নিজেই যে বালক। তাই তো বালক ভাবটি এত মধুর! এত আত্মীয়!
ছোট তক্তপোশের উপর মুখখানি চুন করে বসে আছেন। ব্যথা বেড়েছে। গলায় কে ডাক্তারি প্রলেপের পোঁচ দিয়েছে। চারদিকে ভক্তদের কড়া নিষেধ। যেন মুক্ত হরিণকে বেঁধেছে দড়ি দিয়ে। রুগ্ন ছেলেটির মুখের মতই মুখখানি করুণ।
সব চেয়ে কঠিন কথা, কথা বলা যাবে না।
'কথা একেবারে বন্ধ করলে চলে কি করে?' প্রতিবাদ করছেন ঠাকুর : 'কত লোক কত দূর থেকে আসছে, একটা কথাও শুনে যাবে না?'
'কি দরকার! আপনাকে দেখলেই আনন্দ।' কে একজন ভক্ত বললে।
'তুই বললেই হল? দেখেই সব, কথায় কিছু নেই? তোর তো দেখে আনন্দ, কিন্তু আমার আনন্দ যে বলে।'
মাগো, যত সব এঁদো, রোথো লোক আনবি, এক সের দুধে পাঁচ সের জল, আমি কত আর ফুঁ দিয়ে জ্বাল ঠেলব? আমার চোখ গেল, হাড়-মাস মাটি হল, আমাকে রেহাই দে। অত আমি করতে পারব না। আমার কী দায় পড়েছে! তোর শখ থাকে তুই করগে যা। বেছে-বেছে সব ভালো লোক আনতে পারিস না, যাদের দু-এক কথা বললেই হবে। এ যে একেবারে বাজে লোকের ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস। লোকের ভিড়ে আমার নাইবার-খাবার সময় নেই। এই তো একটা মাত্র ফুটো ঢাক, রাতদিন বাজালে কদিন আর টিকবে বল?
গলা দিয়ে রক্ত বেরুল ঠাকুরের।
একটি ভক্ত মেয়ে চলেছে ঠাকুরের কাছে। ওগো, তোর হাত দিয়ে যদি একটু দুধ পাঠাই নিয়ে যাবি ঠাকুরের জন্যে? শুধোলে তাকে তার প্রতিবেশিনী।
দক্ষিণেশ্বরে আবার দুধের অভাব! ঠাকুরের জন্যে কত বরাদ্দ দুধ, কত-বা নৈবেদ্য-নিবেদন। নিতে রাজী হয় না ভক্ত মেয়ে।
শুধু এক ঘটি দুধ! নিয়ে যা। ঠাকুরকে খাইয়ে আয়।
হাতে করে ঘটি বয়ে যেতে পারব না বাপু। অনেকটা রাস্তা।
অনুনয় শুনল না। খালি হাতেই গেল দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শুনল দুধ-ভাত ছাড়া আর কিছু মুখে উঠছে না ঠাকুরের। আর, এমন দুর্দৈব, আজ এক

ফোঁটাও দুধ যোগাড় নেই কালীঘরে। শ্রীমা চোখে আঁধার দেখছেন, খাওয়াবেন কী ঠাকুরকে! ছি, ছি, কেন আমি সেই সাধা দুধ ফেলে এলাম? আমার মত আছে কি কেউ অভাগিনী? মনের মধ্যে ভক্ত-মেয়ে হাহাকার করতে লাগল। এখন আমি কোথায় যাই, কে আমাকে দুধ দেয়!

পাঁড়ে গিন্নির নাম করলে কেউ-কেউ। কাছেই থাকে এক হিন্দুস্থানী মেয়ে, গরু আছে বাড়িতে, দুধ বেচে। কিন্তু বেচবার মত নেই কিছু আজ উদ্বৃত্ত। দেড় পোয়া-টাক ছিল, তা এই দেখ, জ্বাল দিয়ে রেখেছি। ঐ জ্বাল-দেওয়া দুধই আমাকে দাও। আমার দারুণ দায়। আমার ঠাকুর না খেয়ে রয়েছেন। বলো কত দাম দেব? যা চাও তাই নাও।

অনেক সাধ্যসাধনা করে কিনে আনল দুধ। ভাত চটকে সেই দুধটুকুই খেলেন ঠাকুর। কত বড় তৃপ্তির সাগর উথলাচ্ছে সেই ভক্ত-মেয়ের বুকের মধ্যে। আঁচাবার সময় জল ঢেলে দিল ঠাকুরের হাতে।

কানের কাছে মুখ এনে সহসা ঠাকুর বললেন, 'ওগো তোমার সেই মন্ত্রটি আমাকে দেবে?'

কোন মন্ত্র? চমকে উঠল সেই ভক্ত মেয়ে।

'সেই যে সিদ্ধিমন্ত্র পেয়েছিলে কর্তাভজাদের এক মেয়ের কাছ থেকে সেইটি।' কণ্ঠস্বরে ব্যথা ঝরে পড়ল : 'ওগো গলায় বড় বেদনা। তোমার ঐ মন্ত্রটি উচ্চারণ করে গলায় একবার হাত বুলিয়ে দেবে?'

আশ্চর্য, ঠাকুর কি করে জানলেন! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মেয়ের। কোন কালে কী সকাম সাধনায় ঐ মন্ত্র সে শিখেছিল গোপনে তা তো তাঁর জানবার কথা নয়! ঠাকুরের পায়ে শরণ নিয়ে জীবনের সকল কথাই তাঁকে সে খুলে বলেছে, শুধু এই মন্ত্র নেওয়ার কথাটিই বলেনি। কামনাসিদ্ধির জন্যে মন্ত্র নেওয়া, এ শুনলে ঠাকুর যদি অসন্তুষ্ট হন তারই জন্যে চেপে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই কি তাঁকে লুকোবার নেই?

লজ্জায় অবনতমুখে গেল সে শ্রীমা'র দুয়ারে। বললে তার ধরাপড়ার কথা।

মা বললেন, 'কোনো ভয় নেই। এখন তো সে মন্ত্র ফেলে দিয়েছ, নিষ্কাম হয়ে ঈশ্বরকে ডাকাই যে কর্তব্য, বুঝেছ এই সার কথা। জানো এ'র কাছে আসার আগে আমিও ঐ মন্ত্র শিখে নিয়েছিলাম। কত লোকে কত কথা বলেছে, ঐ মন্ত্রও ওদের পরামর্শেই নেওয়া। একদিন ঠাকুরকে বললুম সব খোলাখুলি। একটুও রাগ করলেন না। শুধু বললেন, মন্ত্র নিয়েছ তাতে কি? এখন তা ইষ্ট পাদপদ্মে সমর্পণ করে দাও।'

ভালো-মন্দ শুচি-অশুচি সকাম-নিষ্কাম সব বিসর্জন দাও তাঁর পদপ্রান্তে। তিনি আর কিছু চান না, শুধু চান মন-মুখের সমতা।

নির্জলাভতুষ্ট স্বশান্তরূপ আশুতোষকে দেখ। সামান্য মৃত্তিকায় তার মূর্তি। একটু গঙ্গাজল আর দুটো বেলপাতাই তার উপকরণ। তুচ্ছ গালবাদ্যেই তার পরিতোষ। আর কিছু না থাকে দাও তাঁকে অন্তরের সারল্য। সরল হওয়া মানেই নির্মল হওয়া।

তিনি যে নির্মলচক্ষু। কী তাঁর থেকে গোপন করবে? কোন গুহায় গিয়ে মুখ ঢাকবে? তিনি যে আরো গভীরে। কী আচ্ছাদন আছে তোমার আবৃত করবার? তিনি যে অনিরুদ্ধ।

ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল চিকিৎসার জন্যে। প্রথমে উঠলেন দুর্গাচরণ মুখুজ্জে স্ট্রিটের ছোট বাড়িতে। ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যাবে এইটুকুই সেখানে প্রশান্তিস্পর্শ।

ছাই। ওটুকু গঙ্গায় আমার কী হবে? রাত্রিদিন নিত্য আমি ছিলাম ঐ প্রশস্তবাহিনী গঙ্গার কাছটিতে, আমার বিস্তীর্ণ দক্ষিণেশ্বরের বাগানে, মুক্ত বাতাসের উদারতায়। এ আমাকে কোথায় এনে বন্দী করলি? একদিন হেঁটে চলে গেলেন বলরামের বাড়ি। তবু এখানে কিছুটা খোলা-মেলা আছে। আছে অন্তত শুভাবহা ভক্তির বিশুদ্ধতা।

আসতে লাগল কবিরাজের দল। গঙ্গাপ্রসাদ গোপীমোহন নবগোপাল দ্বারিকানাথ। ডাক্তাররা যাকে বলে ক্যান্সার, কবিরাজের ভাষায় রোহিনী। গঙ্গাপ্রসাদ বললেন ভক্তদের, 'শাস্ত্রে আছে বটে চিকিৎসার বিধান কিন্তু অসাধ্যআরোগ্য।'

কবিরাজদের কোনো ওষুধই লাগল না। শেষে ঠিক হল হোমিওপ্যাথি করানো যাক। শ্যামপুকুর স্ট্রিটে নেওয়া হল বাড়িভাড়া। ডাকো মহেন্দ্র সরকারকে।

অসহ্য ক্লেশভোগ করছেন। অথচ অবিচাল্য। পর্বতচূড়ারও বোধকরি ধৈর্যের সীমা আছে। বজ্র পড়লে তাও ভেঙে পড়ে। কিন্তু এঁর ধৈর্যের বুঝি সীমা নেই। বজ্রের বহ্নিজ্বালাও বুঝি ঐ শান্তশীতল বক্ষের স্পর্শে নিভে গেছে।

তাই অপার বিশ্বাসই তোমার দুর্গ হোক। তপস্যা আর আত্মসংযম হোক অর্গল। ধৈর্য হোক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তারপর তোমার ধনু উত্তোলন করো। ধর্মই তোমার ধনু, নিষ্ঠা তার জ্যা, শান্তি তার অটনি। সত্যসহায়ে তোলো তোমার ধনু। প্রেম-রূপ শর যোজনা করো। ভেদ করো তোমার কর্মরূপ বর্ম। সর্বসংগ্রামে জয়ী হও।

শাঁখারিটোলায় ডাক্তারের বাড়ি এসেছে মাস্টারমশায়। নিয়ে যাবে তাকে শ্যামপুকুর। ডাক্তার তার গাড়িতে তুলে নিল মাস্টারকে। বহু জায়গায় ডাক, ঘুরে-ঘুরে ফিরতে লাগল ঘরে-ঘরে। প্রথমে চোরবাগান, পরে মাথাঘষার গলি, শেষে পাথুরিয়াঘাটা। বড়বাজার হয়ে সর্বশেষে শ্যামপুকুর। সমস্ত জ্ঞান-তর্ক পেরিয়ে সর্বশেষে শরণা-গতি।

ঠাকুরের সেবার কথা উঠেছে। 'তোমাদের কি ইচ্ছে ওঁকে আবার দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো?' ডাক্তার জিগগেস করল মাস্টারকে।

'না, তাতে ভক্তদের বড় অসুবিধে। কলকাতায় থাকলে সব সময় যাওয়া-আসা যায়, দেখতে পাওয়া যায় সর্বদা।'

'কিন্তু এতে তো অনেক খরচ।'

'তা হোক। ভক্তদের তার জন্যে বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই। যাতে তাঁর পরিপূর্ণ সেবা করতে পারে তাই তাদের একমাত্র চেষ্টা।' মাস্টার বললে গাঢ়স্বরে, 'একমাত্র আরাধনা। খরচ এখানেও, সেখানেও। খরচের কথা কেউ ভাবে না। তবু যে সর্বক্ষণ দেখতে পাচ্ছি চোখের উপর এই একমাত্র সান্ত্বনা।'

ভক্তকে মেলাবার জন্যেই তো ঠাকুরের অসুখ। এক সুতোয় গাঁথবার জন্যে। এক
ল্মে উজ্জীবিত করার জন্যে।

মন্ত্রটি কি?

মন্ত্র সেবা।

রে শুধু আমার সেবা নয়, সমস্ত মানুষের সেবা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। ওরে
নুষের মৈত্রী, মানুষের কল্যাণ। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।
হাভারতে ভীষ্মের কথা মনে কর, ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।

, আমাকে বিনামূল্যে পার করে দাও। এই বিনামূল্যটিই প্রেম। আর, পার হতে
ওয়া সমস্ত অহঙ্কারের বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ হয়ে মানুষের মৈত্রীতে প্রসারিত হওয়া।

র মানুষের মধ্যেই এই ঠাকুর। পরমপুরুষ ব্রহ্মবিদ। প্রেমই ব্রহ্মবিহার। তুই ধর্ম
দিতে যাস নেবে না, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের সঙ্ঘাত হবে। কিন্তু মৈত্রী দিতে
স নেবে পাত্র পরিপূর্ণ করে। মিত্রের অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে সকলকে দেখ, সকলেও
সেই সাহ্লাদদৃষ্টির প্রত্যর্পণ করবে।

আমরা ভদ্র শুনব, ভদ্র দেখব, ভদ্রে প্রেরিত হব। আমাদের চিন্তা কল্যাণ, দর্শন
কল্যাণ, কর্মও কল্যাণ।

ানবসেবাই মাধবসেবা।

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥